মন চল গঙ্গা যমুনা

মন চল গঙ্গা যমুনা

অমূল্য সেনগুপ্ত

মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-১২

MON CHALO GANGA JAMUNA
(A Bengali Travelogue)
by Dr. Amulya Sen Gupta

প্রকাশক :
নিভা মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৪২

মূল্য : ১২'০০ (বারো টাকা) মাত্র

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রীবিশু গাঙ্গুলী

মুদ্রাকর :
শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

নিবেদন

এই নিবেদন রচনা করার কথা আমার নয়। আমার পরম পূজনীয় পিতৃদেব এই গ্রন্থের সমুদয় কার্যাদি সম্পন্ন করে হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো পরলোকের ডাকে করুণাময়ের ক্রোড়ে আশ্রয় নিয়েছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে তিনি প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন, জানি না, নিজের জীবনের পূর্ণাহুতি দিয়ে সেই মহাব্রত উদ্‌যাপন করে গেলেন কিনা। তাঁর অমর আত্মার শান্তি কামনায় এই গ্রন্থটি নিবেদিত। তাঁর নিজের রচিত নৈবেদ্যেই পূজার আয়োজন।

যে ভাবে সর্বাঙ্গসুন্দর করে গ্রন্থ প্রকাশের বাসনা তাঁর ছিল, জানি না আমরা অক্ষম ও অপটু হস্তে তা যথাযোগ্যভাবে সম্পূর্ণ করতে পারলাম কিনা, তথাপি, এও জানি তিনি আমার সকল ক্রুটী জীবনে যেমন ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে মার্জনা করেছেন, এ ক্রুটীও তিনি সেই ভাবেই উপেক্ষা করবেন। তাঁর পুণ্য-স্মৃতির প্রতি প্রণতি জানাই।

এই গ্রন্থটির "আমার কথা" অংশটি রচনার পর তাঁর দেহাবসান ঘটে। সেই অংশটি যথাযথ প্রকাশ করা গেল।

এই গ্রন্থের ভূমিকাটি রচনা করেছেন পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। তাঁর প্রতি সুগভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ তৈরীর ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য শ্রীবিশু গাঙ্গুলী, শ্রীরঞ্জিত নন্দী ও শ্রীভক্তি বোস শিল্পীত্রয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এ ছাড়া যাঁরা আমার পূজনীয় পিতৃদেবের অবর্তমানে নানাভাবে এই গ্রন্থ প্রকাশে সহায়তা করেছেন তাঁদের কাছেও আমার ঋণ অপরিসীম। তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

কস্তুরী দাশশর্মা

"সু দ ক্ষি ণা"
পি ৭৬৬, ব্লক 'পি'
নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫৩

আমার কথা

হিমালয় ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্ব হিসাবে সুধীপাঠক ও হিমালয় প্রেমিকদের উদ্দেশ্যে আমার নবতম গ্রন্থ "মন চল গঙ্গা যমুনা" নিবেদিত হ'ল। আমার লেখা 'হিমতীর্থ হিমাদ্রি' তাঁরা সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন। বর্তমান গ্রন্থ রচনায় তাঁদের অভিনন্দন লেখককে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে একথা অকপটে স্বীকার করি।

অজানাকে জানার এবং অপরাজেয়কে জয় করায় প্রবল আকাঙ্ক্ষা মানুষের সহজাত। একে চরিতার্থ করতে সে সবকিছু তুচ্ছ করে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভুলে যায় তার দুর্গমতার কথা, ভুলে যায় শারীরিক ক্লেশ। স্বেচ্ছায় সে এসব বরণ করে ফিরে না আসার নিরাশাজনক সম্ভাবনা সত্ত্বেও। মানুষের এই অবিরাম দুঃসাধ্য প্রচেষ্টার কাছে প্রকৃতি কতবার নতি স্বীকার করেছে। খুলে দিয়েছে তার রহস্যলোক।

এঁদের আর একটি শ্রেণী যাঁরা আধ্যাত্মিক জগতের বিশালতায় আকৃষ্ট হয়েছেন, তাঁরা চলে যান হিমালয়ের গভীরে পরমার্থের সন্ধানে। ঐহিক কামনা বাসনা বিসর্জন দিয়ে তাঁরা এপথে পাড়ি দেন।

প্রাত্যহিকতার বন্ধনে আবদ্ধ মানুষ মুক্তির আশায় যখন ছট্‌ফট করে, হিমালয় সেই মুহূর্তে তাকে দেয় মুক্তির প্রসন্ন আশ্বাস। ভারতের এই আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য জাতিধর্মনির্বিশেষে যুগ যুগ ধরে বহু মনীষিকে এপথে টেনে নিয়ে গেছে।

বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক সদ্যপরলোকগত ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন, "Philosophy in Indin is essentially spititual. It is the intense spirituality India and not any great political structnre or social organisation that it has developed, that enabled it to resist the

ravages of time and the actidents of history··· It has fought for truth and against error. The history of Indian thought illustrates the endless quest of mind, ever old, ever new".

অধ্যাত্ম প্রেরণায় আবিষ্ট ভারতবাসীর এই সত্ত্বা তার একান্ত নিজস্ব এবং মৌলিক। হিমালয় এ সাধনা-সিদ্ধির পথে তার সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক।

হিমালয়কে জয় করার দুরন্ত প্রয়াস আজ আর শুধু পুরুষ জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। স্বদেশ এবং বিদেশের মেয়েরাও এর নানা শৃঙ্গ জয়ের প্রচেষ্টায় আজ সমভাবে অগ্রসর। তারই স্বাক্ষর রেখে গেছেন লাহুল-হিমালয়ের 'লালনা শিখর' বিজয়িনী সুজয়া গুহ ও কমলা সাহা। আমাদের দুর্ভাগ্য, জয়ের পরে ফিরে আসার পথে দুর্ঘটনায় তাঁরা প্রাণ দিয়েছেন।

নারীবর্গের সাফল্যের প্রতীক্ স্বরূপ এই তো সেদিন হিমালয়ের সর্বোচ্চশৃঙ্গ এভারেস্ট জয় করে জাপানী গৃহবধূ জুনকো তাবেই সমগ্র পৃথিবীর নারীজাতির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

তাই বলি, আজ চলেছে হিমালয়কে জয় করার, অজানাকে জানার এক বিরামহীন অভিযান।

আমার এই গ্রন্থটি যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী ও গোমুখ যাত্রা-পথের ভ্রমণ কাহিনী। যা দেখেছি, যা শুনেছি ও উপলব্ধি করেছি তারই অলঙ্কারহীন বিবরণ।

পথের নৈসর্গিক সৌন্দর্য কত সময় সারা মনকে আচ্ছন্ন করেছে। মুগ্ধ বিস্ময়ে ভেবেছি এরূপ মাধুরীর স্রষ্টা কত বড় শিল্পী, কি অফুরান তাঁর সৃষ্টির ভাণ্ডার।

আমার অনুজপ্রতিম বন্ধু খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাক্তার কান্তি-ভূষণ বক্সী এই যাত্রায় আমার শারীরিক সুস্থতার সবুজ সঙ্কেত দিয়ে নিশ্চিন্ত করেছেন হিমালয়ের দুর্গম পথে পাড়ি দিতে।

আমার অগ্রজপ্রতিম বন্ধু সুসাহিত্যিক শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থ রচনায় নানাভাবে উৎসাহিত ও সাহায্য করেছেন।

আলোকচিত্রগুলি তরুণ বন্ধু হিমালয় প্রেমিক শ্রী অমিত দে এবং আমার অভিন্নহৃদয় সুহৃদ শ্রীসত্যশরণ মুখোপাধ্যায়ের ক্যামেরায় তোলা। ছবির ব্লক তৈরীর ব্যাপারে স্নেহভাজন শ্রী অসীমকুমার সেনগুপ্ত আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। এই সূত্রে আমি এঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

আমার প্রাণাধিকা কন্যা কল্যাণীয়া কস্তুরী দাশশর্মা অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে এ বই-এর 'প্রুফ' সংশোধন করে আমাকে অনেকভাবে সাহায্য করেছে।

পরিশিষ্টে প্রদত্ত 'যাত্রা নির্দেশিকা' ভ্রমণে পাঠকের সহায়ক হবে আশা করি।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস হিমালয় প্রেমিক অগণিত ভ্রমণপিপাসুর মনোরঞ্জনে সমর্থ হলেই নিজেকে সার্থক মনে করব।

"সু দ ক্ষি ণা"
পি ৭৬৬, ব্লক 'পি'
নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫৩

অমূল্য সেনগুপ্ত

মুখবন্ধ

ভারতবর্ষের তুষার কিরীট হিমালয়কে আমরা কেবল মাত্র তার মহাভারতের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। একটি প্রকৃতির রাজ্যের এক বিশাল বিস্ময়, আর একটি তার বিচিত্র মানব-সমাজের একটি বিশাল কীর্তি। হিমালয়ের প্রকৃতি যেমন বিচিত্র ও রহস্যময়—পুরানো হয়েও চিরনূতন, মহাভারতও তেমনই বিচিত্র, গভীর, ব্যাসকূটজটিল এবং রস-সহস্যময়। দেবতাত্মা হিমালয়কে তাঁর আত্মা বলতে পারি। কারণ, ভারতের আত্মার সাধন-পীঠ হিমালয়। ভারত-সভ্যতার আদিযুগ থেকে হিমালয়ের ধ্যান-গম্ভীর প্রকৃতি তার সাধকদের আকর্ষণ করেছে, আশ্রয় দিয়েছে, তার আত্মার শক্তিকে উপলব্ধি করবার সুযোগ দিয়েছে। সেখানকার সুগভীর উপলব্ধির সুবিশাল প্রকাশই যেন মহাভারতের বিশালতার আধারে বিধৃত হয়েছে। সুতরাং কেবল মাত্র হিমালয়ের সঙ্গেই মহাভারতের তুলনা হতে পারে, আর কারো নয়। হিমালয় এবং মহাভারত দু'য়ের জন্যই ভারত বিশাল, ভারতীয় সভ্যতা সুবিশাল।

যুগে যুগেই ভারতবাসী হিমালয়ের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে এসেছে। তার বিশালতা কিংবা দুর্ভেদ্যতার জন্য তাকে নিজেদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখে নি। আচার্য শঙ্কর একদিন কি দুঃসাধ্য প্রচেষ্টায় হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশে হিন্দু ধর্মের দিগ্বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন, তা, আজ আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তারো আগে ভারতেরও বৌদ্ধধর্ম যে কি ভাবে হিমালয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত নিজের অধিকার বিস্তার করেছিল, বর্তমান গ্রন্থের লেখকও তার নিদর্শন নিজের চোখে দেখে এসেছেন।

বর্তমান জড়বাদী পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার যুগেও হিমালয় তেমনই ভাবেই আমাদের আকর্ষণ করে চলেছে, এই আকর্ষণের কোনো বিরাম নেই, কোনো শৈথিল্য নেই। তাই অগণিত যাত্রী সেই

রহস্যলোক বারবার অভিসার করেছে, শুধু ধর্মের তীর্থ যাত্রী নয়, যারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তীর্থযাত্রী তারাও সেই পথে যোগ দিয়েছেন। তার ফলে হিমালয়ের রস ও রহস্যলোক আমাদের কাছে ধীরে ধীরে অনাবৃত হয়ে পড়ে আমাদের তার প্রতি কৌতূহল দিন দিন আরো বাড়িয়ে তুল্‌ছে।

বাংলা সাহিত্যও হিমালয়ের মধ্যে বিষয়-বস্তুর এক অনন্ত উৎসের সন্ধান পেয়েছে, তাঁর ফলে তাকে কেন্দ্র করে এক অতি সমৃদ্ধ আকর্ষণীয় সাহিত্য গড়ে উঠেছে। হিমালয়ের প্রকৃতি ও মানুষের এমনই গুণ যে তাকে প্রত্যেকেই নূতন নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পান, তাই এই সাহিত্য একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয় না। প্রত্যেক লেখকেরই অনুভূত গুণ অন্য থেকে স্বতন্ত্র, এইজন্যই তার প্রত্যেকটি ভ্রমণ বৃত্তান্তই নূতন। সেইজন্য এই বিষয়ক প্রত্যেকটি গ্রন্থটিই অভিনন্দন যোগ্য।

কর্মজীবনে যশস্বী চিকিৎসাবিদ্ সদ্য পরলোকগত ডাক্তার অমূল্য সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁর গৌরবময় কর্মজীবন থেকে অবসর নেবার পর প্রথমে কেদার-বদ্রী ঘুরে আসার এক বছরের মধ্যেই যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী ভ্রমণ করবার জন্য বেরিয়ে পড়েন। হিমালয়ের পথে একবার যে পা বাড়িয়েছে, তাকে চিরকালই ঘরছাড়া হতে হয়েছে, তার প্রকৃতির এমনই আকর্ষণ। তিনিও তার আকর্ষণের বশীভূত হয়ে পড়েছিলেন, তা' থেকে নিজেকে আর মুক্ত করতে পারেন নি। তার চড়াই উৎরাই পাকদণ্ডীর মধ্যে বার বার পাক খেয়ে বেরিয়েছেন। তাই পরিণত বয়সে দুঃসাহসিক সঙ্কল্প নিয়ে কঠিন যাত্রাপথে নিষ্কান্ত হয়ে পড়েন। তারই সরস এবং খুঁটিনাটি বর্ণনায় 'মন চল গঙ্গা যমুনা' একখানি পরম উপভোগ্য ভ্রমণ-বৃত্তান্ত রূপে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে।

অনেকে 'ভ্রমণ কাহিনী'র মধ্যে নানা কাল্পনিক চরিত্র এবং ঘটনা সংযোগ করে তা'কে 'ভ্রমণোপন্যাস' কিংবা 'উপন্যাস রস-সিক্ত ভ্রমণ

কাহিনী' বলে উল্লেখ করে থাকেন। তাতে না হয় প্রকৃত ভ্রমণ কাহিনী, না হয় প্রকৃত উপন্যাস। সাহিত্যের কোনো শাখার উদ্দেশ্যই তাতে পূর্ণ হয় না। কিন্তু বর্তমান লেখকের গ্রন্থখানি যে সেই ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত তা অতি সহজেই বুঝতে পারা যায়। তাঁর গ্রন্থখানি পাঠ করলে হিমালয়ের দুর্ভেদ্য অরণ্য পর্বতের ভিতর দিয়ে যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রীর পথরেখা সুস্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে, কাল্পনিক চিত্র ও চরিত্রে তা' অস্পষ্ট হয়ে ওঠে না। এমন কি, যাঁরা এই পথে ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক তাঁরা বইখানিকে তাঁদের পথ নির্দেশক বা 'গাইড বুক' রূপে সম্পূর্ণ নির্ভর করে ব্যবহার করতে পারেন। ভ্রমণ বৃত্তান্তটি পাঠ করতে করতে প্রত্যেক পাঠকের মনেই যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রীর পথে ভ্রমণ করবার স্পৃহা জাগ্রত হয়ে উঠবে ব'লে আমি বিশ্বাস করি, কারণ, বারবার আমারও তাই মনে হয়েছে। প্রকৃত ভ্রমণ বৃত্তান্তেই তা' সম্ভব, 'ভ্রমণোপন্যাস' জাতীয় রচনায় তা' কদাচ সম্ভব হতে পারে না।

কেবল মাত্র নিরবচ্ছিন্ন নিসর্গের বর্ণনায় কোনো ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সার্থক হতে পারে না, অনেকে এ' কথা অনুভব করতে পারেন না। নিসর্গের পটভূমিকায় যদি মনুষ্যজীবন না থাকে তবে তা' সাহিত্যে আকর্ষণীয় হয় না, কারণ আর যা কিছু যেমনই হোক, মানুষই হচ্ছে সাহিত্যের লক্ষ্য। সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' কেবলমাত্র সে দেশের গাছপালা পাহাড় পর্বতের বর্ণনাতেই পূর্ণ নয়, তার মধ্যে জীবন্ত নরনারী বিচিত্র লীলাও তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলে 'পালামৌ' আকর্ষণীয় হয়েছে। যেখানে মানুষের কথা নেই, সেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যত সার্থক বর্ণনাই হোক, তা' বৈচিত্র্যহীন হয়ে ওঠে। বর্তমান গ্রন্থের লেখক এ' কথাটি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে আমরা কেবল হিমালয়ের নৈসর্গিক বর্ণনাই পাই না, পথের দু' ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য কুটীরে যে পার্বত্য অধিবাসীরা বাস করে, তাদের ক্ষুদ্র জীবন, কিংবা পথের উপর দিয়ে যে অগণিত

নর-নারী তীর্থ যাত্রায় কিংবা সৌন্দর্যলোকের অভিসারে চলেছে, তাদেরও নানা প্রত্যক্ষদৃষ্ট কৌতুককর বর্ণনায় তাঁর গ্রন্থখানি সরস হয়ে উঠেছে। তাই গ্রন্থখানি তীর্থযাত্রী এবং সাহিত্য রসিক উভয় শ্রেণীর পাঠকেরই আদরণীয় বলে বিবেচিত হবে।

গভীর পরিতাপের বিষয় যে গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থখানিকে প্রকাশিত হতে দেখে যেতে পারেন নি। হিমালয়ের মধ্য থেকেই তাঁর মুক্তির ডাক এসেছিল, তিনি সেই ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তবু তিনি বাঙালী পাঠককে যা দিয়ে গেছেন, তা' কৃতজ্ঞচিত্তে বাঙালী চিরদিন স্মরণ করবে।

কলিকাতা
মহাষ্টমী, ১৩৮২ সাল।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

কাল বয়ে যায়। মহাকালের নৃত্যছন্দে-ছন্দিত ঋতুচক্রের অমোঘ আবর্তনে হেমন্তের পরে শীত আসে, শীতের পরে ভেসে আসে দক্ষিণ সমীরণ। সেই সঙ্গে কেদারনাথ-ত্রিযুগীনারায়ণ-বদরিনাথ পরিক্রমার পর বছর ঘুরে আসে। ভ্রমণ-পিয়াসী-মন আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে। সংসারের শত কাজে সুদূরের "ব্যাকুল বাঁশরি" বাজতে থাকে। ভেসে ওঠে ধ্যানগম্ভীর চিরতুষারাবৃত হিমালয়, যার আকর্ষণ আমার কাছে অপ্রতিরোধ্য।

অবশেষে মনঃস্থির করে ফেলি। এবারও পাড়ি জমাতে হবে হিমালয়ের পথে, কিন্তু কোন্ দিকে? কুলু-মানালি, রোটাংকেলং, লাহুল-স্পিতি, তুষারতীর্থ অমরনাথ, না হিমালয়ের অন্য কোন অঞ্চল?

অবশেষে স্থির হয় এবারের যাত্রা হবে যমুনা ও গঙ্গার উৎস-পথে। এবারও লালগোপাল ও শশাঙ্কবাবুকে মনের বাসনা ব্যক্ত করি। আমার মতো ওঁদের মনেও হিমালয়ের দুরন্ত-বাসনা।

হিমালয়ের পথে বেড়াবার সবচেয়ে ভাল সময় সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস। বর্ষাঅন্তে আকাশ তখন পরিষ্কার, মেঘশূন্য, পথের দুর্গমতাও কম। যাত্রীর ভীড়ও এ সময়ে কম থাকে বলে পথে চটি বা ধর্মশালাতে জায়গা পাওয়া সহজ। মন্দিরে দেব-দেবী দর্শনও অনেক ভালভাবে করা যায়।

পাহাড়ের কোলে তরাই অঞ্চল ও নদীতীরে সামান্য সমতল ভূমিতে তখন সবুজ ধান, আলু ও অন্য ফসলের ফলনে ভরা। অন্য-দিকে নানা রং-এর ফুলের মনমাতান বাহার। সূর্যকমল, ব্রহ্মকমল, গোলাপ, রডোডেনড্রন আরও কত কি! দেখে দুচোখ জুড়িয়ে যায়। অফুরন্ত ফুলের অর্ঘ্যে দেবতারাও বুঝি প্রসন্ন। চারিদিকে ফুল ও নানা

ফসলের শোভায় নৈসর্গিক সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পায়। হিমালয়ের পথে পথে যাত্রীরাও মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ান।

কিন্তু শীতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে মন চায় না। তাই মে-জুন মাসেই বেরিয়ে পড়ব ঠিক ক'রে ফেলি।

এপ্রিলে আমাদের প্রস্তুতির পর্ব শুরু হল। হরিদ্বারে ভারত সেবাশ্রম সংঘ-র অধ্যক্ষমহারাজ স্বামী অভয়ানন্দকে চিঠি লিখে জানতে পারি যে হৃষীকেশ থেকে এবার প্রথম যাত্রীবাস ছাড়বে ১৬ই মে। স্বামিজী আরও লিখেছেন এ সময় যাত্রীদের ভীষণ ভীড়, সে তুলনায় বাসের সংখ্যা অল্প। বহু যাত্রীদের হৃষীকেশে সরকারী অস্থায়ী শিবিরগুলিতে দিনের পর দিন বাসের টিকিট পাবার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। সেখানে থাকা ও খাওয়ার অত্যন্ত অব্যবস্থা। আমরা যেন এরকম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হয়ে আসি।

মন একটু দমে গেলেও যাবার সিদ্ধান্তে আমরা স্থির থাকলাম। লালগোপাল ও শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে ওরা জুন দেরাদুন একস্‌প্রেসে যাত্রার দিন ধার্য হল। লালুবাবু হৃষীকেশে টিহরি-গাড়োয়াল মোটর ওনার্স উনিয়নের কার্যালয়ের সচিব মশাইকে আমাদের দিন ও সময় জানিয়ে চিঠি লিখে অনুরোধ করেন তিনি যেন আমাদের তিন বন্ধুর জন্য হৃষীকেশ থেকে স্যানাচটির প্রথম শ্রেণীর টিকিট রিজার্ভ করে রাখেন। ওঁর কাছ থেকে উত্তর পেলেই আমরা টিকিটের টাকা পাঠিয়ে দেব। যমুনোত্রীর পথে স্যানাচটি পর্যন্তই বাস চলে। তারপর ১২½ মাইল হাঁটাপথে যমুনোত্রী।

এক সপ্তাহের মধ্যেই সচিব মশাই লালুবাবুর চিঠির উত্তরে জানালেন, নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে আমাদের তিনজনের জন্য বাসের যায়গা রিজার্ভ থাকবে। আমরা হৃষীকেশ পৌঁছে যেন ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি। এ চিঠি পেয়ে বড় আশ্বস্ত হই।

প্রস্তুতি-পর্বে কলেরা-টাইফয়েড ইনজেকসান নেওয়া থেকে শুরু

করে শীতবস্ত্র ও পথের জন্য অত্যাবশ্যক ঔষধপত্র সংগ্রহ করি। গঙ্গোত্রী-গোমুখের পথে সামরিক ঘাঁটিগুলির আশ-পাশ দিয়ে যেতে-যেতে প্রয়োজন হতে পারে এ কথা ভেবে ফটো সহ নিজ-নিজ পরিচয়-পত্রও সঙ্গে রাখি।

অবশেষে আসে সেই বহু প্রতীক্ষিত ৩রা জুন, যাত্রারম্ভের দিন। সেদিন স্বচ্ছ আকাশ, কোথাও এক চিলতে মেঘ নেই, সব মিলিয়ে একটি রৌদ্র কিরণোজ্জ্বল দিন। প্রার্থনা জানালাম 'Morning Shows the Day' এ প্রবাদ যেন আমাদের যাত্রায় সত্য হয়।

আমাদের গাড়ী দেরাদুন একস্‌প্রেস রাত ১০-১৫ মিনিটে হাওড়া থেকে ছাড়বে। সন্ধ্যার পর ট্রাফিক জ্যামের ঠেলায় রাস্তা বন্ধ হবার উপক্রম হয়, তাই দু' ঘণ্টা আগেই গিয়ে স্টেসনে উপস্থিত হলাম। লালগোপালবাবু তার আগেই এসে হাজির হয়েছেন।

একটু পরে দেখি অভিযাত্রীর বেশে, পিঠে বিরাট বিছানা নিয়ে এক ভদ্রলোক উপস্থিত। আরে! এ যে আমাদের শশাঙ্কবাবু, ব্যাপার কি! পাহাড়ী রাস্তায় তো আমরা চলব অনেক পরে। এখন থেকেই এ বেশ কেন আর পিঠে বিছানাই বা কেন? উত্তরে একটু মুচকি হেসে গম্ভীরস্বরে বলেন "করিয়াছি পণ, একটি পয়সা দিব না রেলের কুলিরে। বহিব আপন বোঝা আপন কাঁধের উপরে"। চমৎকার পণ! সব যাত্রী এমন স্বাবলম্বী হলে কুলিদের তো অনাহারে মরতে হবে।

শশাঙ্ক ও লালগোপালবাবুর এক কামরায় ঠাঁই হয়েছে, আমার ঠাঁই অনেক সামনের দিকে। ওঁদের তুলে দিয়ে আমি নিজের কামরায় চলে এলাম। সেখানে তিনজন সহযাত্রী, সস্ত্রীক শ্রীনির্মল ব্যানার্জি ও তাঁদের চার বছরের মেয়ে নন্দিতা। ওঁরা চলেছেন দেরাদুন-মুসৌরী। ফেরার পথে তিন-চার দিন হরিদ্বারে থাকবেন। ব্যানার্জি সাহেব টিটাগড় কাগজ কলে বড় এনজিনিয়ার। আলাপ পরিচয়ের

পর পরস্পরকে শুভরাত্রি জানিয়ে কামরার আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকাল এগারটায় ট্রেন মোগলসরাই স্টেসন পার হয়ে গঙ্গার পুলের উপর দিয়ে চলল। ওপারে পুণ্যতীর্থ বারাণসীর ঘাট ও মন্দির। তীরে বাঁধা সারি-সারি নৌকা। কতকগুলি আবার পাল তুলে প্রশস্ত গঙ্গাবক্ষে ভেসে চলেছে। স্নিগ্ধ বাতাস, ঢেউ-এর উপর সূর্যকিরণের ঝিকিমিকি। মনে পড়ল কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর সেই বিখ্যাত কবিতা—

"যাত্রীরা সবে বলিয়া উঠিল—'দেখা যায় বারাণসী!'
চমকি চাহিনু স্বর্গ-সুষমা মর্তে পড়েছে খসি।"

আমরা ট্রেনের কামরা থেকে পুণ্যভূমি বারাণসী ও বাবা বিশ্বনাথকে প্রণাম জানালাম। এর পরে গাড়ী এসে দাঁড়াল কাশীতে। ছোট্ট নন্দিতা তার মাকে জিজ্ঞাসা করল মা, এই কি সেই কাশী, যার কথা ঠাকুমা বলেন—

"চল চিত্ত কাশী,
কৈলাস বাসী,
ভজ বিশ্বনাথ।"

হ্যাঁ মা, এই সেই কাশী— শ্রীমতী ব্যানার্জি একটু হেসে উত্তর দেন।

পাঁচ-সাত মিনিট পরেই গাড়ী এসে দাঁড়াল বারাণসী জংসন স্টেসনে। কোলাহলমুখর, বহু পরিচিত সেই বারাণসী স্টেসন। হিমালয়ের পথে যতবার আসা-যাওয়া ততবার এ স্টেসনের মাটি ছুঁয়ে বিশ্বনাথকে প্রণাম জানিয়ে যাই। কত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীর স্মৃতিপূত পুণ্যভূমি, এই পরম পবিত্র তীর্থ বারাণসী।

সারা দুপুর প্রখর সূর্যতাপে তপ্ত হাওয়ার মধ্য দিয়ে পার হয়ে সন্ধ্যার সময় লক্ষ্ণৌ পৌঁছে কিছু আরাম বোধ করলাম। দিনের তাপ চলে গিয়ে মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। আরও দু' ঘণ্টা পরে 'হরদৈ' স্টেসনে রাত্রে খাবার দিয়ে গেল। এখন বেশ স্নিগ্ধ শীতল

হাওয়া বইছে। তার আবেশে ঘুমে দুচোখ জড়িয়ে আসছে। বহুকাল আগে পড়া আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর লেখা "ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে" প্রবন্ধটি সঙ্গে এনেছি ও তন্দ্রার ফাঁকে ফাঁকে তা পড়ে মনে অপার আনন্দ পাচ্ছি। ভাবছি এই ত' রাত পোহালেই হরিদ্বার, তারপর হৃষীকেশ। সেখান থেকে এবারের হিমালয় পরিক্রমার শুরু যমুনা ও গঙ্গার উৎস-পথে।

রাত দশটার সময় নির্মল ব্যানার্জি তাড়া দিয়ে বল্‌লেন, এবার আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ুন, ভোর হলেই তো হরিদ্বার। 'তথাস্তু' বলে ওঁদের শুভরাত্রি জানিয়ে শুয়ে পড়লাম।

যখন ঘুম ভাঙ্গল, রাত্রির আঁধারের অবসান ঘটিয়ে সূর্যদেব তখনও বেশীদূর উদিত হননি। গাড়ীর জানলা দিয়ে হালকা ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। তাড়াতাড়ি উঠে বিছানা বাঁধা শেষ করতেই গাড়ী এসে হরিদ্বার স্টেসনে দাঁড়াল। আমি ব্যানার্জি দম্পতিকে বিদায় শুভেচ্ছা জানিয়ে নেমে পড়লাম। লালগোপাল আর শশাঙ্কবাবুও ততক্ষণে নেমে পড়েছেন। স্থির হল এখানে তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে আজই দুপুরের গাড়ীতে হৃষীকেশ রওনা হব।

প্রাতরাশ সেরে ভারত সেবাশ্রম সংঘর মঠের দিকে বেরিয়ে পড়লাম।

স্বামী অভয়ানন্দজী আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে আশীর্বাদ করলেন 'শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ'। সাবধান করে দিলেন পথে কোথাও যেন অযথা ঝুঁকি না নিই। ওঁকে সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ও প্রণাম করে আমরা আবার স্টেসনে ফিরে এলাম।

হরিদ্বারে ঘুরে বেড়াবার সময় নেই। এমনিতেই কিছু দেরীতে বেরিয়েছি। এবারের পরিক্রমা আরও দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল। মাঝে-মাঝে বর্ষণ হচ্ছে। কবে ধস্ নেমে পথ বন্ধ হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আটকা পড়ে যেতে হবে, অভীষ্ট স্থানগুলি

হয়ত না দেখেই ফিরে আসতে হবে, সুতরাং অবিলম্বে বেরিয়ে পড়া দরকার। তাই দুপুরেই হৃষীকেশ এসে গতবারের মতো 'ভগবান আশ্রমে' আশ্রয় নিলাম।

স্বামী অভয়ানন্দজীর কথামতো প্রথমেই সরকারী যাত্রী অফিসে নাম রেজিস্ট্রি করতে গেলাম। একটা খোলা যায়গায় বিরাট চন্দ্রাতপ টাঙিয়ে তার নিচে যাত্রীদের পান্থশালা ও এক কোণে নাম রেজিস্ট্রি করবার অফিস করেছে। এখানে সারা দেশ থেকে অসংখ্য যাত্রী এসে জমায়েত হয়েছে। একেবারে শরণার্থী শিবিরের মতো অবস্থা। নাম রেজিস্ট্রি করবার পর কেউ কেউ পাঁচ-ছয় দিন ধরে বসে আছেন তাঁদের ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী বাসের টিকিট পাবার জন্য। শুনলাম কিছু দালাল আছে যারা পঁচিশ টাকার টিকিট চল্লিশ টাকায় যোগাড় করে দেয়। ভুক্তভোগী হয় অশিক্ষিত দরিদ্র, গ্রাম্য তীর্থ-যাত্রীরা। তাদের অত পয়সা দিয়ে টিকিট কেনার সামর্থ্য থাকে না বলে রেজিস্ট্রেসনের ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী টিকিট পাবার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এমনই দুর্বিসহ অবস্থা।

ক'দিন আগে মা আনন্দময়ীর জন্মোৎসব উপলক্ষে উত্তরকাশীতে অগণিত ভক্ত সমাবেশে তিনি তাঁদের দর্শন দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। সেই উপলক্ষ্যে হৃষীকেশ থেকে উত্তরকাশী পর্যন্ত যাত্রী নিবাস-গুলিতে তিল ধারণের স্থান নেই। তার ঢেউ ছড়িয়ে গেছে সুদূর গঙ্গোত্রী পর্যন্ত। উৎসবান্তে ভক্তরা এখন ফেরার পথে। এখনও তাই হৃষীকেশে ভাঙা মেলার ভীড়। নাম রেজিস্ট্রি পর্বশেষে আমরা আর কাল হরণ না করে টিহরি-গাড়োয়াল মোটর ওনার্স উনিয়ন অফিসে এসে সচিব মশাই-এর সঙ্গে দেখা করে লালগোপালবাবুকে লেখা ওঁর চিঠি দেখালাম। ভদ্রলোক অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির, বললেন আমাদের জন্য আগামী কাল সকালের প্রথম বাসে স্যানাচটি পর্যন্ত তিনখানা প্রথম শ্রেণীর টিকিট রেখে দিয়েছেন। ওঁকে তখনই ভাড়ার টাকাটা দিয়ে টিকিট

পাবার বন্দোবস্ত পাকা করে নিলাম। মনটাও খুব আশ্বস্ত হল।

বেলা তখন তিনটা বাজে, আমরা বেরিয়ে পড়লাম লছমন ঝোলার দিকে—উদ্দেশ্য হৃষীকেশের যতটুকু দেখা যায় সন্ধ্যার মধ্যে।

আজকের হৃষীকেশ অত্যন্ত কর্মব্যস্ত জনবহুল শহর। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ থেকে বহু শরণার্থী এসে এখানে আশ্রয় নেন। অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে কাঠের আসবাব-পত্র ও মোটর ট্রাকের বডি তৈরীর কাজে ওঁরা নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আমরা চলেছি শহরের একমাত্র রাজপথ ধরে। সমগ্র উত্তরাখণ্ড পরিক্রমার প্রবেশ দ্বার এই হৃষীকেশ। অবশ্য এ ছাড়াও কোটদ্বার থেকে যাত্রী-বাসে পৌড়ী ও শ্রীনগর হয়ে কেদার-বদরি যাওয়া যায়। কোটদ্বার রেলপথে হরিদ্বারের অল্প আগে নাজিবাবাদ জংসন রেল স্টেসন্ থেকে পঁচিশ মাইল দূরে শাখা লাইনে অবস্থিত একটি ছোট শহর। কিছু যাত্রী এ পথে উত্তরাখণ্ড তীর্থপথ পরিক্রমা করেন। তবে অধিকাংশই যাত্রা করেন হৃষীকেশ থেকে। এখানে তাই গড়ে উঠেছে বিরাট মোটর বাস প্রতিষ্ঠান টিহরি-গাড়োয়াল মোটর ওনার্স ইউনিয়ন এবং গাড়োয়াল মোটর ট্রান্সপোর্ট ওনার্স ইউনিয়ন। উত্তরাখণ্ডের সব তীর্থে যাবার যাত্রী বাস ছাড়াও এঁদের অধীনে আছে মালবাহী ভারী ট্রাক। সেগুলিই হল এ অঞ্চলে বিভিন্ন পণ্য পরিবহণের একমাত্র মাধ্যম। শহরের ‘মুনি কি রেতি’ পল্লীতে এঁদের প্রধান কর্মস্থল ও বাস ডিপো।

রাজপথ দিয়ে অল্প দূর গিয়ে চন্দ্রভাগা নদীর উপর কংক্রিটের পুল। নদী এখানে শীর্ণ ও শুষ্ক। ছোট বড় পাথরের-নুড়ি ছাড়া কিছু নেই। বর্ষাকালে অবশ্য এই চন্দ্রভাগা হয়ে ওঠে স্বয়ম্ভরা। যৌবনমদে মত্তা কল্লোলিনী তখন গর্জন করতে করতে অল্প দূর গিয়ে নিজেকে মিলিয়ে দেয় গঙ্গার পবিত্র শীতল জলে।

চন্দ্রভাগার এপারে অনেকখানি এলাকা জুড়ে উঠেছে এক

তপোবন পরিবেশ ও আশ্রম। লালগোপালবাবু বললেন ওটা স্বামী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথের আশ্রম।

জুন মাসের অপরাহ্ণ। প্রখর রৌদ্রতাপ ও গরম হাওয়াতে চলতে একটু কষ্ট হচ্ছিল। সূর্যদেব ক্রমশঃ অস্তাচল-পথে। একটু বাদেই তাপ কমে আসবে। আমরা এগিয়ে চললাম।

চন্দ্রভাগার পুল পেরিয়ে একটু যেতেই চোখে পড়ল নূতন তৈরী শিখদের গুরুদ্বারা ও তার সংলগ্ন বিরাট অঙ্গন। মূল ইমারৎটি একটি বিশেষ স্থাপত্যশিল্পে গড়া। কংক্রিটের ছাদটা একটা মস্ত বড় ডানা মেলা পাখির আকারে তৈরী। ইমারতি কাজ অবশ্য এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। সামনে মুক্ত অঙ্গন, তার উপর শিখদের চিরাচরিত প্রথায় সাদা ও গেরুয়া রং-এর কাপড় দিয়ে চন্দ্রাতপ টাঙানো হয়েছে। এরই নিচে শিখ সম্প্রদায়ের আবালবৃদ্ধবনিতা এসে সমবেত হয়েছেন। শুনলাম পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ওঁরা এসেছেন বদরিনাথের পথে ওঁদের পবিত্র তীর্থ গোবিন্দঘাট ও হেমকুণ্ড পরিক্রমায়।

গুরুদ্বারা দর্শনান্তে আমরা এগিয়ে চললাম। হৃষীকেশের এ অঞ্চলের নাম 'মুনি কি রেতি'। রাস্তার দু'ধারে দোকানপাট হোটেল রেস্তোরাঁ এলোমেলোভাবে বেড়ে উঠেছে। এসব কারণে হৃষীকেশ শহর মোটেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। রাস্তার বাঁ হাতে অনেকটা সীমানা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদের মতো একটা দোতালা বাড়ী। শুনলাম ওটা সরকারী 'টুরিষ্ট বাংলো'। রাস্তা থেকে বেশ উঁচুতে অবস্থিত। মনে হয় কোন কালে রাজপ্রাসাদ ছিল।

রোদের তাপ কমে এসেছে, আমরা এগিয়ে চলেছি। চন্দ্রভাগার পুল পেরিয়ে একটু গেলেই পবিত্র কৈলাস আশ্রম। বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য এই প্রসিদ্ধ বিদ্যানিকেতনে স্বামী বিবেকানন্দ কিছু-কাল অবস্থান করেছিলেন। কৈলাস আশ্রম তাই এক পবিত্র তীর্থ।

আরও এগিয়ে আমরা স্বামী শিবানন্দজী প্রতিষ্ঠিত Divine Life Society-র বিরাট আশ্রম দেখলাম। পথের বাঁ দিকে একটু

উঁচু জায়গার উপর মন্দির ও ভোজনালয় অবস্থিত। রাস্তার অন্য-পারে গঙ্গার তীরে অতি মনোরম পরিবেশের মধ্যে লাইব্রেরি আর একটা দোতলা বাসভবন। এই পবিত্র আশ্রমে বহু বিদেশী ও বিদেশিনী আসেন যোগসাধন কল্পে। ঐহিক বৈভব, ভোগবিলাস মানুষের মনকে যখন ক্লান্ত ও বীতরাগ করে তোলে, তখন শুরু হয় ভূমার অন্বেষণ। ভারতীয় দর্শন বলেন "ভূমৈব সুখম্। নাল্পে সুখ-মস্তি॥" আর এইখানেই দারিদ্র্যক্লিষ্ট ভারতবর্ষের আজও বিশ্ববাসীকে কিছু দেবার আছে। দুঃখ সন্তপ্ত মানব সন্তানকে আহ্বান করে সে আশ্বাসের বাণী শোনাবে—"শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"। বিশ্বের সুদূরতম প্রান্ত থেকে ভোগতৃষিত মানুষ তাই আজও ছুটে আসে নগাধিরাজ হিমালয়ের কোলে ভারতাত্মার সেই অমৃতবাণী শ্রবণ-মানসে। হিমালয়ের প্রতি কন্দরে ধ্বনিত হচ্ছে অজর অক্ষয় যে সনাতন ভারতবর্ষ—তার হৃৎস্পন্দনে স্পন্দিত তার প্রত্যন্তপ্রদেশ।

দেবতাত্মা হিমালয়, ভারতের উত্তর শিয়রের অতন্দ্র প্রহরী ধ্যান-মৌন হিমালয়, উমা মহেশ্বরের লীলাভূমি তুষার কিরীটি শোভিত হিমাদ্রি, তোমাকে জানাই কোটি কোটি প্রণাম।

স্বচ্ছন্দ মনে আমরা চলেছি আরও উত্তরে লছমন ঝোলার দিকে। মৃদু চড়াই-পথ, সূর্যদেব অস্ত-পথে। এপারে '[illegible]নি কি রেতি'। ওপারে গীতাভবন, স্বর্গাশ্রম ও ঘড়িঘর—মাঝখানে বহমানা কল্লোলিনী সুরধুনি গঙ্গা। হাঁটতে হাঁটতে আমরা গঙ্গার ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সায়াহ্নের পশ্চিমাকাশ তখন অস্তগামী সূর্যের সপ্তরশ্মিতে বিচিত্র সুন্দর রূপ ধরেছে। ওপার থেকে দলে দলে যাত্রীরা স্বর্গাশ্রমের ডিজেল এন্‌জিন্ চালিত খেয়া নৌকোয় ফিরে আসছেন। আনন্দাপ্লুত হৃদয়ে কেউ ভজন গাইছেন, কেউ পাঠ করছেন শিবস্তোত্র। নির্মল শান্তিতে যেন বিশ্বচরাচর মগ্ন।

হিমালয়ের দুর্বার আকর্ষণে যুগ যুগ ধরে কত সাধু-সন্ত-ঋষি ও যোগী তার পাদদেশ ছুটে এসেছেন। হরিদ্বার-হৃষীকেশ থেকে শুরু

করেছেন দুর্গম পথ-যাত্রা। তাই তো এ দুই শহরে প্রতি ধূলিকণা পবিত্র—যেমন পবিত্র মথুরা-বৃন্দাবনে ব্রজের রজ। বাহ্য দৃষ্টিতে এখানকার অপরিচ্ছন্ন পথ-ঘাট চক্ষুকে পীড়া দেয়। কিন্তু এসবের উর্ধ্বে ভক্তমনের দৃষ্টি চলে যায় এর অতীতের গৌরবময় দিনগুলির দিকে।

এ পুণ্য তীর্থে ত্রেতা যুগে এসেছিলেন শাপভ্রষ্ট লক্ষ্মণ। দেবাদিদেব মহাদেবের কৃপায় এখানে তাঁর দুরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধি নিরাময় হয়েছিল। আজও লছমন ঝোলা যেতে পথের দুধারে কুষ্ঠ-রোগীর ভীড়। ওরা ভাবে এখানে পথে বসে ভিক্ষা করলেই ওরাও রোগমুক্ত হবে। আজ বিজ্ঞানের যুগে কুষ্ঠরোগ যখন আধুনিক চিকিৎসায় সম্পূর্ণ নিরাময় হয়, ওদের এ বিশ্বাসে সায় দিই কি করে?

এই মহাতীর্থে দ্বাপর যুগে এসেছিলেন ভরত। ভরতজীর মন্দির আজও সেই পুণ্য স্মৃতির সাক্ষ্য দেয়। এখানে এসেছিলেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, কৌরব জননী গান্ধারী, পঞ্চপাণ্ডব ও কর্ণমাতা কুন্তীদেবী, মহাত্মা বিদুর। এ পথ দিয়েই মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর আত্মীয়বধে অনুতপ্ত পঞ্চপাণ্ডব ও পাঞ্চালী!

পরবর্তী যুগে এ পথ দিয়ে তিব্বতে গিয়েছিলেন মহাপণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। এ পথে এসেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল, সুর-সাধক দিলীপকুমার রায়, ভগবান সত্যসাই বাবা—আরও কত অগণিত মনীষী। হরিদ্বার-হৃষীকেশের প্রতি ঘাট, প্রতি অলিগলি এঁদের স্মৃতি জড়িত। এর প্রতিটি ধূলিকণা পুণ্যকামী তীর্থ-যাত্রীদের কাছে তাই এত পবিত্র। এই বিশ্বাসের পিছনে কোন যুক্তির অবতারণার অবকাশ নেই। এঁদের কাছে 'বিশ্বাসে মিলায়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর'। ঐ বয়ে চলেছেন পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা। ওর কূলে গিয়ে বস। ওপারে ধ্যান মৌন হিমাদ্রির পানে চাও, দৃষ্টি-ভঙ্গিকে পার্থিব থেকে অপার্থিবে উন্নীত কর। উপলব্ধি করবে তার

মাহাত্ম্য। তাই তো জগতের সেরা দার্শনিকরা বলে গেছেন "Metaphysics begins where Physics ends", কি সুন্দর ও সত্য কথা।

লছমন ঝোলার কুষ্ঠরোগীদের জন্য আধুনিক প্রথায় চিকিৎসা ও রোগ মুক্তির পরে তাদের পুনর্বাসনকল্পে এক বিরাট সংস্থা গড়ে উঠেছে। এর মূলে আছে স্বামী চিদানন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সংগঠন ক্ষমতা। ১৯৪৩ সালে স্বামীজি হৃষীকেশ আসেন। এখন তিনি এক বিশিষ্ট ঈশ্বর সাধক এবং Divine Life Society-র প্রধান আচার্য। তিনিই প্রথম লছমন ঝোলার কুষ্ঠ রোগীদের ঘৃণ্যব্রাত্য রূপে না দেখে সমাজ পরিত্যক্ত হতভাগ্য মানব সন্তান হিসাবে দেখেছিলেন। তাদের এই ঘৃণ্য সামাজিক জীবন স্বামীজির মনে যে বেদনা জাগিয়ে ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় এদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ঐকান্তিক প্রয়াসে। মূলত এঁদের চেষ্টায় আজ বহু রোগী আরোগ্য লাভ করে পুনর্বাসনের পর সুস্থ নাগরিক রূপে জীবন যাপন করছে।

এসব দেখে ফিরে এলাম আমাদের আস্তানা 'ভগবান আশ্রমে'। আমরা তিন বন্ধু এর ছ' নম্বর ঘরে আজ রাত্রের অতিথি। আশ্রমের যাত্রীরা সব কুলায় প্রত্যাশী বিহঙ্গের মতো ফিরে আসছেন। বড় হল ও তার পাশের ঘরগুলি দখল করেছেন 'কুণ্ডু স্পেশালে'র যাত্রীরা। ওঁরা কাল ভোরে রওনা হচ্ছেন কেদার-ত্রিযুগীনারায়ণ ও বদরিনাথ পরিক্রমায়। হলঘরের এক কোণ থেকে সুন্দর গানের আওয়াজ ভেসে আসছিল। তিন বন্ধু নিঃশব্দে সেখানে গিয়ে বসলাম। এক মহিলা যাত্রী সুললিত কণ্ঠে মীরার ভজন গাইছেন—

"প্যারে দরসন দীজ্যো আয়,
তুম বিন রহ্যো না জায়।
জল বিন কমল, চন্দ বিনা রজনী
ঐ সে তুম দেখ্যা বিন সজনী।"

মধুর কণ্ঠে প্রাণের দরদ দিয়ে ভদ্রমহিলা গাইছেন, ভক্তিরসাবিষ্ট দু' চোখে অবিরল প্রেমধারা।

আমরা নিঃশব্দে উঠে আপন ঘরে ফিরে এলাম। কাল ভোর পাঁচটার সময় গিয়ে হাজির হতে হবে বাস ডিপোতে। আসন সংরক্ষিত থাকলেও দেরীতে পৌঁছলে ভাল যায়গা বেদখল হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে।

হোটেলে রাতের খাওয়া শেষ করে এসে হোল্ডঅলে বিছানাপত্র বেঁধে রাখি। ভোর বেলায় উঠে মুখ হাত ধুয়ে কাঁধে ঝোলান থলি নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। মা যমুনা, মা গঙ্গা আমাদের যাত্রা যেন সফল হয়—এই প্রার্থনা জানিয়ে শুয়ে পড়লাম। মনে এক স্নিগ্ধ উত্তেজনা। রাত পোহালেই আমরা চলব যমুনোত্রী পথে।

রাত্রি তখন বারোটা। সমস্ত ভগবান আশ্রম যেন সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে। চারিদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ। অনন্ত নীল আকাশের বুকে ছড়িয়ে আছে রাশি রাশি তারা, ঝিক্‌মিক করছে তাদের আলো।

ভোরে ঘুম ভেঙে গেল লালগোপালবাবুর ডাকে। "চারটে বেজেছে, চট্ করে উঠে মুখ হাত ধুয়ে নিন"। তথাস্তু, বলে সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়লাম। শশাঙ্কবাবুও উঠে পড়েছেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। দু'জন কুলি ঠেলাগাড়ী করে মালপত্র নিয়ে চলল। বাস স্ট্যাণ্ডে যখন পৌঁছলাম, ঘড়িতে তখন পাঁচটা বাজতে দশ মিনিট। নম্বর মিলিয়ে বাস খুঁজে বার করলাম। দরজাগুলি বন্ধ তাই অপেক্ষা করতে হল। অনেক যাত্রী ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছেন, কেউ যাবেন কেদার-বদরি, কেউ যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী, কেউ মুসৌরী, কেউ বা অন্য কোথাও।

সাড়ে-পাঁচটা বাজতে কণ্ডাকটার বাসের দরজা খুলে দিল। করিৎকর্ম্মা লালগোপালবাবু আগেভাগে উঠে আমাদের তিনজনের জন্য প্রথম শ্রেণীর যায়গা দখল করে রাখলেন। আমার জন্য রাখা হল ড্রাইভারের পাশের, অর্থাৎ সব চেয়ে ভাল 'সিট'টি। আমি তখন বাসের ছাদের উপরে নিজেদের মালপত্র তোলায় ব্যস্ত। বিছানাগুলি 'হোল্ড-অল'-এ বাঁধার পর পলিথিনের থলেতে ভরা হয়েছে যাতে পথে বৃষ্টি হলে ওগুলি ভিজে না যায়। আমাদের মালগুলি ভালভাবে রাখা হয়েছে দেখে নিশ্চিন্তমনে বাসে এসে বসলাম।

সকাল ঠিক সাতটার সময় "জয় যমুনা মাঈ কি জয়, জয় গঙ্গা মাঈ কি জয়" 'ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে আমাদের বাস যাত্রা করল স্যানাচটির পথে। সেখান থেকে শুরু হবে হাঁটাপথে যমুনোত্রী। মন আনন্দে ভরপুর, লক্ষ্যপথে চলার এই শুরু। সেদিনের প্রথম বাসের যাত্রী আমরা। সবার আগে পৌঁছব—এও এক আনন্দ।

পিছন ফিরে দেখি বাসের জনতা শ্রেণীর বেশী অংশই জুড়ে আছেন গ্রাম্য যাত্রীরা। কথাবার্তায় মনে হল ওঁরা বিহার, উত্তর-প্রদেশ ও রাজস্থানের দিক থেকে এসেছেন। প্রত্যেকের সঙ্গে একটা একটা করে গাঁটরি—যার মধ্যে আছে লোটা, কম্বল, থালা, বাটি গেলাস, চাল, আটা আর একপ্রস্থ করে বাড়তি ধুতি, সাড়ী ও পিরান। এগুলি ভাল করে গাঁটরীতে বাঁধা। আর আছে লাঠি। ওঁরা স্বভাবতঃই যথাসর্বস্ব রাখা এই গাঁটরি বাসের ছাদে তুলতে নারাজ। নিজের কোলে বা পায়ের কাছে রেখেছেন, তাইতে আরও স্থানাভাব। ওঁদের একজন বাস ছাড়ার একটু আগে নেমে বিড়ি কিনতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন ওঁর জন্য ঠাঁই নেই। সিটের উপর রাখা ওঁর গাঁটরি সরিয়ে সেখানে অন্য একজন বসে পড়েছেন। অবধারিত পরিণতি শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধ—অবশ্যই শুধু বাক্য বিনিময়ে, বাহুবলের প্রয়োজন হবার আগেই কণ্ডাকটারের মধ্যস্থতায় শান্তিস্থাপন হল। আমার পিছনের সারিতে লালগোপাল ও শশাঙ্কবাবু। তার পাশে এককোণে দেখলাম সৌম্য অভিজাত দর্শন মধ্য বয়সী এক ভদ্রলোক। পরস্পরের পরিচয় বিনিময়ে জানতে পারলাম ওঁর নাম মুরলীধর সাকসেনা। উনি চলেছেন বারকোট। থাকেন নরেন্দ্রনগরে, সেখানে বাজারে ওঁর কাটা কাপড়ের দোকান আছে। জিজ্ঞাসা করলাম নরেন্দ্রনগরের উপর দিয়েই তো আমাদের বাস যাবে, উনি হৃষিকেশ থেকে উঠলেন কেন। মুরলীধর বললেন উনি হরিদ্বার এসেছিলেন কিছু মালের অর্ডার দিতে, সে কাজ হয়ে গেছে, এখন চলেছেন বারকোট। ওঁর এক ছেলে সেখানে পুলিসের দারোগা, তার কাছে ৭।৮ দিন থেকে নরেন্দ্রনগর ফিরে আসবেন। নাতনি দুটি ওঁর বড় পেয়ারের, ওদের টানে মাঝে মাঝে ছুটে যেতে হয় নরেন্দ্রনগর থেকে। অন্যান্য বার গৃহিণীও সঙ্গে থাকেন, এবার হরিদ্বারে এসেছিলেন বলে তাঁকে আনেননি। শশাঙ্কবাবু বললেন "তাহলে নাতনিদের দেখতেই চলেছেন বলুন"

ঠিক তাই, জানেন তো "দুধসে মিঠা মালাই"। ছেলেমেয়েদের চেয়ে নাতিনাতনীদের আকর্ষণ অনেক বেশী। সবাই হেসে উঠলাম।

সাকসেনার পাশে এলেন মাঝ-বয়সী এক ভদ্রলোক, শ্যামবর্ণ লম্বা চেহারা, মুখে চুরুট তার ডগায় ছাই-এর লম্বা column ঝুলছে। লালুবাবুর পাশে ঝুপ করে বসে পড়তেই চুরুটের ছাইটা ছড়িয়ে পড়ল ওঁর সদ্য তৈরী ৫২ টাকা দামের প্যান্টের উপর। ভদ্রলোক অপ্রস্তুত, বার বার বলতে লাগলেন "মাফ্ কিজিয়ে জনাব গল্‌তি হো গিয়া" একেবারে চোস্ত উত্তরপ্রদেশী উর্দু ভাষা। লালু-বাবুর হিন্দির দৌড়ও সেই রকম। উনি বলে উঠলেন, "ঠিক হ্যায়, কি আর করা যায়গা"। বলে প্যান্টের উপর থেকে সদ্যপড়া গরম ছাইটা ঝেড়ে ফেলতে লাগলেন। পুড়ে না গিয়ে থাকে প্যান্টটা। সারা জীবন কেটেছে ধুতি পাঞ্জাবি পরে, গতবার কেদার-বদরি যাত্রায় ধুতি পরে "বাবু মরে ভাতে আর শীতে" অবস্থা হয়েছিল। এবার তাই আমাদের উপরোধে হিমালয়ে চলার জন্য এই টেরিকডের প্যান্ট করিয়েছেন। এহেন প্যান্টের উপর চুরুটের ছাই পড়তে লালুবাবুর অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন।

চুরুটধারী ভদ্রলোক এদিকে লালুবাবুর হিন্দি শুনে বলে উঠলেন "আরে দাদা, আপনি বাঙালী আছেন দেখছি, আমিও তো বাঙালী, আমার নাম ডাক্তার হেমেন নাগ, ইউ. পি. সরকারে চাকরি করি, দেরাদুন সে বদলি হয়ে টিহরি যাচ্ছি, দেখুন তো সিগারের ছাই না পড়লে আমাদের আলাপ হোত না।" আমরা সবাই প্রাণ খুলে হেসে উঠলুম। পরস্পরের পরিচয় বিনিময় হবার পর বল্‌লাম, ডাক্তার নাগ, আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে খুব ভাল লাগছে, আরও ভাল লাগছে আপনার বাংলা ও লালুবাবুর হিন্দি আলাপ শুনে।

ডাঃ নাগ হো হো করে দিল্‌খোলা হাসি হেসে উঠলেন। ওঁর সঙ্গে আস্তে আস্তে বেশ গল্প জমে উঠল। অনেক দিন পরে বাঙালী সাথী পেয়ে ও বাঙলায় কথা বলতে পেরে উনিও খুব খুশি।

আমাদের বাস শুকনো চন্দ্রভাগা নদীর উপর পাকা পুল পার হয়ে একটু চ'লেই দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে চেয়ে দেখি কয়েকটা টাক্‌সি ও মিনিবাস দাঁড়িয়ে। ড্রাইভারের কাছে জানা গেল এটা 'মুনি কি রেতি' পুলিশ চেক্ পোস্ট। এখানে আমাদের কলেরা প্রতিষেধক ইনজেকসন নেবার প্রমাণপত্র হিসাবে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখাতে হবে।

যাত্রীদের সার্টিফিকেট দেখা-পর্ব শেষ হতে আমাদের বাস ছেড়ে দিল। মুনি-কি-রেতি ছাড়িয়ে শুরু হল চড়াই-পথ। পথের দুধারে একে একে মন্দির ও আশ্রম পার হয়ে চল্‌লাম। ড্রাইভারের পাশের সিটে জাঁকিয়ে বসেছি, সামনে ও দুদিকের দৃশ্য সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে। অল্পদূর এগিয়ে লছমন-ঝোলার একটু আগেই আমাদের বাস মূল রাস্তা থেকে বাঁদিকে ঘুরে চলল। মূল রাস্তা চলে গেছে কেদারনাথ-বদরিনাথ তীর্থপথে। বাসের ভিতর থেকে আবার মিলিত কণ্ঠের ধ্বনি উঠল "যমুনা মাঈ কি জয়, গঙ্গা মাঈ কি জয়"

আমাদের বাস চড়াই-পথে চলেছে। বাঁ দিকে পাইন ও দেওদার গাছের গহন বন। ডান দিকে নিচে মোটামুটি সমতল ভূমি উপত্যকার মতো দেখাচ্ছে। যত উপরে উঠছি ততই নিচের দূন-উপত্যকা, সেখানকার গাছপালা ও ঘরবাড়ীগুলি ছোট হয়ে আসছে। মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ। নিচে মাঠের উপর সূর্যকিরণের ছটা সুন্দরভাবে প্রতিফলিত। আমরা গঙ্গাকে ডান দিকে রেখে বাঁয়ে ঘুরে এসেছি, তাই তাঁকে আর দেখতে পাচ্ছি না, বস্তুত এখন কোনো নদীই আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ছে না, আমরা চলেছি চড়াই-পথে।

মুরলীধর সাকসেনা বললেন একঘণ্টার মধ্যেই আমরা নরেন্দ্র-নগর পৌঁছব। তার আগে পর্যন্ত দুধারের দৃশ্য প্রায় একই রকম। বাসও চল্‌বে মোটামুটি চড়াই পথে। সাক্‌সেনাজীকে জিজ্ঞাসা

করলাম "আপনি তো অনেককাল নরেন্দ্রনগর বাসী, এ যায়গা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলুন না।" উনি তো খুব খুশি, বললেন ওঁর পূর্বপুরুষরা টিহরি রাজবাড়ীতে রাজকুমারদের গৃহশিক্ষক ছিলেন। উনি নিজেও বাল্যকালে কুমারদের সাথী ছিলেন। এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলতে পারবেন।

নরেন্দ্রনগর এখন টিহরি জেলার সদর শহর। টিহরির স্বর্গীয় রাজা নরেন্দ্র শাহ্ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই শহর। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁর এতই ভাল লেগেছিল যে তিনি টিহরি থেকে রাজধানী এখানে স্থানান্তরিত করে এনেছিলেন। গ্রীষ্ম-কালের কয়েকমাস প্রতাপনগরে থাকা ছাড়া তিনি স্থায়ীভাবে নরেন্দ্রনগরেই বাস করতেন। অতি সুপরিকল্পিত আধুনিক কায়দায় রাজা এ শহরটিকে গড়ে তোলেন। সুন্দর বাড়ীঘর, রাজকীয় কর্মদফ্তর, কোর্ট-কাছারি বাজার ও দোকান পাট, বাগান পার্ক-সবই ছবির মতো সুন্দর। আধুনিক প্রথায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করা আছে। এ সবই রাজার আধুনিক রুচি ও প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয় দেয়। এ সব ছাড়াও রাজা নরেন্দ্র শাহ্র চিত্রশিল্পের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। রাজপ্রসাদের কলাভবনে অতি সুন্দর চিত্র সংগ্রহ ছিল। এগুলির মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী মোলারামের অঙ্কিত 'অষ্টনায়িকা' চিত্রপটগুলিই অপূর্ব শিল্পকলার নিদর্শন। এই মোলারাম ছিলেন একেধারে চিত্রশিল্পী ও প্রখ্যাত হিন্দি কবি। তাঁর পূর্বপুরুষরা সম্রাট শাহ্জাহানের দরবারে রাজশিল্পী ছিলেন, পরে তাঁরা হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলে চলে এসে গাড়োয়ালী চিত্রশিল্পের সৃষ্টি করেন। লালুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'অষ্টনায়িকার' অর্থ কি? মুরলীধর বললেন, অষ্টনায়িকা একপ্রস্থ অষ্টভাবের চিত্রকলার সমষ্টি। একধারে শিল্পী ও কবি মোলারাম তুলি ও রং-এর সাহায্যে আঁকা ছবিগুলির মধ্য দিয়ে যে রূপ ও মাধুরীর সৃষ্টি করেছেন তা সত্যই অপূর্ব।

তাঁকে গাড়োয়ালী শিল্প ঘরানার স্রষ্টা বললেও অত্যুক্তি হয় না।

রাজা নরেন্দ্র শাহ্ মোলারামের উত্তরাধিকারী বালকরামের কাছ থেকে অষ্টনায়িকা সেট ও অন্যান্য ছবি সংগ্রহ করেন। দুঃখের বিষয় বর্তমানে সেগুলি ব্রিটিশ সরকারের মেহেরবাণীতে ইংলণ্ডের কোন চিত্রশালার শোভা বর্ধন করছে। স্বাধীন ভারত সরকার আজও ওগুলো দেশে ফিরিয়ে আনবার কোন ব্যবস্থা করেননি, একটু ক্ষোভের সঙ্গে এ মন্তব্য করলেন সাক্‌সেনাজী। লালুবাবু বললেন, ত্রিবান্দ্রামে সরকারী চিত্রশিল্প সংগ্রহশালায় কাংড়া ও রাজস্থানী পটের সঙ্গে গাড়োয়ালি ঘরানার মোলারামের আঁকা ছবি দেখেছি মনে পড়ছে। 'প্রবাসী' পত্রিকাতেও অনেকগুলি ছবি প্রকাশিত হয়েছিল।

মুরলীধর সাক্‌সেনা আরও বললেন, ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যায় প্রায় ছয়শত বছর আগে আসাম থেকে খাসিয়া রাজারা টিহরি গাড়োয়াল অঞ্চল আক্রমণ করে এর কিছু অংশ অধিকার করে তাঁদের রাজ্য স্থাপন করেন। স্থানীয় অধিবাসীরা কিন্তু এদের বশ্যতা স্বীকার করেনি। প্রকাশ্যে বা গোপনে তারা প্রায়ই রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকে। পাহাড়ী অঞ্চল হওয়ায় লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে তারা গেরিলা কায়দায় যখন তখন আক্রমণ করে খাসিয়া শাসকদের নাস্তানাবুদ করে তুলতে লাগল। বেগতিক দেখে রাজারা আকবরী কায়দায় গাড়োয়ালি রাজন্যবর্গের মেয়েদের বিবাহ করে আত্মীয়তা সূত্র দৃঢ় করবার চেষ্টায় মন দিলেন।

এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের রাজনীতি কিছুটা সফলও হল। বিদ্রোহ অবসানে খাসিয়া রাজারাও শান্তিতে রাজত্ব করার সুযোগ পেলেন। খাসিয়া ও গাড়োয়ালিদের মিশ্র পাহাড়ী নরনারীর মিলনে এক ভিন্ন গোত্রীয় সমাজের সৃষ্টি হল। আচারব্যবহার, ভাষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে এক সঙ্কর সংস্কৃতির জন্ম হল।

. খাসিয়া রাজাদের গরিমাময় দিন কালে ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায়

বৌদ্ধধর্ম এ অঞ্চলে প্রাধান্যলাভ করেছিল। মন্দিরগুলিও তাই গড়ে উঠেছে বৌদ্ধ মঠের ঢঙে। অবশ্য হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলে অধিকাংশ মন্দিরের স্থাপত্য শিল্পে বৌদ্ধ স্থাপত্যের প্রভাব বর্তমান। সেটা তিব্বতের সঙ্গে নৈকট্যর জন্য অথবা কিছু অংশ কোনকালে তিব্বতীদের অধিকারে ছিল বলে—একথা বলা কঠিন এবং এ বিষয়ে পরস্পর বিরোধী মতামত আছে। যেমন কেদারনাথের মন্দির এককালে বৌদ্ধমঠ ছিল। জগৎগুরু শঙ্করাচার্য একে হিন্দুমন্দির বলে প্রমাণ করেন। এই যোগীশ্রেষ্ঠ আচার্য অসামান্য ধীশক্তির সাহায্যে প্রবল পরাক্রান্ত বৌদ্ধধর্মের প্রভাব খর্ব করে আর্যাবর্তে হিন্দুধর্মকে তার স্বমহিমায় পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ও তাঁর সুযোগ্য শিষ্যবর্গ বদরিনাথেও বহু বৌদ্ধকে হিন্দুধর্ম মাহাত্ম্যে প্রভাবিত করে, বদরিনাথের বিগ্রহকেও হিন্দু বিগ্রহ বলে ঘোষণা করেন। আজও বদরিনাথের বিগ্রহ হিন্দুর কাছে নারায়ণ, বৌদ্ধের কাছে তথাগত ও জৈনের কাছে পার্শ্বনাথ—যে ভক্ত যে রূপে দেখেন।

গাড়োয়ালিরা কিন্তু অনার্য খাসিয়াদের আধিপত্য কোনদিনই মনে প্রাণে মেনে নেয়নি। যুদ্ধবিগ্রহ প্রায়ই লেগে থাকত। ওদের রাজা সোমপাল তাঁর মেয়ের বিবাহ দিয়েছিলেন কনকপালের সঙ্গে। শোনা যায় এই কনকপাল নাকি বাঙালী ছিলেন এবং রাজনীতিতে তিনি অতি বিচক্ষণ ছিলেন। 'Divide & Rule' এই ছিল তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের মূলমন্ত্র। সকল গড়াধীশের সঙ্গে নিজে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে তিনি তাঁদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ বাধিয়ে দিতেন। নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ করে অবধারিতভাবে তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়তেন এবং তখন রাজা কনকপালের ছত্রছায়ায় শরণ নিতে হ'ত। ক্ষেত্র বিশেষে এক পক্ষকে পরাস্ত করে তিনি অপর পক্ষকে সাহায্য ক'রতেন। এইভাবে অসামান্য বুদ্ধিবলে তিনি গড়াধীশ সমূহের মধ্যে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করতেন।

রাজা কনকপালই টিহরির রাজবংশের আদিপুরুষ। তাঁর ৩৭তম বংশধর অজয়পাল প্রশাসনিক সুবিধার জন্য চাঁদপুর গড় থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করে প্রথমে দেবল গড়ে এবং আরও পরে শ্রীনগরে নিয়ে আসেন। দক্ষিণ গাড়োয়ালের গড়াধীশরাও ক্রমে অজয়পালের বশ্যতা স্বীকার করেন। এ অঞ্চলের বাহান্নটি গড় আপন আধিপত্যে এনে অজয়পাল এ অঞ্চলের প্রধানরূপে নিজেকে ঘোষণা করেন ও এ রাজ্যের নাম করেন 'গড়বাল'। 'গড়' অর্থ দুর্গ 'বাল' অর্থ প্রধান। চলতি ভাষায় গড়বালের নাম হয় গাড়োয়াল। তাঁর বংশধর বলভদ্রপাল সম্রাট আকবরের কাছ থেকে 'শাহ' উপাধি পান ও সুখশান্তির মধ্যে রাজত্ব করতে থাকেন। খাসিয়া রাজাদের প্রতিপত্তি বা প্রভাবও ধীরে ধীরে চলে যায়। প্রায় পাঁচ শত বৎসর আগে গড়বালের স্থাপনা হয়।

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ কখনো স্থায়ী হয় না, ইতিহাসের চক্র নিত্য পরিবর্তমান। গাড়োয়ালের আকাশে বিপদ ঘনিয়ে এল রাজা প্রদ্যুম্ন শাহর আমলে। ১৮০৩ সালে সেনাপতি তাঁর নেপালী পত্নীর প্ররোচনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন ও গুর্খাদের শরণাপন্ন হলেন। শান্তির নীড় গাড়োয়ালে জ্বলে উঠল অশান্তির আগুন। এই যুদ্ধে গুর্খারা চারিদিকে নিরীহ গাড়োয়ালীদের হত্যা করে তাদের ঘর দুয়ার জ্বালিয়ে দিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন রাজধানী শ্রীনগর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে শ্মশানে পরিণত করল। রাজা "য পলায়তে স জীবতি" নীতি অনুসরণ করে টিহরিতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এর বার বছর পরে প্রদ্যুম্ন শাহ্‌র পুত্র রাজা সুদর্শন শাহ্‌ এক মারাত্মক রাজনৈতিক ভুল করে বসলেন। গুর্খাদের সায়েস্তা করতে তিনি ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

ইতিহাস শুধু নিত্য পরিবর্তনশীলই নয়, সে ঘটনার পুনরাবৃত্তিও করে। ১৮১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে মাকওয়ানপুরে ইংরাজ বনাম নেপালীদের

যে যুদ্ধ হয় তাতে নেপালীরা পরাস্ত হয়ে শুধু যে সম্পূর্ণ গাড়োয়াল এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয় তাই নয়, তাদের রাজধানী কাঠমুণ্ডু শহরে ইংরাজদের রেসিডেন্সি পত্তন করতে দিতেও বাধ্য হয়। ইংরাজদের পক্ষ নিয়েছিলেন বলে গাড়োয়ালের রাজা আবার স্বাধীনতা ফিরে পেলেন, কিন্তু তা নামেই। কুমায়ুন অঞ্চলের মধ্যে ইংরাজদের অধিকারে এল দেরাদুন, শ্রীনগর ও সমগ্র কেদার-বদরি এলাকা—রাজ্যের অর্ধেকেরও বেশী এবং সমৃদ্ধিশালী অংশগুলি। এ অঞ্চলের নাম হল 'ব্রিটিশ গাড়োয়াল'। যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী পেয়ে রাজা আশ্রয় নিলেন টিহরিতে ও সেখানেই রাজধানী স্থাপন করলেন। ব্রিটিশ ও দেশীয় গাড়োয়াল রাজ্যের সীমানা হল 'মেহেল চৌরি'। রাজা সুদর্শন শাহ্‌কে মনের দুঃখে এ ব্যবস্থা মেনে নিতে হল। তিনি তখন শক্তিহীন। প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবেন, সে ক্ষমতা কোথায়।

এই পর্যন্ত বলে মুরলীধর সাকসেনা টিহরি-গাড়োয়ালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শেষ করলেন।

লালুবাবু বলে উঠলেন, একদা ইংরাজ বণিক সংস্থা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্য লোলুপতার প্রকৃষ্ট পরিচয় তো সে যুগে অন্যান্য রাজন্যবর্গরাও পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছিলেন--

"বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী,
দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে।"

শশাঙ্কবাবু প্রশ্ন করলেন স্বাধীনতার পর এ অঞ্চলের প্রশাসনিক কাঠামো কি রূপ গ্রহণ করেছে। মুরলীধর বললেন ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার অল্প পরেই স্বর্গীয় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যে রাজনৈতিক দক্ষতার সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলির সংযুক্তি বিধান করেন তাতে সব রাজন্যদেরই রাজত্ব চলে যায়!

হিমালয়ের এ পাহাড়ী অঞ্চল তখন উত্তর প্রদেশ রাজ্যের অন্তর্গত দুটি জেলায় ভাগ হল। টিহরি, যার রাজধানী হল টিহরি শহর এবং

গাড়োয়ালের রাজধানী হল চামোলী। মাত্র কয়েক বৎসর আগে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য টিহরি জেলাকে খণ্ডিত করে দুটি জেলা করা হয়েছে, টিহরি—যার সদর সহর নরেন্দ্র নগর এবং উত্তরকাশী। উত্তরকাশী জেলার প্রধান সহর হয়েছে উত্তরকাশী।

আমরা সকলে মুরলীধরবাবুকে এই তথ্যসমৃদ্ধ কাহিনী শোনাবার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম।

বাস ইতিমধ্যে নরেন্দ্র নগরের কাছাকাছি এসে পড়েছে। কিছু দূর থেকেই এক প্রাসাদোপম অট্টালিকা দেখতে পাচ্ছিলাম। মুরলীধর বললেন ঐ হচ্ছে নরেন্দ্র নগর রাজপ্রাসাদ। একটা বেশ উঁচু টিলার উপর অনেকটা এলাকা জুড়ে অনেকটা 'গথিক' স্টাইলে গড়া প্রাসাদটি বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। বাস যত নরেন্দ্র নগরের নিকটবর্তী হচ্ছে, প্রাসাদও স্ফুটতর হচ্ছে। একটু পরেই আমরা বাস স্ট্যাণ্ডে এসে পৌছলাম, বেলা তখন আটটা বেজেছে। ড্রাইভার ঘোষণা করলেন, এখানে কুড়ি মিনিট চা পানের বিরাম। আমরা অবিলম্বে বাস থেকে নেমে পড়লাম।

বাস স্ট্যাণ্ড অনেকটা 'চক'-এর মতো,বেশ চওড়া। ডানধারে বড় লম্বা পাকা বাড়ী, তার ভিতর নানা জিনিসের দোকান। আমরা একটা চা-জলখাবারের দোকানে, ঢুকে পড়লাম, মুরলীবাবুকেও সঙ্গে আনলাম। উনি বললেন আগেই বলেছি রাজা নরেন্দ্র শাহ নরেন্দ্র নগরকে সর্বতোভাবে একটা আধুনিক শহরে গড়ে তুলেছিলেন। হাটবাজার, ডাক ও তার অফিস, হাসপাতাল, কোর্ট কাছারি, সরকারী কর্মচারীদের ঘর বাড়ী—সবই সুপরিকল্পিতভাবে গড়া।

বাস স্ট্যাণ্ডের উপর আমাদের বাঁ ধারে পাথরের তৈরী এক বিরাট বৃষমূর্তি। অর্ধবৃত্তাকার যায়গার ঠিক মাঝখানে দণ্ডায়মান ঝাণ্ডাচক। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের দিনে সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সভা সমিতির আয়োজন করা হয়।

আমাদের চা পান শেষ হয়েছিল, দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। 'চকে'র চারিদিক ঘিরে মোটামুটি কর্মব্যস্ত নরেন্দ্র নগর। ডানদিকে লম্বা পাকা বাড়ীটির পিছনের জমি ধীরে ধীরে উপরে উঠে গেছে। তার ধাপে ধাপে আছে ছোট ও মাঝারি আয়তনের বাড়ীগুলি। রাজ প্রাসাদ এখান থেকে অনেকটা দূর, দেখে আসতে অনেকটা সময় লাগবে। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল অতক্ষণ এখানে থাকা সম্ভব নয়, স্যানাচটি এখনও বহুদূর, সন্ধ্যার আগেই সেখানে পৌঁছতে হবে। অগত্যা আমরা নিরস্ত হলাম।

একটু পরেই আমাদের বাসের বাঁশী বেজে উঠল, আমরা যে যার জায়গায় বসে পড়তেই বাস ছেড়ে দিল।

স্ট্যাণ্ড ছেড়ে একটু পরেই বাস বাঁ দিকে মোড় ঘুরল। নরেন্দ্র নগরের ঘর বাড়ী ও প্রাসাদ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল। আমরা একটা তোরণের নিচু দিয়ে চলে এলাম। চেয়ে দেখি ইঁট-পাথরের থামের উপর দিয়ে বড় পাইপ লাইন চলে গেছে। মুরলীধর বললেন ওটা শহরের পানীয় জলের পাইপ লাইন।

হৃষিকেশ থেকে এ পর্যন্ত আমাদের বাস মোটামুটি পিচ ঢালা, চওড়া ও মসৃণ রাস্তা দিয়ে এসেছে। এবার রাস্তা ক্রমশঃ সরু আকাবাঁকা ও বন্ধুর হতে লাগল। অনেক জায়গায় দুখানি বাস পাশাপাশি চলতে পারে না। একখানা পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অন্যখানাকে যাবার পথ দেয়। কোথাও বা এগোতে পিছতে হয়। বিপদসঙ্কুল অপ্রশস্ত পথ। একপাশে গভীর খাদ, অন্যপাশে আকাশচুম্বী পাহাড়। পিছনে তাকালে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এদিককার বাস ড্রাইভাররা কিন্তু অবলীলাক্রমে পথ করে দেয় অন্য বাসকে যেতে। অসাধারণ এদের দক্ষতা ও উপস্থিত বুদ্ধি।

বাসের এঞ্জিন বিরাট গর্জন করতে করতে একের-পর-এক পাহাড়ী বাঁকের চড়াই অতিক্রম ক'রে চলেছে। মাঝে মাঝে মনে

হচ্ছে যেন আর টানতে পারছে না। অনেক জায়গায় বাস থামিয়ে পথের ধারের ঝরনা থেকে ঠাণ্ডা জল এনে এন্‌জিনের রেডিয়েটারে ঢেলে তাকে ঠাণ্ডা ও চালু রাখছে।

বাস ধীরে-ধীরে চড়াই পথে এঁকে-বেঁকে চলেছে। সামনে নয়ন মনোহর দৃশ্য। একধারে খাড়া পাহাড়, অন্য ধারে খাদের কোলে গ্রামের ছোট-ছোট ঘরগুলি দৃষ্টিপথে এসে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আরও কিছু দূর চলে বাস এসে দাঁড়াল 'জাজল'। বেলা তখন নটা বাজে। বাস এখানে দশ মিনিট দাঁড়াবে। ছোট জায়গা, অল্প ক'ঘর লোকের বসতি, কিন্তু জাজল অদূর ভবিষ্যতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিণত হবে। সমুদ্র তীর থেকে এর উচ্চতা ২৯০২ ফুট। দেব প্রয়াগ থেকে সোজা মোটর যাবার রাস্তা যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রীর পথে এখানে এসে মিশবে। রাস্তা তৈরীর কাজ প্রায় সম্পুর্ণ, আগামী বছর থেকেই এ পথে বাস চলবে আশা করা যায়। তখন যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী দেখে যাত্রীরা জাজল হয়ে সোজা দেবপ্রয়াগ চলে যাবেন কেদার-বদরির পথে। উত্তরাখণ্ডের তীর্থ পথের দূরত্ব ও সময় দুই কমে যাবে।

জাজলের কোল দিয়ে বয়ে চলেছে একটি ছোট পার্বত্য নির্ঝরিণী, নাম তার কালী নদী। ওপারে নদীর তীর থেকে উঠে গেছে পাহাড়। তার ধাপে ধাপে বোনা ফসলের খেত। একজন স্থানীয় ব্যক্তি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন এখানে পাহাড়ের ধাপের ঐ ক্ষেতে খুব ভাল ফসল হয়। বছরে পাঁচবার চাষ আবাদ হয়, তাও বেশ পর্যাপ্ত পরিমাণে। চাল, গম, আলু, পেঁয়াজ ও তামাক—এই পঞ্চশস্যের ফলনের জন্য জজাল ও তার আশ-পাশ বিখ্যাত। আর একজন দেখাল কালী নদী থেকে জল সরু, পাকা নালার সাহায্যে নিয়ে ক্ষেতে দেওয়া হচ্ছে। তাতেই ফসলের সমৃদ্ধি বাড়ছে।

স্থানীয় অধিবাসীরা কঠোর পরিশ্রম করে জমিতে চাষ করছে।

বছরে পাঁচ ফসল, তাও এই তরাই অঞ্চলে। এখানকার লোকের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা করতে হয়। দেখলাম মেয়ে ও পুরুষরা সমানে চাষের কাজে হাত লাগিয়েছে।

সরকার এ অঞ্চলে বাঁধ তৈরী ক'রে জলধারণ ও জল-বিদ্যুৎ উৎপন্নর যে সব প্রকল্প হাতে নিয়েছেন তা কার্যে পরিণত হবার পর এ অঞ্চলের কৃষি ও শিল্পোন্নয়ন দ্রুততর হবে। একদিকে খেতে ভরে উঠবে সোনার ফসল, অন্যদিকে শিল্পকেন্দ্রগুলির সম্প্রসারণে অর্থনৈতিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে। হিমালয়ের দেবমহিমা খর্ব হবে। গড়ে উঠবে শিল্পে নির্ভর নগরসভ্যতা। হিমালয় পথ যাত্রীর আকর্ষণও স্বাভাবিক ভাবেই বহুলাংশে কমে আসবে, কিন্তু উপায় কি ?

জাজলের চারদিক ঘিরে পাহাড়। বাস রাস্তা ঘাটশ্রেণীর মধ্য দিয়ে এঁকে-বেঁকে উঠে গেছে।

আমাদের বাস ঠিক দশ মিনিট বিরতির পর আবার চলা শুরু করল। লাল সিং ও তার সহকারী ইতিমধ্যে গরম এনজিনকে আর এক দফা ঠাণ্ডা জল খাইয়ে ঠাণ্ডা করে নিয়েছে। বেশ চাঙ্গা হয়ে বাসও সগর্জনে ছুটতে শুরু করল।

জাজল থেকে পাঁচ মাইল গিয়ে আমরা নাগনী পৌছলাম। এখানে এসে দেখা গেল বাসের এনজিন আবার গরম হতে শুরু করেছে। ড্রাইভার পরীক্ষা করে বলল Fan Belt ছিঁড়ে গেছে, ওটা বদলি করতে মিনিট দশেক সময় লাগবে। আমরা এই অবসরে নেমে পড়লাম স্থানীয় কিছু দেখব ও শুনব বলে।

নাগনী একটি ছোট্ট গ্রাম। বাস রাস্তার দু'ধারের দৃশ্য নয়না-ভিরাম। ছোট ছোট বাড়ীগুলি পাহাড়ের ঢালে বসান। রাস্তার ধারে দু-তিনটা চা-খাবারের দোকান। আর আছে মুদিখানা, তারই এক অংশে ডাকঘর। মুদিখানার মালিকই পোস্ট মাস্টার। এক সঙ্গে দু-কাজই সারেন। রাস্তার বাঁ ধারে ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে ছোট

ছোট আলবাঁধা ধানের খেত। কোথাও ধান কোথাও বা গমের চাষ হচ্ছে— সবই ঐ ছোট ছোট আল বাঁধান জায়গায়। নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে ক্ষীণ কায়া নির্ঝরিণী। তার জল তুলে চাষের কাজে লাগান হচ্ছে।

ওদিকে দেখি চা-পকোড়ার দোকানের সামনে একটা ট্যাক্সিকে ঘিরে কুড়ি-পঁচিশ জন লোকের ভীড়। ট্যাক্সিটা এসেছে হৃষিকেশ থেকে। এক নিলামদার একটা সেলাই-এর কল নিলামে হাঁকছে। এক্, দো, তিন্ করতে করতে আমাদের চোখের সামনেই ওটা বিক্রি হয়ে গেল নব্বুই টাকায়।

বাসের বাঁশি বেজে উঠল। ইতিমধ্যে এনজিনে নতুন Fan Belt পরান হয়ে গেছে। আমরা যে যার জায়গায় এসে বসতেই বাস ছেড়ে দিল।

নাগনী ছাড়তেই আমাদের বাস একই সঙ্গে চড়াই ও উৎরাই-এর পথ পরিক্রমা শুরু করল। একই ধরনের দৃশ্য। ডাইনে পাহাড় আর বাঁয়ে খাদ। যত উপরে উঠছি গাছপালার সংখ্যা তত কমে আসছে। এভাবে পাঁচ মাইল চড়াই-উৎরাই শেষ করে আমরা চম্বা এসে পৌঁছলাম।

সমুদ্রতীর থেকে ৭৫৩০ ফিট উঁচুতে অবস্থিত চম্বা বা চামুয়া এ পথে একটি সমৃদ্ধশালী স্থান। দূর থেকে চম্বাকে বড় সুন্দর দেখায়। যেন মনোরম পাহাড়ী স্টেসনের একটি ছোট সংস্করণ। বাঁ দিকে পাহাড়ের ঢালে ঘরবাড়ী গুলি যেন ধাপে ধাপে বসানো। ডানদিকে বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে খানিকটা যায়গা সমতল—ওরা বলল 'চক'। তার চারপাশ ঘিরে নানা দোকান-পাট। এগুলির অধিকাংশই 'হরেক্ মাল ইধার মিলে' শ্রেণীর। মুদিখানা থেকে শুরু ক'রে জামা-কাপড়, রান্নার মসলাপাতি, মনিহারী জিনিস—মায় খাম-পোস্টকার্ড পর্যন্ত সবই পাওয়া যায়। তেমনি আবার চায়ের দোকানে চা, বিসকিট, জিলাপি, পকোড়া থেকে শুরু দুপুরে ও রাত্রে ভাত-রুটির ব্যবস্থাও

থাকে। প্রয়োজনে দূর পাল্লার যাত্রী রাত্রে শোবার ঘর বা সিট পেয়ে থাকেন কিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্যের বিনিময়ে।

লাল সিং বলল বাস এখানে পনের-কুড়ি মিনিট থামবে। আমরা কজন মুরলীধরবাবুকে নিয়ে চায়ের দোকানে ঢুকে এক কাপ চা নিয়ে বসলাম। দোকানি চমনলাল বেশ চালাক-চতুর ও ওয়াকিবহাল। সে বলল চামুয়ার দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। এখন একে ছোট শহর বললেই চলে। এখানে যেমন মন্দির আছে তীর্থ যাত্রীদের জন্য, তেমনি আবার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার শাখা, ডাক ও তার অফিস এবং উচ্চ মানের স্কুলও আছে। সরকার জনসাধারনের স্বাস্থ্য সম্পর্কেও বেশ সচেতন। এখানে ওঁরা একটি বড় স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছেন। এছাড়া ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটি পরিচালিত একটা হাসপাতালও আছে।

চমনলাল আরও বলল স্টেট ব্যাঙ্ক থাকার জন্য ব্যাবসায়ীদের বেশ সুবিধা হয়েছে। চামুয়া এ অঞ্চলের মোটামুটি বড় ব্যাবসাকেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠছে। সব মিলিয়ে এখানে প্রায় তিনশ দোকান আছে। স্থানীয় ফসলের মধ্যে চা ও গমই প্রধান। আশে পাশে আলুর চাষও হয়।

চামুয়া থেকে একটি পায়েচলা পথ মুসৌরীর দিকে চলে গিয়েছে। বড় রাস্তার বাঁ ধারে একটা টিনের বোর্ড। তাতে লেখা আছে "ROAD TO MUSSOURI"। চামুয়া ছেড়ে একটু দূরেই পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তাটা উপরে উঠে গিয়েছে। মাঝে-মাঝে ঘন বনের মধ্যে হারিয়ে সে পথ কিছু দূরে আবার এসে দেখা দিয়েছে।

চমনলাল স্থানীয় লোক। দোকান ছাড়া ওর কিছু ক্ষেতিও আছে। ওর কাছে শুনলাম শীঘ্রই টিহরিতে জলের বাঁধ তৈরি হবে। তাতে নাকি এ অঞ্চলের নব্বুইটা গ্রাম ডুবে যাবে। গ্রামবাসীরা খুব ভাবনায় পড়েছে। সরকার ওদের বুঝিয়েছেন যে বাঁধ তৈরী হয়ে

গেলে এ অঞ্চলে জলের অভাব মিটবে, চাষ আবাদেরও অনেক উন্নতি হবে। ছোট-বড় কল-কারখানা গড়ে উঠবে, তাতে স্থানীয় লোকদের চাকরির সুরাহা হবে। বাঁধ তৈরী করতে গিয়ে যে সব গ্রাম ডুবে যাবে তাদের বাসিন্দাদের চামুয়ার আশপাশের গ্রামগুলিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। কোন কোন রাজনৈতিক দলের লোক ওদের উস্‌কানি দেবার চেষ্টা করছেন এই বলে যে সরকার তাদের বাপদাদার ভিটে থেকে উৎখাত করছেন, বাঁধ তৈরী হলে লাভ হবে সমতলের বড় বড় শহরবাসীদের। পাহাড়ীদের অবস্থা থাকবে যে তিমিরে সেই তিমিরে, গরিবীও হটবে না। চমনলাল বলল এ সব উস্‌কানিতে অবশ্য বিশেষ ফল হবে বলে মনে হয় না, বাঁধ তৈরী হবেই।

আমার মনে, পড়ল ১৯৪৭-৪৮ সালের কথা, তখন আমি সম্বলপুরে বদলি হয়ে এসেছি। হীরাকুদ বাঁধের পরিকল্পনা রূপায়িত হতে চলেছে। ওড়িষার কিছু শক্তিমান রাজনীতিবিদ্‌ স্থানীয় লোকদের বোঝাবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন যাতে হীরাকুদ বাঁধ তৈরী না হয়, হলে অনেক গ্রাম ডুবে যাবে, বহু লোক গৃহহীন হবে। ওঁরা জড় করলেন কয়েক হাজার লোক—বেশীর ভাগই আদিবাসী। তারা বড়-বড় মিছিল করে সম্বলপুর শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ধ্বনি দিতে লাগল "হীরাকুদ নিপাত যাও, নেহরুরাজ নিপাত যাও"··· ইত্যাদি। এ সব সত্ত্বেও ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হীরাকুদ বাঁধ আজ সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে—তার দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে গান্ধী-মিনার ও জওহরমিনার। যেন দুটি জয়স্তম্ভ।

শুরুর সমস্ত বাধা-বিঘ্ন কাটিয়ে টিহরির এই জল বাঁধ তৈরীও একদিন সম্পূর্ণ হবে। এ অঞ্চলে আনবে সমৃদ্ধি ও শিল্পপ্রসার।

শশাঙ্কবাবু বলে উঠলেন, "Dogs bark, Caravan goes on".

আমাদের চা খাওয়া শেষ হয়েছিল। দোকানের বাইরে এসে

দাঁড়ালাম। সামনে তুষারাচ্ছন্ন হিমালয় শৃঙ্গ। চমনলাল বলল ও পাহাড়ের উচ্চতা ২২৭৭০ ফিট। ওর ওপারেই কেদারনাথ। কি সুন্দর দৃশ্য।

লাল সিং-এর সহকারী ঘনঘন হর্ন বাজাচ্ছে। আমরা বাসে উঠে বসলাম। "যমুনামাঈ গঙ্গামাঈ কি জয়" ধ্বনির মধ্য দিয়ে আমাদের বাস ছেড়ে দিল।

এবার লম্বা পাড়ি। একেবারে টিহরি পর্যন্ত। বার মাইল এই পথের মাঝে আর কোথাও আমরা থামব না। এতক্ষণ বিকট গর্জন করতে করতে ও মাঝে মাঝে শীতল জল পান করে আমাদের বাস দুরন্ত চড়াই পথ অতিক্রম করে এসেছে। এবার তার আরামের পালা। উৎরাই পথে সে গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে। সাধারণতঃ উৎরাই পথেও ড্রাইভারকে খুব সতর্ক থেকে গাড়ী আয়ত্তের মধ্যে রাখতে হয়। কিন্তু এদিককার ড্রাইভাররা অত্যন্তঃ দক্ষ ও স্থিরবুদ্ধি। অনায়াসে বাস চালিয়ে যায়, এমনকি চলতি পথের নানা বর্ণনা দিয়ে গাইডের কাজও করে। অথচ বাস চালিয়ে যায় অতি সহজ, সতর্ক ও সচেতনভাবে।

আমরা উৎরাই পথে চলেছি। এখানে অনেকটা রাস্তা অপ্রশস্ত, বন্ধুর। পিচ উঠে গিয়ে পাথর বেরিয়ে পড়েছে। তার উপরে কিছু আগে অল্প বৃষ্টি হওয়াতে আবার 'গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডং সংবৃত্তম্'— অর্থাৎ কর্দমাক্ত, পিচ্ছিল। তার উপর দিয়ে বাস ধীরে ধীরে ও খুব সাবধানে চলেছে। কোথাও ওর মাঝে ধস্ নেমে রাস্তা আরও বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে যখন উল্টো দিক থেকে বাস বা ট্রাক আসছে, তখন তাকে পথ করে দিতে আমাদের বাস স্বল্প প্রশস্ত পথের একেবারে কিনারায় চলে আসছে। সে সময় নিচের দিকে তাকালে শরীরের রক্ত হিম হয়ে যায়। কোন রকমে গড়িয়ে পড়লে বাস দিয়াশালাই কাঠির বাক্সের মতো গুঁড়িয়ে যাবে,আমরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। লাল সিং-এর মুখ দেখে কিন্তু বোঝা গেল তার

অন্তরে মোটেই আস্থার অভাব নেই। সুদক্ষ সারথী, নিশ্চিন্ত মনে বাসের হাল ধরে আছে।

আমরা ক্রমেই নিচের দিকে নামছি। চামুয়া থেকে টিহরি পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার ফিট নামতে হবে।

এক সময় উৎরাই পথ, পাহাড় ও খাদ মিলিয়ে গেল, আমরা সমতলে এসে পৌছলাম। কি স্বস্তি। লালুবাবু কবিগুরুর কবিতা 'কালের যাত্রার ধ্বনি'র কলি উদ্ধৃত করে বললেন, মনে হচ্ছে যেন "অজস্র মৃত্যু পার হয়ে আসিলাম"।

আমাদের বাস এবার সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা মাঠের বুক ভেদ করে ছুটে চলল। দু-পাশের পাহাড় দূর থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে। সোজা রাস্তা চলেছে সবুজ শস্যপূর্ণ মাঠের মাঝ-দিয়ে। হৃষিকেশ ছাড়বার পর সমতল ভূমির ওপর দিয়ে এই প্রথম চলেছি। দু-পাশে মাঠের ধারে চাষীদের ঘরবাড়ী, খেত খামার। গরু বাছুর, ছাগল ও ভেড়ার দল নিশ্চিন্তমনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চাষীদের ঘরের সঙ্গে লাগোয়া ধানের মরাই, ও গোয়াল ঘর পশ্চিম বাংলা ও বিহারের গ্রামগুলির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

এভাবে কয়েক মাইল ছুটে আমাদের বাস এসে দাঁড়াল টিহরির চৌমোহানীতে। টিহরি শহর এখান থেকে দু-মাইল দূরে। লাল সিং বলল এখানে আমাদের সকলকে নেমে যেতে হবে। ও যাবে টিহরি শহরে। সেখানে থানায় হাজিরা দিয়ে ডিজেল তেলে বাসের ট্যাঙ্ক ভর্তি করতে হবে। যাত্রী থাকলে জন প্রতি ২৫ পয়সা টোল দিতে হয়, কেন মিছে এ পয়সা খরচা করা। টিহরি থেকে এ পথেই ফিরে এসে আবার আমাদের তুলে নিয়ে যাত্রা করবে। ডাঃ নাগ টিহরি শহরে নামবেন। উনি বদলি হয়ে এসে আজই সেখানে গিয়ে কাজে যোগ দেবেন। উনি ছাড়া মাত্র আর পাঁচজন যাত্রী আছেন টিহরি নেমে যাবার। এঁরা কজন মাত্র বাসে থাকবেন। আমি, শশাঙ্ক ও

লালুবাবু ঠিক করলাম টিহরি শহর দেখব। পঁচিশ পয়সা করে টোল লাগলে উপায় কি ?

আমাদের অনুরোধে মুরলীধরবাবুও সঙ্গী হলেন। লাল সিংকে বলে আমরা বাসে থেকে গেলাম।

অন্য যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে বাস আমাদের নিয়ে চলল টিহরি। চৌমোহানী থেকেই টিলার উপরে অবস্থিত টিহরি শহর দেখা যাচ্ছিল, অল্পক্ষণ পরেই বাস শহরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। সামনেই চা-মিঠাই-এর দোকান। আমরা সেখানে ঢুকে পড়লাম। ডাঃ নাগও আমাদের সঙ্গেই নামলেন। উনিও চা, জলখাবার খেয়ে সোজা অফিস মুখে রওনা হবেন। হৃষিকেশ থেকে আমরা একসঙ্গে এসেছি। এবার দিলখোলা এই পথের বন্ধুকে বিদায় দিতে হবে ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

সাকসেনাজি বললেন টিহরি এ জেলার সবচেয়ে বড় উপত্যকা। এর একদিকে গঙ্গা, ভীল গঙ্গা ও ঘৃত নদীর সঙ্গম, অন্যদিকে পাহাড় ঘেরা—এর মাঝে টিহরি শহরটি ছবির মতোই সুন্দর। পাহাড়ের গায়ে বসান বাড়ীগুলি যেন শৌখীন পরিকল্পনা মতো সাজান। একের নিচে বা একের উপরে বসান ঘরগুলি দেখাচ্ছেও সুন্দর—যেন দার্জিলিং বা সিমলা শহরের 'ম্যাল'-এ এসে দাঁড়িয়েছি। অবশ্য আয়তনে ওদের চেয়ে অনেক ছোট। চারিদিকে ছড়ান পাইন গাছের ভিতর দিয়ে বাড়ীগুলি যেন উঁকি দিচ্ছে। মাথার উপর সূর্যদেব কখনও মেঘমুক্ত আকাশ থেকে সমস্ত রশ্মি বিকিরণ করছেন, কখনো বা মেঘের আড়াল থেকে ম্লান আলো ছড়িয়ে পথিকের জন্য চন্দ্রাতপ সৃষ্টি করছেন।

আগেই বলেছি টিহরি জেলার সদর দফতর এখন নরেন্দ্র নগর। টিহরি এখন অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দেয়। আমাদের হাতে আধ-ঘণ্টা সময়, এর মধ্যে পুলিশ চেক-পোস্টে ফিরে এসে বাস ধরতে হবে। তাড়াতাড়ি একটা ট্যাকসি ভাড়া করে শহর দেখতে বেরিয়ে

পড়লাম, গাইড্ হিসাবে মুরলীধরবাবু তো সঙ্গেই আছেন। একটু এগিয়েই দেখলাম একটা ঘণ্টাঘর ও তার গম্বুজাকৃতি মাথায় বসান মস্ত বড় ঘড়ি। গম্বুজে রাজস্থানী শিল্পের যথেষ্ট প্রভাব বর্তমান। এর সঙ্গে টিহরি রাজদের রাজ্য হারিয়ে দুঃখের দিনগুলির স্মৃতি জড়িত।

আধঘণ্টা সময় শেষ হয়ে আসছে। ইতিমধ্যে টিহরি শহরের রাজবাড়ী ও দফতরগুলি ঝটতি পরিক্রমা করে তাড়াতাড়ি পুলিশ চেক-পোস্টে এসে অপেক্ষামান আমাদের বাসে উঠে বসলাম। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফিরে এসেছি দেখে লাল সিংও খুশি। ও বাস ছেড়ে দিল। আমরা চারজন ছাড়া আরও দুজন যাত্রী এখান থেকে উঠলেন, ওঁরা যাবেন ধরাসু, সেখান থেকে অন্য বাস ধরে উত্তরকাশী।

বাস ধীরে-ধীরে নিচে নামতে লাগল। রাস্তা ভাল নয়, লাল সিং সাবধানে চালাচ্ছে। একটু পরেই আমরা চৌমহানীতে পৌঁছে বাসের বাকী যাত্রীদের তুলে নিয়ে এগিয়ে চললাম।

সমতল উপত্যকা পার হয়ে আমরা আবার চলেছি চড়াই-পথে। টিহরি ছাড়িয়ে ভাগীরথীর সাক্ষাৎ পেলাম। হৃষিকেশে তাঁকে ছেড়ে এসেছিলাম। পথ এবার নদীর ডান তীর দিয়ে। আমাদের বাস তার উপর দিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ করে ঘুরে ঘুরে উপরে উঠছে। বাঁ দিকে পাহাড়, ডান দিকে খাদের নিচ দিয়ে ভাগীরথী প্রবহমান। গৈরিক বসনা, নৃত্য চপলা কলধ্বনিরতা ভাগীরথী। কিছুদূর গিয়ে দেখলাম ওর উপর একটা ঝুলন্ত সেতু, তার উপর দিয়ে পায়েচলা পথ। ওপার-দিয়ে সে-পথ চলে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে-বেঁকে। নদীর দু-ধারে ধাপে ধাপে বসান ধানের খেতে পাহাড়ী পুরুষ ও মেয়েরা চাষ করছে। বাস অনেক উপর দিয়ে চলেছে তাই ওদের অনেক ছোট দেখাচ্ছে। ধান খেতের উপরে হালকা জঙ্গল, তার ভিতর দিয়ে গ্রাম্য কুটিরগুলি যেন উঁকি মারছে। গঙ্গার জলের ঢেউ-এর উপর সূর্যকিরণের ছটায় ঝিকিমিকি।

সব মিলিয়ে এক সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছি।

কয়েক মাইল গিয়ে উপপু গ্রাম পেরিয়ে আমাদের বাস আবার উঠছে দুরন্ত চড়াইপথে। মুহুর্মুহু সর্পিল বাঁক বা Hairpin Bend অতিক্রম করে চলেছে। গঙ্গা বাঁয়ে চলেছেন বহু নিচে গভীর খাদের মধ্য দিয়ে। ক্রমেই ছোট হয়ে তাঁকে একটা রুপোলী রেখার মতো দেখাচ্ছে। শশাঙ্কবাবু খাদের দিকের সিটে বসে বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। উনি বলে উঠলেন বা! কি সুন্দর অথচ কি ভয়ঙ্কর! এযে দেখছি হুবহু বদরিনাথের পথে পিপুলকুঠী পার হয়ে পাতাল গঙ্গার দৃশ্য। সেই সর্পিল চড়াই পথ, তেমনি গভীর ও খাড়া খাদের নিচু দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী ও তার উপর সূর্যকিরণের ঝিকিমিকি। অবিকল একদৃশ্য।

দেখতে-দেখতে টিহরি থেকে ছ-মাইল এসে আমরা ছাম-এ পৌঁছলাম। বেলা তখন দুটা, সবাই ক্ষুৎপিপাসায় অধৈর্যপ্রায়। লাল সিং একটা হোটেলের সামনে বাস দাঁড় করাল। মাটিতে পা দিয়েই সেদিকে ছুটলাম। কিন্তু বিধি বাম। খাবার কি পাব জিজ্ঞাসা করাতে হোটেলওয়ালা জবাব দিল ভাত বাড়ন্ত, তবে হাতে-গড়া রুটি পাওয়া যাবে, সেই সঙ্গে তরকারী আর মাংস। মিনিট দশেক অপেক্ষা করলে অবশ্য ভাতও পাওয়া যাবে, উনুনে চাল ফুটছে। বাঙালীর অন্নগত প্রাণ ততক্ষণে ফুটন্ত 'দেরাদুন রাইস'-এর সুবাসে, চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অতএব কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলেও ভাতই চাই, রুটি নৈব নৈব চ।

উনুনে ভাতকে ফুটতে দিয়ে আমরা রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।

'ছাম' মোটামুটি সমতল ভূমির উপর, রাস্তার বাঁ ধারের জমি ক্রমশঃ উপরে উঠে গিয়েছে। সেখানে ছোট ছোট বাড়ী। পাকা দেওয়ালের উপর টিন বা এ্যাস্‌বেস্‌টসের ছাদ। ডান ধারে সমতল যায়গায় ধান ও গমের খেত।

বাস রাস্তার দুধারেই মুদিখানা, মনিহারী ও চা-এর দোকান। আর আছে দু-তিনটা ভাত-রুটির হোটেল। পাঁউরুটি, বিসকুট ও হরলিকস্ শুধু দুর্লভ নয়, দাম ও খুব বেশী। দোকানী বলল প্রায় সব জিনিসই হৃষিকেশ থেকে আনতে হয়, তাই খরচ বেশী পড়ে যায়।

মিনিট কুড়ি পরেই হোটেলের মালিক আমাদের ডাকল। পাতে সুগন্ধি ভাত, সঙ্গে ডাল, তরকারী, কাঁচা পেঁয়াজের কুচি ও চাটনি। ঘ্রাণে ও দর্শনেই অর্ধভোজ সমাপ্ত হল। বলা বাহুল্য বাড়িতে যে পরিমাণ খাই তার চেয়ে অনেক বেশী খেয়েও পেটে যায়গা থাকল। উদর দেবতা পরিপূর্ণ তৃপ্ত হলে বাসে গিয়ে বসলাম। আমরা উঠে বসতেই বাস ছেড়ে দিল। ধ্বনি উঠল, "জয় যমুনামাঈ, জয়গঙ্গা মাঈ।"

কত প্রান্তর, কত গুহাবন ও অগণিত জনপদ পেরিয়ে অসীম আগ্রহ সহকারে আমরা যমুনা ও গঙ্গা মাঈর দেশে চলেছি। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমরা এসে মিলিত হয়েছি হৃষিকেশে। সেখান থেকে অনেকেই বহু কষ্ট করে বাসের টিকিট পেয়েছেন। তীর্থ দর্শনের আকাঙ্খায় তাঁরা সে সব উপেক্ষা করে এই দুর্গম, বিপদসঙ্কুল পথ পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। এঁদের মধ্যে কেউ পরিব্রাজক, কেউ পুণ্যকামী, কেউ বা শুধুই ভ্রমণ পিয়াসী, কিন্তু তবু এঁরা একই সূত্রে বাঁধা—সেই সূত্র হিমালয়। ঐ যে আদিগন্ত বিস্তৃত তুষারমৌলী নগাধিরাজ, ওরই সূতার আকর্ষণ সকলকে পাগল করেছে। হিমালয়ের মোহঅঞ্জন যে একবার নয়নে পরেছে তার আর নিস্তার নেই। ফিরে-ফিরে তাকে আসতে হবে এই দুর্গম পথে।

আমাদের বাস ছুটে চলেছে ধরাসুর পথে। দুপুরে গুরু ভোজনের পর অনেকেই নিদ্রালু চোখে ঢুলছেন, কেউ বা মৃদু নাসিকা গর্জনও করছেন। সারথী-লাল সিং দক্ষ হাতে বাসের হাল ধরে

তাকে আকাবাঁকা চড়াই পথে নিয়ে চলেছে। অনেক নিচু দিয়ে চলচপলা গেরুয়া বসনা ভাগীরথী এঁকে-বেঁকে বয়ে চলেছেন। স্রোতের টানে ঢেউগুলি নদীর বুকে বড় বড় পাথরে আছড়ে পড়ছে ও ঘুর্ণির মতো পাক দিয়ে চলে যাচ্ছে। কোথাও বা বড় পাথরের মাথার উপর দিয়ে জল উপচে পড়ে চলে যাচ্ছে। তারপর পাথরের মুণ্ডিত মস্তক পরিষ্কার। কয়েক সেকেণ্ড পরে একটা বড় ঢেউ এসে আবার সেই দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি।

ভাগীরথী কিন্তু বেশীক্ষণ দৃশ্যমানা রইলেন না, একটু পরেই দু-পাহাড়ের বাঁকের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আকা বাঁকা চড়াই-উৎরাই পথ ধরে আরও কিছুক্ষণ চলবার পর আমরা ধরাসু পৌঁছলাম। এখান থেকে প্রায় এক মাইল উত্তরে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর পথের সঙ্গম। বিদেশীদের গতিবিধি এর আগে নিষিদ্ধ। বাঁ দিকে যমুনোত্রী মুখো স্যানা-চটির রাস্তা, ডান দিকের পথ চলে গেছে উত্তরকাশী হয়ে গঙ্গোত্রী ও গোমুখের দিকে। দু-পথের সঙ্গমের মুখে নিশানা "WAY TO GANGOTRI"

ধরাসু এককালে এপথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। এটাই ছিল যমুনোত্রী যাবার পথে বাসের শেষ ঘাঁটি।

দোকান পাট, হোটেল, ধর্মশালা ও বাস স্ট্যাণ্ডে অগণিত তীর্থ যাত্রী ও পর্যটকের আনাগোনায় সেকালে ধরাসু সব সময় কর্মচঞ্চল থাকত। ডাক্তারী চেকপোস্টে নূতন করে কলেরা ইনজেকসন নেবার ছাড়পত্র পরীক্ষা করা হত। যদি কেউ কোন রকমে হৃষিকেশে ফাঁকি দিয়ে এসে থাকেন এই সন্দেহে। কালী কম্‌লিওয়ালার ধর্মশালায় স্থান পাওয়াও খুব কঠিন ছিল।

আজ ধরাসুর গরিমাময় দিন শেষ হয়েছে। বাসপথ এগিয়ে গিয়েছে আরও অনেক দূর—স্যানাচটি পর্যন্ত। আজ ধরাসু তাই এপথে চা ও নাস্তা খাবার জন্য স্বল্প বিরতির বাস স্টেশন মাত্র। আমরা এমনিতেই দেরীতে চলেছি, সন্ধ্যার আগে স্যানাচটি পৌঁছতে

হবে। বাস তাই মাত্র দশ মিনিট এখানে বিরতি দিয়ে আবার চলা শুরু করল।

ধরাসু থেকে এগার মাইল এগিয়ে আমাদের বাসটি গেঁওলাতে এসে থামল। সামনেই পুলিশের ফাঁড়ি। কণ্ডাকটার খাতা নিয়ে নেমে গেল। গেঁওলা মোটামুটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। রাস্তার দু-পাশে দু-ফালি সমতল যায়গা, সেখানেই বাস স্ট্যাণ্ড, দোকানপাট। চারদিক পাহাড়ে ঘেরা। তার ঢালে কোথাও ঘরবাড়ী, কোথাও বা খেত-খামার। কণ্ডাকটার ফিরে আসতে বাস ছেড়ে দিল।

এর পর আমরা সিলকিয়ারি, ডাণ্ডিলগাঁও ও অন্য দু-একটা ছোট জায়গা পার হ'য়ে এগিয়ে চললাম। চড়াই পথে দুদিকে চীর গাছের ঘন বন বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

হিমালয়ের সব কিছুই সুন্দর। যেমন শুভ্র তুষারমণ্ডিত গিরি-শ্রেণী, তেমন অফুরন্ত ফুলের ভাণ্ডার, তেমনি আবার চীর, পাইন ও দেওদার বনের ছড়াছড়ি। এক জায়গায় লাল সিং দেখাল চীর গাছগুলির বাকল চাঁছা। তাদের গায়ে সরু তার দিয়ে বাঁধা একটি করে মাটির বা এ্যালুমিনিয়মের গেলাস। গাছের গা থেকে চুঁয়ে-চুঁয়ে রস পড়ে সেগুলি গেলাসের ভিতর জমা হচ্ছে। এই রস থেকে থেকে তৈরী হবে 'রজন'—যা ধুপ তৈরী করতে লাগে। 'রজন' এস্রাজ ও বেহালার ছড়িতেও ঘষা হয় বাজাবার আগে।

মনে পড়ল দু-বছর আগের কথা। কেরলের রাজধানী ত্রিবান্দ্রাম থেকে মোটরে টেক্কাডি চলেছি পেরিয়ার নদীর হ্রদ ও তার তীরে Wild Games Sanctuary দেখতে। পথে এক জায়গায় মাইলের পর মাইল রবার গাছের বাগানের মধ্য দিয়ে আমাদের গাড়ী চলেছে। গাছগুলির বাকল চাঁছা ও তাদের গায়ে গেলাস বাঁধা। তার মধ্যে চুঁয়ে-চুঁয়ে রবারের রস পড়ছে।

আজকের দিনে অবশ্য একমাত্র বনজ সম্পদের উপরই রবার

উৎপাদন নির্ভরশীল নয়। সূক্ষ্ম রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দেশে-বিদেশে খুব উন্নত মানের রবার তৈরী হচ্ছে।

বিকাল এখন সাড়ে-চারটা। আমাদের বাস সমুদ্র তীর থেকে ৬২০০ ফুট উপর দিয়ে চলেছে। চড়া রৌদ্রতাপ সবে কমে আসতে শুরু করেছে। এক জায়গায় লাল সিং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখাল খাদের নীচে একটা ট্রাক চূর্ণ বিচূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। শুনলাম দুদিন আগে ওটা রাস্তা থেকে গড়িয়ে পড়েছে। ড্রাইভার ও তার সঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু ঘটেছে। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! আমার গা কেঁপে উঠল।

লাল সিং বলল, মহারাজ, ট্রাক বা বাস খাদে গড়িয়ে পড়ে চুরমার হওয়া এ পথে বিরল নয়।

মনে পড়ল পাঠানকোট থেকে কাশ্মীর শ্রীনগরের পথে 'খুনী নালা'র নিচে যাত্রীবাহী বাস দুর্ঘটনার কথা। সেখানে নাকি প্রেতাত্মারা হাতছানি দিয়ে বাস ড্রাইভারদের এই মৃত্যু ফাঁদে নিয়ে যায়। তাই সে জায়গার নাম হয়েছে 'খুনী নালা'।

এর পর আমরা রাণীকাণ্ডা পার হয়ে চললাম। এখানকার ভগবতী মন্দির প্রসিদ্ধ! খুব বড় মেলা হয়। রাণীকাণ্ডা সমুদ্রতীর থেকে ৭২০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। বাস এবার উৎরাই পথে হুহু করে নেমে চলল। দুধারে ঘন বন, বহু নিচে খাদ। একের পর এক 'ঘুম' বা 'Hairpin Bend' অতিক্রম করে চলেছে। এক জায়গায় চোখে পড়ল নিশানা বোর্ডে লেখা ৬৫০০ ফুট। অর্থাৎ আমরা এই অল্প সময়ের মধ্যে ৭০০ ফুট নেমে এসেছি।

বাস হুহু করে নেমে চলেছে। ড্রাইভার কোথাও ইনজিন বন্ধ করে, কোথাও বা চড়াই ওঠার গিয়ারে চালাচ্ছে। তার গোঁ-গোঁ শব্দে কানে তালা লাগার উপক্রম। আমার পিছনে লালুবাবু নিদ্রালু চোখে তখনো ঢুলছেন—সম্ভবতঃ দুপুরে গুরু ভোজনের ফলে। শশাঙ্কবাবু তন্ময় হয়ে চারিদিকের সৌন্দর্য উপভোগ করছেন। ওঁর

কবি-মনে লেগেছে রং-এর ছোঁয়াচ। রবীন্দ্র কবিতার ভাণ্ডার থেকে মাঝে-মাঝে আবৃত্তি করে চলেছেন আপন মনে। পিছনের সারিতে রাজস্থানী ভাই-বহিনরা ওঁদের মুখিয়ার সঙ্গে আগামী কাল হাঁটা পথে যাত্রার পরিকল্পনা করতে ব্যস্ত। মুরলীধরবাবু তৈরী হচ্ছেন। একটু পরেই বাস বারকোট পৌঁছলে উনি নেমে যাবেন। আমি ড্রাইভার লাল সিং-এর পাশে বসে পেরিয়ে যাওয়া স্থানগুলি দেখতে দেখতে নানা প্রশ্ন করছি। সেও পাকা হাতে বাস চালাতে-চালাতে উত্তর দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সামনের দিকে সদা সজাগ দৃষ্টি। নিজের দক্ষতায় সম্পূর্ণ আস্থাবান।

এভাবে চলতে-চলতে বিকাল পৌনে-ছটা নাগাদ আমাদের বাস বারকোট এসে পৌঁছল। স্যানাচটি যাবার মূল পথ থেকে গতি পরিবর্তন করে দু-মাইল দূরে বারকোট। ফিরবার সময় আবার এ দু-মাইল এসে আমাদের মূল পথ ধরতে হবে।

মুরলীধরবাবু বাস থেকে নেমে পড়লেন। ওঁকে বিদায় জানাতে আমরাও নেমে দাঁড়ালাম। হৃষিকেশ থেকে উনি আমাদের সঙ্গী ছিলেন। জ্ঞানী ও মিষ্টভাষী এই ভদ্রলোক সারাপথ এ অঞ্চলের নানা রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক তথ্য শুনিয়েছেন। ওঁকে বিদায় দিতে মনটা খারাপ লাগল। উনি একটু পরেই নিজ পরিবার পরিজনের মধ্যে পৌঁছে যাবেন ও তাদের নিয়ে আনন্দমেলা বসবে, তাই মন প্রফুল্ল। তবুও আমাদের বিদায় দিতে ওঁর মনও বিষণ্ণ। লালুবাবু দার্শনিকের মতো বলে উঠলেন, এ দুনিয়াতে আমরা সবাই মুসাফির। চলার পথে কত সঙ্গী পাব, কত সঙ্গী ছাড়ব, ঘুরতে-ঘুরতে কোনদিন আবার দেখা হয়ে যাবে, এতে মন খারাপ করবার কি আছে? চরৈবেতি, চরৈবেতি।

বাস দাঁড়িয়েছে একটা চা-মিঠাইএর দোকানের সামনে। আমরা সেখানে ঢুকে চা ও জলযোগ সেরে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বাস এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াবে। কণ্ডাক্টার খাতা নিয়ে থানায় গেছে।

লাল সিং গেল 'গাড়োয়াল মোটর ওনার্স ইউনিয়ন' অফিসের স্থানীয় শাখা অফিসে।

বারকোট উত্তরকাশী জেলার মহকুমা শহর। সুতরাং সরকারী দফতর, থানা, কাছারি, বাজার, স্কুল, ডাকঘর, বিশ্রামাবাস—সবই এখানে আছে। হৃষিকেশ থেকে আমরা এসেছি ১১৫ মাইল। সময় লেগেছে প্রায় ১১ ঘণ্টা। এ স্থানের উচ্চতা ৬০০০ ফুট।

বাস রাস্তা থেকে অল্প নিচু দিয়ে বয়ে চলেছেন যমুনা, প্রশস্ত তার বেলাভূমি। একটু নেমে নদীর ধারে এসে দাঁড়ালাম। জল অল্প, কিন্তু বেশ স্রোত। তার উপর পশ্চিম আকাশের সূর্য কিরণ পড়ে ঝলমল করছে। ওপারে ছোট ছোট সবজি ও অন্য ফসলের খেত, তার শেষে উঠে গেছে ঘন পাইন সমাকীর্ণ পাহাড়ের চড়াই। সব মিলে এক অপরূপ দৃশ্য।

বাস ছাড়বার হর্ন বাজাচ্ছে, আর দেরী না করে আমরা স্ট্যাণ্ডে ফিরে এলাম। যাত্রীরা সকলে বাসে উঠে বসেছেন। মুরলীধরবাবু নেমে গেছেন, ওঁর সিটে বসেছেন অন্য একজন। শুনলাম উনি যমুনোত্রীর পাণ্ডা, চলেছেন স্যানাচটি। ভাবলাম ভালই হল ওঁর কাছে যমুনোত্রীর অনেক তথ্য জানা যাবে।

বাস ছেড়ে দিল। যাত্রীরা সমস্বরে "যমুনা ম ? কি জয়" ধ্বনি দিয়ে উঠলেন। সবার মনে আনন্দ। যমুনোত্রীর পথে আমরা অনেকটা এগিয়ে এসেছি। আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই স্যানাচটি পৌঁছে যাব। কাল সকাল থেকে শুরু হবে যমুনোত্রীর দুস্তর চড়াই-ভাঙ্গা হাঁটা-পথ।

নদীর ধারের আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে লাল সিং অতি দক্ষহাতে বাস চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। চার মাইল গিয়ে আমরা গাংনানি পৌঁছলাম। হাঁটাপথে এটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। যাত্রীরা এখানে ধর্মশালা ও চটিতে রাত্রিবাস করে যমুনোত্রীর পথে এগোতেন। আজ এর অবস্থা ভাঙা হাটের মতো। দু-একটা চা

জলখাবারের দোকান ও কাঠের ঘর অতীতের স্মৃতি বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। বাস এখানে দাঁড়াল না।

গাংনানি পার হয়ে রাস্তা খারাপ, অসমতল ও পাথরভরা, তার উপর পিচ ঢালা নেই। কিছু দূর গিয়ে যমুনার তীরে খরালী গ্রাম পার হলাম।

বাসের রাস্তা ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে। আগে ছিল বারকোট পর্যন্ত। তার পর এগিয়ে গেল গাংনানি, কুথনৌর। মাত্র দু-বছর আগে যাওয়া যাত্রীরাও হেঁটেছেন কুথনৌর থেকে। আজ বাস আরও এগিয়ে চলে যায় যমুনা চটির উপর দিয়ে স্যানাচটি পর্যন্ত।

আমরা সবাই উৎফুল্ল, আর অল্প দূর গেলেই এযাত্রা বাস পথের শেষ। দিনের আলো নিভে আসছে। সূর্য পশ্চিম পাটে পাহাড়ের আড়ালে। একটু পরে কুথনৌর পার হয়ে বাস চলল। পথের দু-ধারে বেশ কয়েকটা দোকান। মোটামুটি ঘন বসতিপূর্ণ। বাস পথ আজ আরও এগিয়ে গেছে। কুথনৌরের গুরুত্বও তাই ক্ষীয়মান। আজ গাংনানির মতো এ জায়গাও পড়ে আছে অবহেলিত হয়ে।

বাস এগিয়ে চলেছে। একটু পরে পাণ্ডাজী দূরে দেখালেন যমুনা চটি। ছোট ছোট বাড়ী নিয়ে যমুনার তীরে দাঁড়িয়ে আছে। বাস রাস্তা কিছু উপর দিয়ে চলে গেছে। আরও ক-মিনিট পরে আমরা যমুনার পুল পার হলাম। রাস্তা এখন বেশ খারাপ ও আঁকা-বাঁকা। দিনের আলো ক্রমেই কমে আসছে। লাল সিং খুব সাবধানে পাহাড়ের গা ঘেঁষে বাস চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পাণ্ডাজী এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যমুনোত্রী যাত্রায় আমাদের পাণ্ডার দরকার আছে কিনা। আমরা 'না' বলাতে এ প্রসঙ্গে আর অগ্রসর হলেন না।

যমুনা চটি পার হয়ে ছোট গ্রাম উজরি পথে পড়ল। পাণ্ডাজি বললেন, এর পরেই আসবে স্যানাচটি।

আরও প্রায় ৪০ মিনিট আঁকা-বাঁকা বন্ধুর পথ পার হওয়ার পর একটা বাঁকের মুখে দেখা গেল অল্প দূরে অনেকগুলি ঘরবাড়ী, ও

একটা প্রশস্ত সমতল মাঠের উপর কয়েকটা বাস দাঁড়িয়ে আছে। পাণ্ডাজী বলে উঠলেন, ঐ দেখা যাচ্ছে স্যানাচটি, আমরা এসে গেলাম। বাঁক ঘুরে বাস যমুনার পুলের উপর এসে পড়ল। পার হয়েই স্যানাচটি। লাল সিং নিরাপদে আমাদের বাসকে এনে স্ট্যাণ্ডে দাঁড় করাল। "যমুনা মাঈ কি জয়" ধ্বনি দিতে-দিতে সকলে বাস থেকে নেমে পড়লাম। সময় তখন সাড়ে সাতটা, দিনের আলো নিভে গিয়ে সন্ধ্যা ঘনায়মান।

একটা বড় সমতল মাঠের এক পাশে লম্বা একটা টিনের শেড। তা যাত্রী বোঝাই। ঠিক যেন সরাইখানা। যে যার বিছানা পেতে মাথার দিকে কাঠের উনুন জ্বেলে রুটি-পাকাতে শুরু করেছে। একটা মাত্র শেড, তাতে কত যাত্রীই বা জায়গা পেয়েছে। বাকী সবাই সামনের খোলা জায়গায় লোটা-কম্বল ও বিছানা রেখেছে। মাথার কাছে কাঠের উনুন জ্বেলে ওরা রান্না করছে। এভাবে অন্ততঃ দু-হাজার যাত্রী ওখানে জমায়েত হয়েছেন। দেখলাম এঁদের অধিকাংশই উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও রাজস্থানের গ্রামদেশ থেকে এসেছেন যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী তীর্থ পরিক্রমায়। কেউ বা এ দু-তীর্থ সেরে যাবেন কেদারনাথ-বদরিনাথ। কয়েকখানা যাত্রীবাহী বাস যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী ঘুরে কেদার-বদরি যাবে। ওঁরা একসঙ্গে উত্তরাখণ্ড তীর্থ পরিক্রমা সম্পূর্ণ করবেন।

সমতল জায়গাটার অন্যধারে গড়ে উঠেছে চা ও খাবারের দোকানগুলি, যেখানে সকাল বিকালে চা-জলখাবার, দুপুরে ও রাত্রে ভাত-রুটি-তরকারী মিলিয়ে ভোজনের ব্যবস্থা। দোকানের ভিতর যে পেট্রোম্যাকস্ বাতি জ্বলছে তাতে দোকান ও তার চারপাশ আলোকিত করেছে।

দোকানগুলির ডান পাশে আধুনিক কায়দায় তৈরী সরকারী যাত্রীনিবাস। লালুবাবু ওখানে একখানা ঘর পাবার জন্য বাস থেকে নেমেই ছুটে ছিলেন। এখন এসে বললেন ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই

ছোট সে যাত্রী নিবাসে। "অতঃ কিম্?" বলে উঠলেন শশাঙ্কবাবু। কি বিপদ! আমি ও লালুবাবু ছুটলাম নদীর ধারে ধর্মশালা ও চটি-গুলির দিকে। কিন্তু হায়, সেখানেও একই অবস্থা, একতলা, দোতলা ঘর, বারান্দা—সবই যাত্রী বোঝাই। একজন দালাল গোছের লোক এসে বলল, শেঠ, আসুন, আমি একটা কামরা যোগাড় ক'রে দিচ্ছি। এ কথা বলে সে একটা চটির দোতলায় একখানা ঘর দেখাল। অন্ধকার ও বোটকা গন্ধে ভরপুর। নাকে রুমাল দিয়ে পালিয়ে এলাম। লালুবাবু বললেন, আকাশের নিচে রাত কাটাব সেও ভাল, তবু এমন কামরায় নয়। বৃষ্টি হয় বর্ষাতি আছে, 'হোল্ড অল' ঢাকার পলিথিনের চাদরও আছে।

বাইরে তখন প্রচণ্ড শীত, আকাশে অল্পঅল্প মেঘও জমেছে, রাত্রে হয়ত বৃষ্টি হবে। বেশ ভাবনায় পড়লাম।

এমন সময় দেখি সামনে দিয়ে এক সিপাইজি চলেছেন। জয়মা, এই সুযোগ। এগিয়ে গিয়ে সিপাইজিকে নিজেদের পরিচয় দিয়ে দুরবস্থার কথা বলে ওঁর সাহায্য চাইলাম। উনি বললেন, সে কি কথা, আপনারা অত দূর থেকে আসছেন, জায়গা পাবেন না তাও কি হয়। এই বলে সোজা নিয়ে গেলেন যাত্রীনিবাসের তত্ত্বাবধায়কের কাছে। বেশ প্রভুত্বব্যঞ্জকস্বরে তাকে বললেন, এই তিনজন 'মেহিমান' কলকাতা থেকে এসেছেন, যমুনোত্রী যাবার জন্য। এঁদের আজ রাত্রের মতো একটা কামরা দিতেই হবে। তত্ত্বাবধায়ক লছমন সিং মিনতি করে বলল, সিপাইজি সব কামরা ভর্তি, কোথাও জায়গা নেই। সিপাইজির এক কথা, এঁদের জায়গা দিতেই হবে। দরকার হলে তোমার ঘরে এঁদের থাকতে দাও। তুমি আজ রাতটা অফিস ঘরে থাক। তুমি তো একলাই থাক।

বেচারা লছমন সিং, শার্দূল যেন সারমেয় বনে গেছে। তাড়া-তাড়ি বলল, কিছু একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় করবে, সিপাইজি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। এ কথার পর সিপাইজি আমাদের অভয় দিয়ে

চলে গেলেন। আমরাও ওঁকে অনেক ধন্যবাদ দিলাম। লালুবাবু মুচকি মুচকি হাসছেন, বললেন 'ঠেলার নাম বাবাজি', লছমন সিং ওঁকে এক কথায় পথ দেখিয়ে দিয়েছিল। এখন আমাদের খুব খাতির করে, নিজেই কুলি যোগাড় করে, মালপত্র নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে যাত্রীনিবাসে নিয়ে এল। কোন ঘর সত্যই খালি ছিল না। দু-ধারের সারি সারি ঘরের মাঝখান দিয়ে চওড়া প্যাসেজ, উপরে ছাদ ও দু-পাশে ঘরগুলির দেওয়াল। লছমন সিং প্রস্তাব করল সে আমাদের একখানা করে নেওয়ারের খাটিয়া দেবে। লম্বালম্বিভাবে সেগুলো পেতে আমরা যদি বিছানা করে প্যাসেজে শুয়ে পড়ি তবে কামরায় থাকবার মতোই হবে। চারিদিকে দরজা-জানলা বন্ধ থাকবে, ঠাণ্ডা আসবে না। লছমন সিং আরও বলল ওর নিজের ঘর নিতান্তই 'গরিবখানা', আমাদের মতো 'মেহিমান'দের থাকবার উপযুক্ত নয়। এত ছোট যে তিনজনের শোবার অনুপযুক্ত।

আমরা খুশী মনে বললাম প্যাসেজেই থাকব। লছমন সিং খাটিয়া নিয়ে এল। আমরা তার উপর যে যার বিছানা পেতে ফেললাম। সারাদিন বাসের ধকলে শরীর অবসন্ন, এর উপর রাত্রের আশ্রয় পাবার জন্য এতক্ষণের পরিশ্রম ও মানসিক উত্তেজনা—সব মিলিয়ে শরীর যেন এলিয়ে পড়েছে। জঠরানলও দাউ দাউ করে জ্বলছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইচ্ছা হচ্ছে এখনই বিছানায় শুয়ে পড়ি। কিন্তু তা হবার নয়, লালুবাবুর তাড়ায় উঠে পড়তে হল। টর্চের সাহায্যে কোন রকমে হাত মুখ ধোয়া ও বাথরুমের কাজ সারা হল। জল তো নয় যেন বরফে হাত ধুচ্ছি।

বাথরুম থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে সামনের ঘরের যাত্রী ভদ্রলোককে আমাদের জিনিষগুলির উপর নজর রাখতে বলে আমরা বেরিয়ে পড়লাম খাবার উদ্দেশ্যে।

বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তার সঙ্গে বইছে হিমেল হাওয়া। সর্বশরীর গরম জামা কাপড়ে ঢাকা, হাতে দস্তানা। বাঁদর টুপির সাহায্যে মাথা

ও কানকে রক্ষা করছি। সামনের দোকানগুলিতে তখন বেশ ভীড়। যাত্রীরা খেতে বসেছেন। বেশীর ভাগই রুটি, কেউ কেউ ভাত। বড় বড় পাথরের টুকরো একত্র করে তার উপর জঙ্গলী কাঠের তক্তা ফেলে বেঞ্চ ও খাবার টেবিল তৈরী হয়েছে। সবগুলিই যাত্রীরা দখল করেছেন। আমরা তাই জায়গা খালি না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলাম। প্রকৃত সরাইখানা। কেউ হাঁকছে "চাপাতি লাও", কেউ বলছে, "আর থোড়া সবজি চাহি, থোড়া পিঁয়াজ ঔর চাট্নি তো লাও।" এক শেঠজি এক পোয়া দুধ চাইলেন। জনৈক মুণ্ডিত মস্তক দক্ষিণ ভারতবাসী ভাঙা হিন্দিতে হাত তুলে দেখাচ্ছেন "দো চাপাথি চাহি", বেশ বোঝা গেল এটুকু হিন্দি বলতেই তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছে। নানা ভাষায় মুখরিত সরাইখানা। হোটেলের মালিক হাসিমুখে নিজে ও সেবকদের দিয়ে সবার ফরমাশ তালিম করছে।

শশাঙ্কবাবু বলে উঠলেন, বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সর্বধর্ম না হোক হিন্দু ধর্মের সর্বভাষা ও সর্বজাতির মহামিলন ঘটেছে এখানে। মনে হচ্ছে যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থিয়েটার দেখছি। লালুবাবু মন্তব্য করলেন, সত্যি তো। এ দুনিয়াটা একটা রঙ্গমঞ্চ। আমরা কখনও স্টেজে দাঁড়িয়ে অভিনয় করছি, কখনো আবার দর্শকের আসনে বসে অন্যের অভিনয় দেখছি।

দশ পনের মিনিট অপেক্ষা করবার পর জায়গা হল। আমরা তিনজন গিয়ে বসে পড়লাম। সদ্য উনুন থেকে নামান বা সেঁকা ফুলকো রুটি। তার সঙ্গে কলাইডাল, আলুকুমড়োর ঘ্যাঁট, কাঁচা পেঁয়াজ ও সবশেষে 'আচার'—এই হল আজকের ডিনারের মেনু। বেশ তৃপ্তি করে খেয়ে ফিরে এলাম যাত্রী-নিবাসে।

বারান্দায় অতন্তঃ কুড়িজন যাত্রী বিছানা পেতে শুয়ে পড়েছেন। সিঁড়ির উপর বসে আছে আট দশজন কুলি ও একজন কুলি ঠিকাদার। আমাদের মাল বওয়া সম্বন্ধে চুক্তি হল স্যানাচটি থেকে

যমুনোত্রী যাওয়া-আসায় কিলোগ্রামে পড়বে এক টাকা দশ পয়সা। দুজন কুলি হলেই যথেষ্ট হবে, ঠিকাদার ভগৎ সিং ঠিক করে দিল। কাল ভোর পাঁচটায় ওরা আসবে।

সব ব্যবস্থা পাকা করে আমরা ভিতরে এসে মাথায় বাঁদর টুপি, পায়ে গরম মোজা, গরম প্যান্ট ও জামা পরে দুখানা কম্বলের তলায় শুয়ে পড়লাম। ভাগ্যি বিছানাটা আগেই পেতে গিয়েছিলাম। আঃ কি শান্তি।

ঘড়িতে তখন রাত্রি সাড়ে-দশটা। যাত্রীরা যে যার ঘরের দরজা বন্ধ করে গভীর নিদ্রামগ্ন, আমরাই যেন শুধু জনতা শ্রেণীর মুসাফির! ঘরে ঠাঁই মেলেনি, প্যাসেজে বিছানা পেতেছি। আমাদের এই যাত্রীনিবাস যমুনার কূলে। শব্দহীনা রজনীর নৈঃশব্দে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে কালিন্দীর কলধ্বনি। মন মহানন্দে মগ্ন। আগামীকাল ভোর বেলা থেকে হাঁটাপথে শুরু হবে আমাদের যমুনোত্রী পরিক্রমা। অরণ্য বেষ্টিত শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম পথ পেরিয়ে পৌঁছতে হবে অভিষ্ট লক্ষ্যে। তবেই মিলবে পরমতীর্থ যমুনোত্রীর সন্ধান। এই সমস্ত এলোমেলো চিন্তার মধ্যে চেতনা কখন সুষুপ্তির কোলে হারিয়ে গিয়েছে জানিনা।

"ডাক্তারবাবু, চটপট উঠে তৈরী হয়ে নিন"—লালুবাবুর ডাকে ঘুম ভাঙল। ঘড়িতে ঠিক চারটে। চারিদিকে চেয়ে মনে হল আমরাই প্রথম সুপ্তোত্থিত। নির্মল আকাশে তারাগুলি মিট-মিট করে চেয়ে আছে। নিচে কলস্রোতা কালিন্দী।

বাথরুম-পর্ব সেরে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলাম। বিছানাপত্র বাঁধা বাকি। সে কাজে সাহায্য করল কুলিরা। ওরা অত ভোরেই এসে হাজির হয়েছে।

পুবের আকাশ তখন ধীরে ধীরে রক্তিম হয়ে উঠেছে। যাত্রীরা এতক্ষণে উঠে ব্যস্তভাবে চলাফেরা করছিল। জনৈকা স্থূলাঙ্গী মহিলা দেখি বাতের ব্যথায় কাতর। বাংলা, হিন্দি, তেলেগু, মালায়ালাম ইত্যাদি সর্বভারতীয় কলধ্বনিতে যেন এক ঘুমন্তপুরী জেগে উঠেছে।

আমাদের কুলিরা ইতিমধ্যে সব মালপত্র বারান্দায় রেখে এসেছে। ওজন করা শেষ হলেই পিঠে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। কুলি সর্দার ভগৎ সিংও এসে গেল। রোগা, বেঁটে ফরশা যুবক, বয়স বছর চব্বিশ-পঁচিশ হবে।

মাল ওজনের যন্ত্র একটা স্প্রিং-এর কাঁটা। বেশ ছোট ও হাল্‌কা। পকেটে ভরে নেওয়া যায়। আমার, লালুবাবু ও শশাঙ্কবাবুর মালের ওজন হল যথাক্রমে বাইশ, তেইশ ও ষোল কে. জি.। লালুবাবুর আক্ষেপ, আমার পরামর্শ মতো উনি মশারি এনে ওঁর মালের ওজন অন্ততঃ তিন কে. জি. বেশী হয়েছে। আমি কিন্তু মশারি আনিনি। হেসে ব'ললাম দলপতির মালের ওজন তো বেশী হবেই। একজন কুলি সাধারণতঃ পঞ্চাশ কে. জি. মাল বইতে পারে।

ইতিমধ্যে একজন লোক এসে হাজির। নিজের পরিচয় দিল

কুলি ঠিকাদার বুধ সিং বলে। ছ-ফুটের মত লম্বা আর তেমনি ঋজু ও বলিষ্ঠ চেহারা। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। ওকে দেখেই ভগৎ সিং পাশ কাটাবার চেষ্টা করতে যাচ্ছিল। কঠিন মুষ্টিতে বুধ সিং ওর কাঁধ ধরে বলল, "শালে, উল্লুকো পাঠ্ঠা, ধোঁখেবাজ, তু হামরা কুলি কিঁউ ভাগায়া, তেরে পাস কিত্না কুলি হ্যায়, কিত্না ঘোড়েওয়ালা হ্যায়? তু হামারা কুলি ভাগাও গে।" আমরা তো হতভম্ব। ভগৎ সিংকে সবে মাত্র তার প্রাপ্য কমিশন বাবদ দশ টাকা দিয়েছি। বুধ সিং বলল ভগৎ সিং সরকার মনোনীত কুলি ঠিকাদার নয়, এ কাজের জন্য ওর লাইসেন্সও নেই, নিজের কুলি বা ঘোড়াও নেই। রসিদ বইও ভূয়া। এইভাবে যাত্রীদের ধাপ্পা দিয়ে ও পয়সা রোজগার করে। নিজের সততা প্রমাণ করার জন্য বুধ সিং ওর লাইসেন্স এবং পরিচয় পত্রও পেশ করল।

ভগৎ সিং আমতা আমতা করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, বুধ সিং ওকে সে অবকাশ দিল না। পাকা বক্সারের মতো চোয়ালে এক ঘুষি মেরে ওকে ধরাশায়ী করল, তারপর এক লাথিতে বারান্দা থেকে ফেলল নিচে। আরও বলল, "শালে, ধোঁখেবাজ কুত্তা, তেরে কো আজ পুলিয়াকো উপরসে যমুনাজি মে ফেঁকুঙ্গা"। কি সর্বনাশ! অনেক কষ্টে আমরা বুধ সিংকে শান্ত করলাম। চারদিকে তখন যাত্রী ও কুলিদের ভীড় জমে গিয়েছে। ভগৎ সিং আর কালমাত্র বিলম্ব না করে সেই ফাঁকে "য পলায়তে স জীবতি" নীতি অনুসরণ করে পালাচ্ছিল, আমি ওকে ধরে কমিশন বাবদ আগাম দেওয়া দশ টাকার নোটখানা ফেরৎ নিয়ে নিলাম।

এ নাটকে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়েছে, ঘড়িতে দেখি ছ'টা বেজে গেছে। অগত্যা আমরা বুধ সিং-এর শরণাপন্ন হলাম, কুলির ব্যবস্থা করে দেবার জন্য। লোকটা খুব করিতকর্মা। ও আমাদের গতকালের ঠিক করা কুলিকেই নিয়োগ করল। শশাঙ্কবাবুর মাত্র ষোল কে. জি. মাল বইবার জন্য এক ছোকরাকে ধরে আনল। ও

নাকি বারকোটে স্কুলে পড়ে, ছুটিতে বাড়ি এসেছে। ঘরে বসে সময় না কাটিয়ে শশাঙ্কবাবুর হাল্‌কা মাল বয়ে নিয়ে যাবে। পয়সা রোজগার ও যমুনা মাঈকি দর্শন—দুই হবে। বুধ সিং-এর এ যুক্তি ছেলেটি খুশি মনেই মেনে নিল। সমস্যার সমাধান এত তাড়াতাড়ি হবে ভাবতে পারিনি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বুধ সিংকে ধন্যবাদ জানালাম। কুলিরা মাল পিঠে চড়িয়ে চলা শুরু করল। "যমুনা মাঈ কি জয়" ধ্বনি দিয়ে কাঁধে ঝোলা ও হাতে লাঠি নিয়ে মহা আনন্দে আমরা তিন মূর্তি ওদের পিছন-পিছন চললাম। সময় তখন প্রায় সাড়ে ছ'টা।

বাস স্ট্যাণ্ডে আট-দশখানা ট্যাক্সি ও একখানা মিনিবাস দাঁড়িয়ে আছে। শুনলাম ওরা হৃষিকেশ থেকে 'শেঠদের' নিয়ে এসেছে। এখান থেকে তাঁরা ডুলি, ডাণ্ডি বা ঘোড়ার পিঠে চড়ে যমুনোত্রী তীর্থে যাবেন। মানুষ বা ঘোড়ার পিঠে চড়ে ওঁরা যমুনা মাঈর দর্শন ও পূজা করে ফিরে আসবেন। তার পর ট্যাক্সি চেপে রওনা হবেন গঙ্গোত্রী। আমরা বাস ও হাটা-পথের মুসাফির, আদার ব্যাপারি।

বাস স্ট্যাণ্ডের সমতল চত্বর পার হয়ে, কাল সন্ধ্যায় দেখা চটিগুলির পিছন দিয়ে পাকদণ্ডী পথ শুরু হল। দুরন্ত চড়াই—একটা পাহাড়ের নিচ থেকে তার মাথায় উঠছি। পথ বলতে তেমন কিছু নেই। বড়-বড় পাথরের উপর পা রেখে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠতে হচ্ছে। পাকদণ্ডী আধ মাইল। ভাল রাস্তায় সে পথের দূরত্ব প্রায় দেড় মাইল। কুলিরা ঘোরা-পথে যেতে চায় না, মাল কাঁধে নিয়েও চড়াই উঠতে ওদের কষ্ট হয় না।

আশপাশে ছোট-ছোট গুল্মলতার জঙ্গল। স্থানে-স্থানে সেগুলি উপড়ে ফেলে পথ পরিষ্কার করা হয়েছে। কুলিরা অনায়াসে উঠে যাচ্ছে। আমরা উঠছি ধীরে-ধীরে। মিনিট কুড়ি পরে মূল রাস্তায় এসে পড়লাম। বেশ চওড়া, বাস চলার উপযোগী করে তৈরী

হচ্ছে এ রাস্তা। আগামী বছর চার মাইল এগিয়ে হনুমান চটি পর্যন্ত যাবার কথা।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিচে স্যানাচটি বাস স্ট্যাণ্ড ও তার চারিপাশের দৃশ্য দেখলাম। ঘরবাড়ীগুলি কত ছোট দেখাচ্ছে। একধার দিয়ে বয়ে চলেছেন নীলবসনা স্বচ্ছসলিলা যমুনা। প্রভাতী আলোর ছটায় জল তার ঝলমল করছে। শশাঙ্কবাবু একখানা ফটো নিলেন।

"চরৈবেতি, চরৈবেতি বলে" লালুবাবু পা বাড়ালেন, আমরাও ওঁর পিছু নিলাম।

বাস চলার রাস্তা, সুতরাং বেশ চওড়া, চড়াইও মন্থর। পাকদণ্ডীর মতো নয়। আমরা বেশ সহজেই চলেছি। মাঝে-মাঝে দু-একখানা জীপগাড়ী ও অ্যামবাসাডার ট্যাকসি যাওয়া-আসা করছে। ওদের যাত্রীরা বেশীর ভাগই 'শেঠ' সম্প্রদায়ের।

আমরা পায়ে-চলার যাত্রী। হিমালয়ের পথে তার অসীম সৌন্দর্য দেখতে-দেখতে পরমানন্দে হেঁটে চলেছি মুক্ত আকাশ ও মুক্ত বাতাসে বাঁধনহারা-প্রাণ নিয়ে।

প্রায় আড়াই মাইল এগিয়ে দেখি ক'খানা জীপ গাড়ী (পিছনে বাঁধা মালবাহী ট্রেলার) ও ট্যাকসি দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলাম ভাল রাস্তার এইখানেই শেষ। এর আগে পায়ে-চলা পথ; ওধার থেকে শেঠ-শেঠানীরা এসে বিশ্রাম করছেন। তাঁদের নিয়ে জীপ ও ট্যাকসিগুলি স্যানাচটি হয়ে আরও আগে যাবে। রাস্তার এক পাশে ডুলি, ডাণ্ডি ও ঘোড়াগুলি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ী কুলি ও ঘোড়ার সহিসরা। নূতন যাত্রী নিয়ে ওরা চলবে যমুনোত্রীর পথে। এখানেও গড়ে উঠেছে কয়েকটা চা, ভুজিয়ার দোকান। জীপ ও ট্যাকসি চালকরা হাঁকছে নূতন যাত্রী পাবার জন্য।

রাস্তার ধারে পাইন ও দেওদার গাছের ছায়াতলে লোকজন বসে বিশ্রাম করছে। আমাদের বাঁ ধারে নিচু দিয়ে বহমানা নীল যমুনা। 'আসা-যাওয়ার পথের ধারে'র দৃশ্যটুকু বেশ লাগল।

মুহুর্মুহু বাঁক আর চড়াই। অনেকখানি। চড়াই-এর শেষে কিছুটা পথ উৎরাই। যেন শ্রান্ত পথিককে একটানা চড়াই ওঠার কষ্ট থেকে কিছুটা আরাম দেবার জন্য এই ক্ষণিক উৎরাই। এভাবে চড়াই উৎরাই-পথে-চলতে-চলতে আমরা পঁচিশ মিনিট হাঁটার পর রানাচটি এসে পৌঁছলাম। স্যানাচটি থেকে দু'মাইল এসেছি।

সারি-সারি খানকয়েক দোতলা বাড়ী রাস্তার ধারে, চা, জলখাবার ও ভাত রুটির দোকান।

একতলায় দোকান, দোতলায় যাত্রীদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা। ভাড়া রাত প্রতি দেড় থেকে দুটাকা। শুনেছি আগে দোকানের মালিকরা রাত্রিতে বিশ্রামের জন্য যাত্রীদের কাছ থেকে আলাদা টাকা নিত না। হোটেলে খেলে ওটা 'ফাউ' হিসাবে পাওয়া যেত। মাগ্যিগণ্ডার দিনকাল, তাই এখন ঘরভাড়া লাগে।

চারিদিকে ঘরবাড়ী, দোকানপাট ও লোকজন-ভরা রানাচটি বেশ বর্ধিষ্ণু বসতি। প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র, স্কুল, ডাকঘরও এখানে আছে। পরিচ্ছন্ন রাস্তার দুধারে বেশ ক'জন হাঁটা বা ডুলি-ডাণ্ডির যাত্রী বিশ্রাম করছেন। কেউ বা দোকানে চা পান ও 'নাস্তা' করতে ব্যস্ত। গ্রামদেশ থেকে আসা ভাই-বহিনরা 'সাতু' মেখে খাচ্ছেন।

আমরা এখানে থামব না। দোকান থেকে চা কিনে আপন-আপন মগে ঢেলে নিলাম। শশাঙ্কবাবু একটা কাগজের ঠোঙায় করে সকলের জন্য গরম পকোড়া ও জিলাপি কিনে আনলেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই হাল্‌কা প্রাতরাশ সেরে এগিয়ে চললাম। সুন্দ-উপসুন্দ লড়াই-এর জন্য দেরী হওয়াতে খালি-পেটেই স্যানা-চটি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

রানাচটি ছেড়ে পথ খারাপ হয়ে আসতে লাগল, অধিকাংশ জায়গাতেই যেমন সরু তেমনি কঠিন চড়াই, মাঝে-মাঝে তীক্ষ্ণ বাঁক।

নিচু দিয়ে বয়ে চলেছেন কালিন্দী। ভাগীরথীর জল ঘোলা ও মেটে-রংয়ের। যমুনার জল নীল, স্ফটিক-স্বচ্ছ, তার উপর ছোট-বড় ঢেউ-গুলি আরও সুন্দর করে তুলেছে।

আমরা ধীরে-ধীরে সাবধানে চলেছি। মাঝে মাঝে দু-এক মিনিট দাঁড়িয়ে সুন্দর দৃশ্যগুলি দেখছি ও খেয়ালখুশী মতো ফটো তুলছি। ক্ষণিক-বিশ্রাম ও রম্যদর্শন দুই হচ্ছে।

চলতে-চলতে একটা বাঁকের মুখে এক বৃদ্ধ ও তার দুই সঙ্গিনীর সঙ্গে দেখা। "জয় রাধে" বলে অভিনন্দন জানালেন। আলাপ হল, ওঁরা যমুনোত্রী দেখে ফিরছেন। কাল রাত্রে ছিলেন হনুমান চটিতে। খাস নবদ্বীপে বাড়ী, গোঁসাই পরিবারের সন্তান, জাত বৈষ্ণব। সঙ্গিনী একটি বৈষ্ণবী অন্যটি বিধবা বোন।

জিজ্ঞাসা করলাম, যমুনোত্রী কেমন দেখলেন? বললেন, "বড় সুন্দর, বড় ভাল লাগল। কিন্তু পাহাড়ে উঠতে বড় কষ্ট বাবা, চড়াই যেন আর শেষ হয় না। কতবার বসেছি। আবার উঠে হাঁটতে শুরু করেছি। ঠাণ্ডায় বোষ্টুমির বুকে সর্দি বসেছে, নিঃশ্বেসের কষ্ট হচ্ছে, ভালয়-ভালয় ফিরতে পারলে হয়, গঙ্গোত্রী কি আর যেতে পারব, জয় রাধারানী, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। তা আপনাদের কোথা থেকে আসা হচ্ছে? পরিচয় বিনিময় হল। আমাদের ওষুধের ঝুলি থেকে কিছু ওষুধের বড়ি দিয়ে বললাম, এগুলি খাবেন, আজ স্যানাচটিতে গিয়ে পুরো বিশ্রাম করুন, আশা করি কাল অনেকটা ভাল থাকবেন। গোঁসাইজি ও বোষ্টুমি দিদি অনেক ধন্যবাদ দিলেন। আমরাও এগিয়ে চললাম।

এভাবে চলতে-চলতে আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট নাগাদ হনুমান চটি এসে পৌঁছলাম। রানাচটির মতো এখানেও রাস্তার দুধারে কিছু দোকান-পাট ও চটি নিয়ে ছোট বসতি গড়ে উঠেছে। কয়েক বছর আগেও যখন বাস আসত 'কুথনৌর' পর্যন্ত এবং যখন স্যানাচটি গড়ে ওঠেনি, যাত্রীরা কুথনৌর বা যমুনাচটিতে এসে প্রথম রাত্রি

বিশ্রাম করতেন। পরদিন ভোরে হাঁটা শুরু করে হনুমানচটিতে এসে বিশ্রাম ও রাত্রিবাস করতেন। আজ স্যানাচটি পর্যন্ত বাস চলাতে যাত্রীরা প্রথম দিনেই ফুলচটি বা জানকীবাঈ পর্যন্ত এগিয়ে যান।

হনুমান চটিতে দেখলাম অনেক যাত্রী জমায়েত হয়েছেন, অধিকাংশই আজ ভোরে স্যানা চটি ছেড়ে আসার দল।

স্যানা চটি গড়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে হনুমান চটির রমরমা অবস্থা চলে গিয়ে টিমটিম করছে। ধর্মশালা ও চটিগুলি অধিকাংশই জনশূন্য, পরিত্যক্ত, এখন শুধু পথে চা-পান ও স্বল্প বিরতির স্থান। অদূর ভবিষ্যতে বাস-রাস্তা যদি হনুমান চটি পর্যন্ত এগিয়ে আসে তখন হয়ত তার হৃতগৌরব ফিরে আসবে কিছুকালের জন্য। হৃষিকেশ থেকে দীর্ঘ-পথের বাসযাত্রা শেষে যাত্রীরা হনুমান চটিতে এসে রাত্রে বিশ্রাম নেবেন। কিন্তু এ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও স্যানা চটিতে যাত্রীনিবাস, নিরীক্ষণ ভবন ও বাসস্ট্যাণ্ড দেখে মনে হয় সেখানকার বন্দোবস্তগুলি সাময়িক নয়, পাকাপাকি।

আমরা হনুমান চটিতেও দাঁড়ালাম না। দেরীতে বেরিয়েছি, পথে যত কম কালক্ষেপ করব, জানকীবাঈ চটিতে তত আগে পৌঁছতে পারব, সেখানে ভাল আস্তানা পাবার সম্ভাবনা তত উজ্জ্বল থাকবে। স্যানা চটি থেকে আমাদের আগে বেরোন একটি দলকে এখানে পিছনে ফেলে এলাম।

হনুমান চটির দোকানগুলি পার হয়েই উৎরাই পথ। তার শেষে এক সুন্দর পটভূমিতে যমুনার উপর ঝুলন্ত সেতু। নদী এখানে দুটি আকাশছোঁয়া গিরিখাতের মধ্যে প্রবহমান, দুরন্ত তার স্রোত। এক তীক্ষ্ণ বাঁকের উপর সেতু। তার উপর দাঁড়িয়ে সামনে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখলাম, বিশাল বন্দরপুন্ছ পর্বতমালা এ অঞ্চলে হিমাদ্রির সর্বোচ্চ শাখা-সামনের সারা শুভ্র তুষারমৌলি নিয়ে স্পর্ধিত উচ্চতায় আকাশ ছুঁয়ে আছে। যে দুই গিরিখাতের মধ্য দিয়ে নদী

বয়ে চলেছেন, তার গা বেয়ে সারি-সারি পাইন নিচু থেকে অনেক উপরে উঠে গেছে। মাঝে-মাঝে তার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় পাহাড়ের চূড়া থেকে বরফ গলে ক্ষীণ ধারায় নেমে আসা রুপালী রেখার মতো ঝরনাগুলি। মেঘহীন নীল আকাশ। সূর্য কিরণের ছটায় প্রকৃতি উজ্জ্বল।

অবাক বিস্ময়ে ঝুলন্ত সেতুর উপর দাঁড়িয়ে সৌন্দর্যের স্রষ্টা সেই বিরাট পুরুষকে প্রণাম জানাই।

পুল পেরিয়েই কিছুটা রাস্তা বেয়াড়া চড়াই, তীক্ষ্ণ 'ঘুম' বা Hairpin Bend-এ ভরা। কয়েকটি স্থানে রাস্তা অত্যন্ত সরু, মাত্র দেড়-দুহাত চওড়া। বাঁদিকের পাহাড় ঠিক মাথার উপর চন্দ্রাতপের মতো আচ্ছাদন দিয়ে রেখেছে যেন পথিককে বর্ষা বা রৌদ্রের তাপ থেকে রক্ষা করার জন্য। আবার কিছুটা এগিয়ে গাছের ছায়ায় স্নিগ্ধশীতল হাওয়া, বসলে শরীর জুড়িয়ে আসে। কিন্তু এ সময় মাছির উৎপাতে বসার উপায় নেই। ওদের কামড়ে নাকি শরীরে ঘা হয়ে যায়। আমরা চলেছি ঘনজঙ্গল, বাগান ও খেতের পাশ দিয়ে, পথ কখনো চড়াই, কখনো বা উৎরাই। বড়-বড় হরিতকী গাছ, তাদের ছায়ায় পথিক চলেছে সানন্দে। এছাড়া জঙ্গলী পথের ধারে নানা রং-এর অফুরন্ত ফুলের সম্ভার এক স্নিগ্ধ পরিবেশ রচনা করেছে। আমি বললাম এরা কারুর যত্নের অপেক্ষা রাখে না, আপনা থেকেই কেমন সুন্দর ফুটে আছে। শশাঙ্কবাবু বলে উঠলেন "এ মালঞ্চের মালাকর যে স্বয়ং প্রকৃতিদেবী।" সত্যিই তো।

চড়াই-উৎরাই পথ ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি। ঘড়িতে বেলা সাড়ে-দশটা। পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে-ধাপে সিঁড়ির মতো উঠে গেছে ফসলের খেত। তাতে ধান, গম, কোথাও বা আলু ও অন্যান্য সবজির চাষ হচ্ছে। পথের ধারে গ্রামের বধূরা বিস্ময় আর সম্ভ্রমভরা দৃষ্টি নিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে আছে, তাদের সারা মুখে সহজ সরলতা।

আমরা এখন সমুদ্রতীর থেকে ৮০২৬ ফুট উপর দিয়ে চলেছি। বাঁ ধারে নিচু দিয়ে বয়ে চলেছেন যমুনা। তার ওপারে বেলাভূমি পার হয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ধাপে-ধাপে উঠেছে শস্য খেত। নদীর একূলেও তাই, যদিও আয়তন কম। যমুনার দুধারে এত বড় শস্য ক্ষেত এ পর্যন্ত চোখে পড়েনি। ইতস্ততঃ ছড়ান নয়, সমস্ত অঞ্চলটা জুড়ে ঘন চাষের খেত। গ্রামবাসী মেয়ে-পুরুষ সকলেই চাষের কাজে ব্যস্ত। নদীর উপর দিয়ে পায়ে-চলার একটা সাঁকো-পারাপারের জন্য। ওপারে একটা টিলার উপরে দেখতে পাচ্ছি বেশ ঘনবসতি-পূর্ণ গ্রাম। বাড়ীগুলি বেশ ভালভাবে তৈরী একতলা বা দোতলা, বোঝা যায় বেশ সমৃদ্ধিশালী জনপদ। রাস্তার পাশে বোর্ডে লেখা দেখলাম গ্রামের নাম 'বনাস'। আমাদের কুলি ধামান্ সিং বলল, এ-গাঁয়ে অনেক ধনী লোকের বাস, বেশীর ভাগই নিজেদের খেত-খামার দেখে। অনেকের আবার মাল ও যাত্রীবাহী ঘোড়া আছে, সে ব্যাবসাও খুব লাভজনক।

'বনাস' হনুমান চটি ও ফুল চটির মাঝামাঝি, অর্থাৎ হনুমান চটি থেকে আমরা দু-মাইল এসেছি।

'বনাস' পার হবার পর রাস্তা আরও খারাপ, অনেক স্থানে ছোট-বড় পাথরের টুকরো ফেলে তৈরী, এর উপর আছে কঠিন চড়াই, ঘন-ঘন তীক্ষ্ণ বাঁক, কোথাও বা Hairpin Bend. অল্প দূর এগিয়ে এক জায়গায় এসে রাস্তার অবস্থা দেখে তো চক্ষুস্থির। পাহাড়ের গা কেটে রাস্তা, তার অনেকখানি একেবারে ধসে গেছে। মাঝ-খানের ত্রিশ চল্লিশ ফুট একেবারে নিশ্চিহ্ন, অতলস্পর্শী খাদের তলা দিয়ে যমুনা প্রবাহিণী। বড়-বড় বল্লী এপার থেকে ওপারে ফেলা। তার উপর পাতা হয়েছে কয়েকখানা তক্তা—একে অন্যর সঙ্গে তার দিয়ে বাঁধা। রাস্তার মুখে সতর্কবাণী লেখা বোর্ড। ঘোড়া, ডুলি বা ডাণ্ডির যাত্রীরা এখানে নেমে তক্তাপাতা পথটুকু অবশ্যই হেঁটে পার হবেন, ঘোড়া, ডুলি বা ডাণ্ডিতে চড়ে যাওয়া নিষিদ্ধ এবং

অত্যন্ত বিপজ্জনক। ধসের উভয় পারে তাই বেশ-কিছু যাত্রীর জমায়েত। তাঁরা খুব সাবধানে ও ধীরে-ধীরে তক্তার উপর পা ফেলে এই বিপদসঙ্কুল জায়গা পার হচ্ছেন। আমরা তো হেঁটেই চলেছি সারা পথ, ডুলি, ডাণ্ডি বা ঘোড়ার প্রশ্ন নেই। দুর্গা, দুর্গা বলে এক এক করে পার হলাম। লালুবাবু একটু কৌতূহলী হ'য়ে ঝুঁকে দেখতে যাচ্ছিলেন তক্তাগুলি কি করে বাঁধা আছে, শশাঙ্কবাবুর ভর্ৎসনায় নিরস্ত হলেন। ওপারে পৌঁছে দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম করলাম। মনে হল নবজীবন লাভ করলাম।

ওপারে দেখা গেল যমুনোত্রী থেকে ফিরছেন তিন ভদ্রমহিলা, ওঁরা তিনজনই বাঙালী। বললেন জানকীবাঈ চটির পর যমুনোত্রীর পথে দুরুহ চড়াই, পথের অবস্থাও ভাল নয়, সাবধানে যেতে হবে। ওঁরা আজ স্যানাচটি ফিরে বিশ্রাম নেবেন। আগামী কাল ভোরের বাসে গঙ্গোত্রী রওনা হবার ইচ্ছা।

ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা ফুলচটির দিকে এগিয়ে চললাম। "যমুনা মাঈ কি জয়, গঙ্গা মাঈ কি জয়" ধ্বনি দিতে-দিতে একদল যাত্রী নেমে চলেছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, ফুল চটি কতদূর, "থোড়ি দূর মহারাজ, আভি পঁহুছ যাওগে" উত্তর এল।

আর কিছু দূর এগিয়ে একটা টিলার নিচে 'সে পৌঁছলাম। তার উপরে উঠেই একটা টিনের বোর্ডে লেখা 'ফুলচটি' চোখে পড়ল। একটু দূরেই অনেকগুলি ঘরবাড়ী নিয়ে বসতি। অল্প পরেই আমরা এসে ধর্মশালা-প্রাঙ্গণে পৌঁছলাম, বেলা তখন পৌনে বারটা। এখানে খেয়ে নিয়ে ও একটু বিশ্রাম করে রওনা হব জানকীবাঈ চটির উদ্দেশ্যে।

'ফুলচটি'-সার্থক এর নাম। চারিদিকে নানা রং-এর ফুলের শোভা, যমুনার বাঁ তীরে একটি ছোটখাট সমতল জায়গায় গড়ে উঠেছে এই মনোরম চটি। যমুনা বয়ে চলেছেন অল্প দূর দিয়ে। ওপারে ধীরে-ধীরে উঠে গিয়েছে পাহাড়, তার শিখরে পশুচারণভূমি।

ফুল চটির পরিবেশ পরিচ্ছন্ন। সুন্দর দোতলা ধর্মশালা ও চটি এখন যাত্রীভরা। তার অঙ্গনে কেউ রান্নায় ব্যস্ত, কেউ বা যমুনায় স্নান করে এসে কাপড় শুকোতে দিয়েছেন। যাঁরা জানকীবাঈ চটিতে নামেন না তাঁরা এখানে বিশ্রাম ও রাত্রিবাস করে ভোরবেলা যমুনোত্রী রওনা হন। রাত্রে যমুনোত্রী বাস করে পরদিন আবার এখানে ফিরে আসেন। ভীড়ও এখানে অপেক্ষাকৃত কম। ধর্মশালা বা চটিতে জায়গা পাওয়া সহজ।

আমাদের মতো অনেকেই আবার আরও দু-মাইল এগিয়ে জানকীবাঈ চটি পৌঁছে সেদিনের পরিক্রমা শেষ করেন।

ফুলচটিতে আমরা ঝরনার জলে স্নান করলাম। তুহিন-শীতল জল ওপর থেকে ঝির্‌ঝির্ করে নেমে আসছে, তার নিচে মাথা পেতে দিলাম। আবহাওয়া পরিষ্কার, রোদের তাপও চড়া। তাই অসহ্য ঠাণ্ডা মনে হল না, বরং বেশ আরামই লাগল।

স্নান করে চটির পাশে একটা খাবার দোকান থেকে ভাত খেলাম। এদিকে সর্বত্রই সুন্দর বাসমতী চাল, ডাল, তরকারী অখাদ্য বললেও হয়, কিন্তু সুগন্ধি ভাতের মহিমায় আর সব দোষ ঢেকে যায়। শশাঙ্কবাবু বললেন, আমরা পশ্চিম বাংলার কোথাও তো এমন চাল পাই না। 'এর কারণ কি'? এর কারণ বলতে পারবেন একমাত্র ভারত সরকারের খাদ্য দফতর,— একটু হেসে লালুবাবু উত্তর দিলেন।

আহারান্তে বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম জানকীবাঈ চটির পথে, বেলা তখন একটা।

ফুলচটি পেরিয়ে একটু দূর গিয়ে পথ দুভাগ হয়ে গিয়েছে। ডান দিকের সরু পায়েচলা-পথ যমুনার এপার দিয়ে খুরশালীর দিকে চলে গেছে। খুরশালী বেশ সমৃদ্ধ গ্রাম এবং যমুনোত্রীর পাণ্ডাদের বাসস্থান, বলতে গেলে যমুনোত্রী যাবার পথে এটাই শেষ বড় গ্রাম।

খুরশালীর পথ ডান দিকে রেখে আমরা চললাম যমুনার পুল পার হয়ে অন্য পার দিয়ে যমুনোত্রীর পথে। খুরশালীর ঘরবাড়ী ও খেত-খামারগুলি এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

আমাদের পথ অপরিসর, থেকে-থেকে কঠিন চড়াই, সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ বাঁক। চড়াই পথের মাঝে-মাঝে দেখা যাচ্ছে স্বল্প বিস্তৃত সমতল ভূমি ও সবুজ ফসলের খেত। ঘন পাহাড় জঙ্গল—তার মাঝে ছড়িয়ে আছে সবুজ শস্য, আলু, পেঁয়াজ ও ধানের ক্ষেত। প্রকৃতির কি অপূর্ব লীলা! আপন খেয়ালখুশী মতো তিনি পটভূমি রচনা করেছেন।

পথের এই বিচিত্র সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করতে করতে প্রায় দু-মাইল এগিয়ে এসে 'বীফগাঁও' পৌছলাম। পথের ধারে গাছের ছায়ার নিচে বহু যাত্রী জমায়েত হয়েছেন। কেউ কাঠের উনুন জেলে রান্না করছেন, কেউ ক্লান্ত হয়ে মাটিতে বিছানা পেতে শুয়ে পড়েছেন, কেউ বা আবার আগামী দিনের যাত্রা-পথের-প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। ভরা-পেটে ফুলচটি থেকে বেরিয়ে ও বেশ কিছুটা চড়াই অতিক্রম করে আমরাও ক্লান্ত, তাই একটা গাছতলায় বসে পড়লাম।

সুন্দর কাজ-করা কাঠের বাড়ী ও ফলের বাগানে ভরা 'বীফগাঁও' এ পথে একটি সুন্দর ছোট্ট গ্রাম। জানকীবাঈ চটি এখান থেকে মাত্র এক ফার্লং দূরে। গাঁয়ের মেয়ে পুরুষরা ইতঃস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গ্রামের এক কোণে একটা মন্দির, তার গঠনভঙ্গী ও কারুকার্যে তিব্বতী প্রভাব স্পষ্ট।

বীফগাঁওতে গাছতলায় দশমিনিট বিশ্রাম করে আমরা এগিয়ে চলি। গ্রামের একতলা দোতলা বাড়ীগুলির উঠানের পাশ দিয়ে পাথর টপ্‌কে-টপ্‌কে রাস্তা, খোলা দরজা ও জানলা দিয়ে ছেলে-মেয়েরা সরল উৎসুকনয়নে আমাদের দেখছে, এদের বেশভূষা অনেকটা তিব্বতীদের মতো।

একটু পরেই আমরা জানকীবাঈ চটিতে এসে পৌঁছলাম, বেলা তখন ছুটো, সমুদ্রতীর থেকে এর উচ্চতা ৮,০০০ ফুট। এটি একটি ছোট্ট গ্রাম, যমুনোত্রী যাবার পথে শেষ লোকালয়। সরকারীভাবে এ জায়গার নামও 'বীফগাঁও', চটির নাম জানকীবাঈ চটি। তবে লোকে এ জায়গাটাকেও আজকাল জানকীবাঈ চটি বলে। আমাদের আজকের যাত্রা এখানেই শেষ। রাত্রে এখানে বিশ্রাম করে কাল ভোরে রওনা হব যমুনোত্রী পথে। স্থির করেছি সরকারী যাত্রী নিবাসে প্রথমে আশ্রয়ের চেষ্টা করব, না পেলে ধর্মশালা বা হোটেল তো আছেই।

মূল রাস্তা থেকে কিছুটা নেমে সুন্দরভাবে তৈরী হয়েছে এই যাত্রী নিবাস—একেবারে যমুনার কূল ঘেঁষে। হুবহু স্যানা চটির যাত্রী নিবাসের নক্সায় তৈরী, তবে আয়তনে ছোট।

ছুপাশে সারি সারি ঘর। মাঝখানে ও অন্য অংশ জুড়ে প্রশস্ত দালান যেখানে প্রয়োজন মতো বিছানা পেতে শোয়া যায়।

যাত্রী-নিবাসের বারান্দায় বিছানা রেখে তত্ত্বাবধায়ক তথা চৌকিদারের কাছে গেলাম। অবস্থা স্যানাচটির মতোই—অর্থাৎ ঘর খালি নেই। এটা অবশ্য খুব অপ্রত্যাশিত ছিল না, সুতরাং ছুঃখিত বা হতাশ হলাম না। তাড়াতাড়ি ছু-সারি ঘরের মাঝে দালানের স্থানটুকু দখল করলাম আমাদের তিনজনের হোল্ডঅল্ রেখে। রানা চটি ও হনুমান চটিতে যে যাত্রীদলদের পিছনে ফেলে এসেছি তাঁদের সঙ্গে মহিলারাও আছেন। তাঁরা এসে গেলে এ জায়গাটুকুও হাত-ছাড়া হয়ে যাবে। যাত্রী-নিবাসের সাফাইওয়ালাকে ডেকে কিছু বকশিশ দিয়ে জায়গাটুকু ভাল করে পরিষ্কার করালাম। ধামান্ সিং হোল্ডঅল্ খুলে দিল, আমরা যে যার বিছানা পেতে ফেললাম।

ঘর না পাওয়ায় শুরু হ'ল লালুবাবুর খুঁতখুঁতানি। তাঁর তাগাদায় যাত্রী-নিবাসের পাশে যে ধর্মশালা ও চটি আছে তারই একটাতে গেলাম ঘরের সন্ধানে। অপরিচ্ছন্ন ঘর, বারান্দায় উনুন

জ্বালিয়ে যাত্রীরা রান্না শুরু করেছেন। ছড়িদার একটা বড় ঘর দেখাল, তাতে চারজন যাত্রী—আরও চারজনের জায়গা হবে। ঘরের যাত্রীরা লাঞ্চ শেষ করে প্রেমসে বিড়িতে টান দিচ্ছেন, তার ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার। এর পরে কোন বাবাজী এসে যদি ছোট কল্‌কেতে বড় তামাক ধরিয়ে মৌতাত শুরু করেন তবে তো খাসা হবে। ছড়িদারকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলাম। যাত্রী-নিবাসের দালান তো এর তুলনায় 'প্যালেস'।

যাত্রী-নিবাসের অল্প নিচে বাঁধান জায়গায় আধুনিক কায়দায় তৈরী স্নানের ঘর ও পায়খানা। কলের জল পরিষ্কার, আস্বাদও ভাল। ভাল করে হাত মুখ ধুয়ে ফিরে এলাম।

আকাশে বেশ চড়া রোদ। দিনের আলো এখনও অন্ততঃ সাড়ে-তিন ঘণ্টা থাকবে। আমরা ভাল করে এক প্রস্থ গরম জামা, প্যাণ্ট ও বাঁদরটুপি চড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

যাত্রী-নিবাসের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে সামনে দৃষ্টি প্রসারিত দেখলাম এক অপূর্ব দৃশ্য। পশ্চিম থেকে পূর্ব আকাশ জুড়ে দণ্ডায়মান বিশাল বন্দরপুন্‌ছ পর্বতমালা। তার চুড়া চিরতুষারাবৃত। ফুলচটি থেকেও এঁকে দেখেছিলাম, কিন্তু সে ছিল কিছুটা অস্পষ্ট। এখান থেকে উজ্জ্বল ও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। তার উপর দিয়ে নীল আকাশে ভেসে যাওয়া ছোট-ছোট মেঘগুলি তুষারাবৃত শিখরগুলিকে ক্ষণে-ক্ষণে আড়াল করলেও অধিকাংশ সময়েই তার শুভ্র-স্বচ্ছরূপ দৃষ্টিপথে আসছে। পশ্চিম আকাশের সূর্যকিরণ অল্প-অল্প জল-বিন্দুর উপর প্রতিফলিত হয়ে রামধনুর সৃষ্টি করছে।

আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে এ সুন্দর দৃশ্য দেখলাম। আত্মহারা শশাঙ্কবাবু ক'খানা ফটোও নিলেন।

যাত্রী-নিবাসের ঠিক নিচু দিয়ে এঁকে-বেঁকে বয়ে চলেছেন মৃদু-স্রোতা, ক্ষীণকায়া যমুনা। তার বুকে ছোট ছোট নুড়িগুলির উপর দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে।

যাত্রী-নিবাসের আঙ্গিনা ছাড়িয়ে যমুনোত্রী যাবার মূল রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। একটু এগিয়ে দেওয়াল ঘেরা প্রশস্ত সীমানার মধ্যে অবস্থিত একটি সুন্দর বাড়ী চোখে পড়ল। গেটে লেখা আছে "রাষ্ট্রীয় নিরীক্ষণ ভবন" বাড়ীর সামনে সবুজ ঘাসের উপর নানা ফুলের বাগান। বুঝলাম পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের বিশ্রামাবাস। আমরা গেট অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। মাঠের মধ্যে বেতের কয়েকখানা আরাম চেয়ার পাতা।

একটু পরে নিরীক্ষণ ভবনের ভিতর থেকে চারটি যুবাবয়সী ছেলে বেরিয়ে এল। ভাবলাম ওরাও বুঝি আমাদের মতো যমুনোত্রী যাত্রী। আলাপ করে বুঝলাম তা নয়। ওরা ভারতীয় ভূতত্ত্ব সংস্থার-কর্মচারী। সরকারী জরীপের কাজে এখানে এসেছে। আমরা হিন্দি ও ইংরাজীতে আলাপ করছিলাম, ওদের একজন নিজের নাম বলল অনুপ মিত্র, কলকাতার ছেলে। ভূতত্ত্ব বিষয়ে এম. এসসি. পাস করে ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের চাকরি পেয়েছে। ওরা দেরাদুন থেকে আজই এখানে এসেছে, তিন-চারদিন থাকবে। অন্য তিনজন উত্তর প্রদেশবাসী। অনুপরা আক্ষেপ করে বলল আগের ব্যবস্থা অনুযায়ী গোটা নিরীক্ষণ ভবনটাই ওদের জন্য রিজার্ভ করা ছিল, এখন হঠাৎ নোটিশ পেয়েছে যে বারকোটের মহকুমাধীশ আজ সন্ধ্যার আগে এখানে এসে পৌঁছবেন। কাল ভোরে রওনা হবেন যমুনোত্রী। ওদের তাই নিরীক্ষণ ভবন ছেড়ে যাত্রীনিবাসে দুটো ঘর দেওয়া হয়েছে। এ চার বেচারা ক্ষুব্ধ, কিন্তু উপায় কি? ওদের সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আমরাও উঠেছি যাত্রীনিবাসে, তবে ঘর পাইনি বলে বিছানা পেতেছি দালানে। ওদের কাজ না থাকলে সন্ধ্যার পর আড্ডা দেওয়া যাবে, পরস্পরের সঙ্গ বেশ ভালই লাগবে। ওরা এ প্রস্তাবে খুব খুশী হল।

ইতিমধ্যে দিনের আলো নিভে এসেছে, আমরা যাত্রীনিবাসের দিকে ফিরে চললাম। অনুপরা ওদের লোকজনের সাহায্যে মালপত্র

নিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবে বলল। ওদের সঙ্গে অনেক যন্ত্রপাতি ও তাঁবু আছে। সার্ভে পার্টির লটবহর তো কম নয়।

অন্ধকার পথ, টর্চের সাহায্যে যাত্রীনিবাসে এসে পৌঁছলাম। সেখানে তখন কোলাহল-মুখর যাত্রীমেলা। সারা প্রশস্ত বারান্দাটায় পর-পর বিছানা, অতিকষ্টে তার মধ্য দিয়ে যেতে হল। এ যেন ঠিক বিগত দিনের পায়ে-হাঁটা কালের চটিতে যাত্রী-সমাগম। সারাদিনের ক্লান্তিশেষে সকলেই কুলায়প্রত্যাশী। নানা জাতির নানা ভাষার আলাপ কানে আসছে। কেউ সুর করে সান্ধ্যস্তোত্র পাঠ করছেন, কেউ বা ব্যস্ত আগামী প্রভাতের যাত্রাপথের প্রস্তুতিতে।

গরম কোট প্যাণ্ট ছেড়ে সবে বিছানায় বসেছি এমন সময় যাত্রী নিবাসের তত্ত্বাবধায়ক এসে খবর দিল, সন্ধ্যাবেলায় একটা কামরা খালি হয়েছে, আমরা প্রথম প্রার্থী, তাই ও আমাদের বলতে এসেছে। ইচ্ছা করলে সে কামরায় যেতে পারি। কি ভাগ্য! সঙ্গে-সঙ্গে যে যার বিছানা বেঁধে ধামান সিংকে ডেকে ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে বিছানাপত্র এনে ফেললাম। ঘরটা বেশ বড়, মেঝের উপর মোটা গালিচা পাতা। আসবাবের মধ্যে একটা নেওয়ারের খাট, ড্রেসিং টেবিল ও একখানা চেয়ার রয়েছে। আমরা মেঝেতে শোব, তাই খাট বের করে দিলাম। যাঁরা বারান্দায় বিছানা পেতেছেন তাঁদের কাজে লাগবে।

বাহাদুর সিং একটা লণ্ঠন দিয়ে গিয়েছিল, তার আলোতে আমরা বিছানা পেতে ফেললাম। রাত্রে শীতে কষ্ট পেতে হবে না ভেবে স্বস্তি পেলাম।

রাত্রি আটটা বেজেছে। খাবার বন্দোবস্ত করতে উঠে পড়লাম। অনুপ ও তার সঙ্গীরা আমাদের পাশের ঘরেই এসেছে দেখলাম। ভালই হল, খাবার পরে এসে গল্প জমানো যাবে।

বাহাদুর সিং বলেছিল এখানে যোশীর হোটেল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, খাবারও ভাল। যাত্রী নিবাসের ঠিক পিছনে একটা ছোট যায়গায়

হোটেলটা। সেই 'হরেক রকম' অর্থাৎ সকাল বিকালে চা জলখাবার দুপুর ও রাত্রে ভাত, রুটির ব্যবস্থা।

গরম ফুলকা রুটি সেঁকা হচ্ছিল, ভাতও সবে উনুন থেকে নেমেছে। আমরা ভাতই খেলাম। এমন সুগন্ধি বাসমতি চালের লোভ সামলান দায়।

বাইরে দুরন্ত শীত, আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, টিপ টিপ করে বৃষ্টিও পড়ছে। যোশীর হোটেলে টিনের চালা, চারিদিক শতছিন্ন চটের পরদা দিয়ে ঢাকা। হু হু করে তীব্র উত্তরে হাওয়া নির্বাধ বয়ে যাচ্ছে। আমরা উনুনের কাছে যায়গা পেয়ে পরদার ধারে বসাতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি।

খাওয়া শেষ করে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলাম, বর্ষাতি গায়ে থাকাতে ভিজতে হয়নি।

পাশের ঘরে অনুপরাও খাওয়া শেষ করেছে। ওদের ডেকে আনলাম আমাদের ঘরে। ওদের মধ্যে সিং এ অঞ্চলের ছেলে, বাড়ী উত্তরকাশী, পড়াশুনা করেছে হরিদ্বার ও দেরাদুনে। এ দিককার খান্দানি 'ঠাকুর' বংশের ছেলে। শশাঙ্কবাবু ওকে অনুরোধ জানালেন এখানকার সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলতে।

মহেন্দ্র সিং বলল এ দিককার সাধারণ অধিবাসীরা অত্যন্ত গরীব। যাদের জমি আছে তারা নিজেরা চাষ-আবাদ করে। এ কাজে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বরং বেশী পরিশ্রমী। এ ছাড়া কিছু লোক আছে যারা যাত্রীদের জন্য ঘোড়া সরবরাহ করার ঠিকাদার। এদের অবস্থাই সাধারণতঃ সব চেয়ে ভাল। বাকীরা সব যাত্রীদের মালবাহী কুলির কাজ করে দিন গুজরান করে।

বেশভূষায় গ্রাম্য লোকেরা অনেকটা তিব্বতীদের মতো। অনেক মন্দিরের স্থাপত্যও তিব্বতী ঢঙে। এ অঞ্চলের সঙ্গে তিব্বতের নৈকট্য, ব্রিটিশ আমলে দুদেশের মধ্যে অবাধ যাতায়াত ও ব্যাবসা বাণিজ্যের সুযোগ, সমতল ক্ষেত্রের শহরগুলি থেকে এদের দূরত্ব ও

দুর্গমতা—এ সব কারণে এদের বেশভূষা, গৃহপরিকল্পনা ও সামাজিক আচার ব্যবহারেও তিব্বতের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পড়েছে।

তিব্বতীদের মতো এদের মধ্যে এক নারীর বহুপতি বরণের প্রথা চালু আছে। সাধারণতঃ দেবররাও জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে থাকেন। সন্তান হলে তার পিতৃত্ব স্থির করে গ্রামের পঞ্চায়েত। এ কারণে এদের বংশধারায় পরিবারের বিস্তৃতি নিতান্ত সীমিত থাকে। ওদের সমাজে এ প্রথার স্বীকৃতি আছে।

লালুবাবু বলে উঠলেন, খুব ভাল, পাঞ্চালীর পঞ্চস্বামীর গ্রহণের-মতো ব্যবস্থা। তাঁর পঞ্চ-স্বামী বরণের আদেশ দিয়েছিলেন স্বয়ং মাতা কুন্তী, আর এদের বেলায় অনুমোদন করে গ্রাম-পঞ্চায়েত।

মহেন্দ্র সিং বলল এদের মধ্যে যারা লেখাপড়া শিখে আলোক-প্রাপ্ত হয়েছে তারা স্বভাবতঃই এ প্রথার বিরোধী।

জিজ্ঞাসা করলাম,"এখানে 'ঠাকুর' শ্রেণী বলতে কাদের বোঝায়" মহেন্দ্র বলল "ভালই হল এ প্রশ্ন তুলেছেন, আমি নিজেও একজন ঠাকুর, এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারব। মোগল আমলে অনেক বাদশা-বিশেষ করে ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে কিছু সংখ্যক রাজপুত সর্দার বা রানা আপন দেশ পরিত্যাগ করে এসে হিমালয়ের টিহরি-গাড়োয়াল অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করে। তাঁদের সঙ্গে লোক, লস্কর ও অর্থ সবই ছিল। তা দিয়ে তাঁরা জমি কিনে ছোট-বড় তালুকের মালিক হন ও ক্রমে স্থানীয় জাগীরদারদের মতোই তালুকদার হিসাবে প্রজাশাসন করতে থাকেন। টিহরি-গাড়োয়ালের মূল অধিবাসীদের থেকে নিজেদের কিছুটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার জন্য এঁরা নিজেদের 'ঠাকুর' বলে পরিচয় দিতেন। অর্থ, শৌর্য ও রাজপুত-সংস্কৃতির অধিকারী হিসাবে এঁরা খুব সম্ভ্রান্ত বলে পরিচিত ছিলেন। এখন অবশ্য সে রামও নেই বা সে অযোধ্যাও নেই। ঠাকুর বংশের গৌরব, অর্থ বা সম্মানের কিছু অবশিষ্ট নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। দেখবেন হয়ত কোন 'ঠাকুর' সামান্য অর্থের বিনিময়ে আপনার

গাইডের কাজ করছে, গঙ্গোত্রী-গোমুখের পথে এমন লোক আছে শুনেছি। তবে সব কিছু হারালেও আজও আমরা নিজেদের 'ঠাকুর' বলে পরিচয় দিয়ে গর্ব অনুভব করে থাকি।"

রাত্রি দশটা বেজে গেছে। বাইরে বেশ বৃষ্টি পড়ছে, ভাবনা হল। কাল ভোরেই যাত্রা করতে হবে যমুনোত্রীর উদ্দেশ্যে। অনুপদের দলও ভোরেই নিজেদের কাজে বেরিয়ে পড়বে গহন অরণ্যের দিকে। আমাদের শুভরাত্রি জানিয়ে ওরা বিদায় নিল। আমরাও "যমুনা মাঈ কি জয়" বলে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভেঙে যায়। টর্চ জ্বেলে দেখি চারটে বেজেছে। লালুবাবু ও শশাঙ্কবাবুকে ডেকে তুলি। লালুবাবুই সব সময় আগে উঠে আমাদের ডাকেন, আজ এ নিয়মের ব্যাতিক্রম হওয়াতে একটু লজ্জা পেলেন।

দরজা খুলতেই একঝলক দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া আমাদের অভ্যর্থনা করল। উঃ কি ঠাণ্ডা, বলে উঠলেন লালুবাবু।

সারা যাত্রী-নিবাস তখন জেগে উঠেছে। ঘরগুলি ও বারান্দা তখন কল-কণ্ঠ-মুখর।

তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে এসে বিছানা গুছিয়ে ঘরের মধ্যে রেখে দিলাম। ধামন সিং আমাদের সঙ্গে যাবে টুকিটাকি জিনিস ও 'কিট ব্যাগ' নিয়ে। ঘরে তালা দেওয়া থাকবে, আমরা বিকালের দিকে যমুনোত্রী দেখে ফিরে এসে আজকের রাত এখানেই থাকব। শশাঙ্কবাবুর মাল-বওয়া ছোকরা কুলিটাকে সঙ্গে নিলাম না।

"জয় যমুনা মাঈ কি জয়" ধ্বনি দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম মহাতীর্থ যমুনোত্রীর পথে, তখন ঠিক ছটা বেজেছে!

আকাশ মেঘ ও কুয়াশায় আচ্ছন্ন। গতরাত্রে প্রবল বর্ষণ হয়ে গেছে, এখনও অল্প অল্প হচ্ছে। ভাল করে বর্ষাতি গায়ে জড়িয়ে নিলাম।

জানকীবাঈ চটি থেকে যমুনোত্রী সাড়ে-চার মাইল, কিন্তু সমস্ত পথটাই অতি কঠিন চড়াই। এর উপর বর্ষায় পথ কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল হয়ে অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল হওয়ার সম্ভাবনা। ধামান সিং আমাদের আগে-আগে চলেছে ও সাবধান করে দিচ্ছে যেন খুব সাবধানে ও ধীরে-ধীরে চলি।

যাত্রী নিবাস ছেড়ে বড়-বড় পাথরের উপর দিয়ে উঠে আমরা

মূল রাস্তায় পড়লাম। ছাড়িয়ে চললাম কাল বিকালে দেখা সরকারী-নিরীক্ষণ ভবন।

আর একটু চলার পর পৌঁছলাম ছোট গোলাকৃতি স্থানে। বড়-বড় পাথরের মাঝখানে এবড়ো-খেবড়ো একখণ্ড তৃণভূমি। মনে হয় যেন শ্রান্ত পথিকের জন্য ক্ষণিকের বিশ্রামাবাস।

তার পর শুরু হল দুরন্ত চড়াই। পাকদণ্ডি দিয়ে আমরা অতি সন্তর্পণে উঠতে লাগলাম। একে চড়াই, তায় কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল পথ, হাতের লাঠি শক্ত করে ধরে চলেছি। একের-পর-এক সর্পিল বাঁক ঘুরে উপরে উঠছি। নিচে জানকীবাঈ চটির ঘর-বাড়ীগুলি ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। অল্প দূর গিয়ে শুরু হল ঘন জঙ্গল। সরু পায়ে-চলা পাকদণ্ডি পথ ঘুরে-ঘুরে পাহাড়ের উপরে উঠছে। দুর্গম পথ, পদে-পদে বিপদ, হিংস্র ভালুক যে কোন সময় জঙ্গল থেকে অতর্কিত আক্রমণ করতে পারে, দলে ভারী ও সাবধান না হলে মৃত্যু অনিবার্য। অত্যন্ত প্রতিকূল আবহাওয়ার 'মধ্য দিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে। বর্ষণসিক্ত পথ যে কোন স্থানে ধস্ নামার ফলে নিঃশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। মনে অসীম বল ও যমুনোত্রী দর্শনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি ধীরে সাবধানী পদক্ষেপে। আগে চলেছে পথ প্রদর্শক ধামান সিং, মাঝে-মাঝে হাঁকছে, "সাব্ হুঁশিয়ার,আগে রাস্তা বহুত গিলা ঔর কিচড়্ হ্যায়"। আমরাও ওর হুঁশিয়ার-বাণী খেয়াল রেখে আস্তে-আস্তে এগোচ্ছি। পথ কোথাও কোথাও অত্যন্ত সংকীর্ণ, বাঁয়ে খাদ, ডানদিকে পাহাড় তার গা দিয়ে চুঁয়ে-চুঁয়ে জল পড়ছে। কোথাও ছোট-ছোট ধস্ নেমে রাস্তা বন্ধ হবার উপক্রম, ডিঙিয়ে পার হতে হচ্ছে। কোথাও দেখছি জল শুষে মাটি-মেশান পাথরের গায়ে বিরাট ফাটল, যে কোন মুহূর্তে ধ্বসে পড়বে। ধামান সিং এগিয়ে গিয়ে ফাটল নিরীক্ষণ করে আমাদের এগোবার নিশানা দিচ্ছে।

এই ভাবে আমরা অতিক্রম করে চলেছি একটানা চড়াই।

পাহাড়ের নিচু থেকে শুরু হয়েছে আজকের যাত্রা, লক্ষ্য তার শিখর দেশ। প্রায় চার হাজার ফুটের চড়াই। যত উপরে উঠছি, পাইন ও চীর গাছগুলির ঘনত্ব তত কমের দিকে। বড় গাছ থেকে ছোট গাছ, তারপর গুল্ম ও লতা, আরও উপরে রুক্ষ কঠিন পাথরের শিখর-দেশে চিরতুষারের আবরণ। বিশাল ও বিস্তৃত হিমালয়ের সর্বত্রই এই দৃশ্য। লাদাখ, লাহুল স্পিতি, কাশ্মীর, দার্জিলিং, কালিংপং, সিকিম ও ভুটান—হিমাচলের সর্বত্রই প্রকৃতির এই নিয়ম বর্তমান। কেদারনাথ-বদরিনাথের পথেও এই একই দৃশ্য।

পাহাড়ের গা কেটে চলে যাওয়া স্বল্প পরিসর পথটুকু ক্রমেই দুর্গমতর হতে থাকে। এঁকে-বেঁকে ঊর্ধ্বমুখী পাকদণ্ডি, বৃষ্টি হওয়াতে তা আরও বন্ধুর। নিচে গভীর খাদ, সেখান দিয়ে বয়ে চলেছেন যমুনা-সংকীর্ণ, অগভীর কিন্তু দুর্বার স্রোতস্বিনী। পা পিছলে খাদের দিকে গড়িয়ে পড়লে প্রাণরক্ষা করা শিবেরও অসাধ্য।

শশাঙ্ক ও লালুবাবু কিছুটা আগে-আগে চলেছেন। আমার গতি শ্লথ, অল্প চলেই হাঁপ ধরছে, এক আধ মিনিট লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছি। আবার এগিয়ে চলেছি। চড়াই, চড়াই, যতদূর দৃষ্টি যায় আকাশ-ছোঁয়া সর্পিল পাকদণ্ডি। কিছুটা এগিয়ে দেখি লালুবাবু ও শশাঙ্ক দাঁড়িয়ে পড়েছেন আমার জন্য। ওঁদেরও উঠতে বেশ কষ্ট হচ্ছে, অল্প চলেই ক্লান্ত পা ধরে আসছে। কি কঠিন চড়াই, কেদারনাথের শেষ চার মাইল, রামওখাড়া থেকে কেদারনাথ দুর্গম চড়াই মনে হয়েছে। যমুনোত্রীর শেষ চার মাইল দুর্গমতর, বিপজ্জনক, চড়াইও বেশী কঠিন। এত কষ্টের মধ্যেও ধামান সিংকে কাব্যিক ঢঙে জিজ্ঞাসা করি আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দর। সে কি বুঝল জানি না, উত্তর যা দিল তা মোটেও আশা-ব্যঞ্জক নয়—অর্থাৎ সামনে আরও কঠিন চড়াই, এ চড়াই তো তার তুলনায় শিশু। সর্বনাশ! আমাদের যে শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে, ধুপা-ধুপা এগোই একটু দাঁড়াই, বুক ফুলিয়ে হাঁ করে নিশ্বাস নি।

যত উপরে উঠছি, অকসিজেনের স্বল্পতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সঙ্গে শ্বাসকষ্টও বাড়ছে। মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল। মা যমুনা, দেহে শক্তি দাও, মনে বল দাও, তোমার দর্শনমানসে কতদূর থেকে ছুটে এসেছি, মনবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

"যমুনা মাঈ কি জয়" সম্মিলিত ধ্বনি দিয়ে আমরা উঠে পড়লাম। "চল মুসাফির আগে চল্", 'বলে উঠলেন লালুবাবু।

বৃষ্টি থেমে গিয়ে আকাশে মেঘের ফাঁক দিয়ে সূয্যিঠাকুর মাঝে-মাঝে উঁকি মার্ছেন। মনটা আবার ক্ষণিকের বিপদ কাটিয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বর্ষাতি ও পুরো-হাতার সোয়েটারটা খুলে ধামান্ সিং-এর হাতে দিয়ে নিজেকে আরও ভারমুক্ত করে নিলাম। হাঁটতে সুবিধা হবে।

একের পর এক চড়াই অতিক্রম করে চলেছি, ৪০/৫০ পা হাঁটি, আট দশ সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে দম নিই। এ ভাবে চলতে-চলতে পথের ধারে একটা ছোট বস্তিতে পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ছোট-ছোট দুটো চা-পকোড়ার দোকান। রাস্তার দু-ধারে কয়েকটা গাছের গুঁড়ি ফেলা আছে, তাই হল বসবার বেঞ্চ। এ যেন দূর পাল্লার যাত্রা-পথে একটা ছোট স্টেসন। ডুলি, ডাণ্ডির যাত্রীরা নেমে কেউ বসেছেন পথের ধারে, কেউ বা ঢুকেছেন চায়ের দোকানে। তাঁদের বাহকরাও এই ফাঁকে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে।

এখানে দেখা হল আমাদের রামলাল তেওয়ারির সঙ্গে, যিনি তাঁর গ্রামের ভাই বহিনদের মুখিয়া হয়ে হৃষিকেশ থেকে আমাদের সঙ্গে একই বাসে এসেছেন। ওঁরা গতকাল জানকীবাঈ চটিতে যোশীর হোটেলের পাশের চটিতে আশ্রয় নিয়েছেন। আজ ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে সদল-বলে চলেছেন। দীর্ঘদেহী তেওয়ারিজী দলের সকলের 'সাত্তু' খাওয়া হলে আবার রওনা হবেন।

আমাদের চা-পান ও বিশ্রাম শেষ হয়েছিল, উঠে পড়লাম। লালুবাবু দোকানিকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ যায়গার নাম জংলা চটি

কেন? উত্তর এল, যে সব চটির অন্য নাম নাই, এদিকে তাদের বলে জংলা চটি। এখান থেকে একটু ভিতরে জঙ্গলের মধ্যে একটা বসতি আছে, তার নাম প্রেমনগর। আসলে এটাকে প্রেমনগর চটি বলা উচিত।

বন্ধুর অপরিসর চড়াই পথ দিয়ে আমরা ধীরে-ধীরে উঠছি। মাঝে-মাঝে পকেট থেকে লজেন্স বার করে মুখে রাখছি, ওঁদেরও দিচ্ছি, জিভ ও গলা শুকিয়ে আসছে, নিজের হৃৎস্পন্দন নিজেই শুনতে পাচ্ছি। নিচের দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছে না, যদি মাথা ঘোরে। লালুবাবু বলছেন মাঝে-মাঝে বসে জিরিয়ে নিতে, কিন্তু আমি রাজি হলাম না। একবার বসলে সমস্ত শরীর এলিয়ে পড়বে, আর উঠে এগোবার ক্ষমতা থাকবে না। বরং দশ পা হেঁটে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়াব, আবার চলব। ওঁদের অবস্থাও কাহিল তবে আমার মতো নয়।

পথের বাঁকগুলি এঁকে-বেঁকে যেন দ্রুতগতিতে উপরে উঠে গেছে, Hairpin Bend-এর বদলে ইংরাজি অক্ষর 'Z' এর মতো। বাঁকে নামার পথে যাত্রীদের কত ছোট দেখাচ্ছে। একটা থেকে অন্য বাঁকে উঠে মনে হচ্ছে যেন লাফ দিয়ে অনেকখানি উঠে এলাম। কে যেন বলেছিল ৭০° ডিগ্রির মতো খাড়াই। এ উক্তির সত্যতা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি। কল্যাণী সেনরা মাত্র ক-দিন আগে যমুনোত্রী ঘুরে গেছে, ও বলেছিল এ রকম নাকি উনিশটা বাঁক আছে। গুণে গুণে উঠছি, "মা যমুনা, তোমার দর্শন পেতে এত কষ্ট, এত বড় পরীক্ষা সফল হয়ে যেন তোমার আশীর্বাদ পাই। শশাঙ্কবাবু একটু নিরীশ্বর-বাদী। ওঁর মুখ্য উদ্দেশ্য যমুনোত্রী দর্শন ও তার নৈসর্গিক শোভা উপভোগ করা। আমি ও লালুবাবু যমুনা মায়ের দর্শন করে পূজা দেব, আবার প্রাণ ভরে হিমাদ্রির অপূর্ব সৌন্দর্যও পান করব, মুখ্য বা গৌণ বিচারে কাজ নেই।

পথে এক যায়গায় দেখি এক বৃদ্ধা শুয়ে পড়েছেন। তার পাশে

বসা একটি তরুণ বলল, বৃদ্ধা ওর ঠাকুমা, খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ওদের বোতলের জল ফুরিয়ে গেছে, একটু জল চাইল। লালুবাবু ওঁর বোতল থেকে দু-গ্লাস জল দিলেন। শশাঙ্কবাবু ওঁর ব্যাগ থেকে ব্রাণ্ডির বোতল বার করে দু-তিন চামচ মিশিয়ে দিলেন। বৃদ্ধা ঐ জল পান করে একটু পরেই উঠে বসে "যমুনা মাঈ তেরা ভালা করে" বলে আশীর্বাদ করলেন, আমরাও এগিয়ে চললাম। দেহের সব ক্লান্তি ছাপিয়ে মনে জাগছে অপার আনন্দের আস্বাদ। দুর্গম যাত্রা-পথের শেষ অঙ্ক পেরিয়ে ঈপ্সিত লক্ষ্য আগতপ্রায়। উপর থেকে মাঝে-মাঝে যাত্রীরা তরতর করে নেমে আসছেন, কেউ হেঁটে কেউ বা ঘোড়া, ডুলি, ডাণ্ডিতে। দেখা হলেই "যমুনা মাঈ কি জয়" বলে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। এই তো যমুনোত্রী হাতের নাগালের মধ্যে বলে উৎসাহ জাগাচ্ছেন। ওঁদের সারা মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। যমুনোত্রী দর্শন ও পূজা সেরে ফিরে চলেছেন বিজয়ীর মতো।

দেহটাকে বয়ে নিয়ে উপরে উঠছি। চলি, থামি, আবার চলি। একটা বাঁক ঘুরে ছোট মন্দির, বলল ভৈরব ঘাঁটি। মন্দিরের আশে-পাশে গাছের ডালে নানা রং-এর কাপড়ের টুকরো বাঁধা, যাত্রীরা মানত করে বেঁধে গেছেন। সব দেবদ্বারে পৌঁছবার আগেই ভৈরব-নাথের ঘাঁটি। কি কেদারনাথ কি গঙ্গোত্রী, কি যমুনোত্রী—তিনি সব মন্দিরেরই দ্বাররক্ষক। তাঁকে সন্তুষ্ট করে তবেই যাওয়া যাবে দেব-দর্শনে।

মনে পড়ল মধু বৃন্দাবনে যমুনার কূলে 'বস্ত্রহরণ ঘাট'। সেখানেও যুগ-যুগ ধরে যাত্রীরা আপন মনস্কামনা পূরণকল্পে গাছে বেঁধেছেন নানা রং-এর বস্ত্র খণ্ড। আমাদের প্রার্থনা "বাবা ভৈরবনাথ" চড়াই পার করে মা যমুনার দর্শন পাইয়ে দাও।

ভৈরব ঘাঁটি পার হয়ে গুল্মলতাপূর্ণ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলেছি। ডান দিকে বহু নিচে বহমান নীল যমুনা। সূর্যের আলো পড়ে তার জল চিক্‌মিক করছে। মেঘ, বৃষ্টি কেটে গিয়ে আকাশ এখন ভার-

মুক্ত। দু-পাশেই গগনচুম্বী পাহাড়। শুভ্র তুষার তার শিখরদেশ ছাড়াও বক্ষের অনেকখানি জুড়ে আছে, তা থেকে ধীরে-ধীরে গলে-পড়া বরফের ধারা একত্র হয়ে জলপ্রপাতের রূপ ধারণ করে সগর্জনে নিচে আছড়ে পড়ছে যমুনার বুকে। একটু দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে এ দৃশ্য দেখি।

আর কতদূর ধামান সিং? সে বলে, সাব, আমরা পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে গেছি। এবার উৎরাই। উৎরাই-এর শেষে যমুনা মাঈর মন্দির।

"যমুনা মাঈ কি জয়।" সমস্বরে ধ্বনি দিয়ে উঠি। চড়াই শেষ! আমাদের ক্লান্তিরও শেষ। এবার উৎরাই, আয়াসহীন পথ-চলার শুরু।

উৎরাই পথে একটু চলেই পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে চোখে পড়ে যমুনোত্রীর মন্দির, নিতান্ত ছোট আকারের একটা টিনের বাড়ীর মতো দেখতে। আমরা মহা আনন্দে নামতে থাকি।

সোজা উৎরাই শেষে কিন্তু যমুনোত্রী মন্দির নয়। পাহাড়ের মাথা থেকে কিছুটা নেমে এসে এক জায়গায় পৌঁছলাম। পাহাড়ের অর্ধগোলাকৃতি একাংশের এক থেকে অন্য প্রান্ত জুড়ে একটি কাঠের পুল, তার নিচ দিয়ে প্রচণ্ড স্রোতে বয়ে চলেছে ঝরনা। ঝরনার জল গিয়ে পড়ছে যমুনায়। আগে নাকি এ পুল ছিল না। তখন বহু আয়াসে, বিপদের ঝুঁকি নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে এ জায়গা অতিক্রম করতে হত। পুল হওয়াতে যাতায়াত এখন সহজতর।

পুল পার হয়ে একটু উপরে উঠে উৎরাই, তার শেষেই যমুনোত্রীর ধর্মশালা ও দোকানপাট দেখা যাচ্ছে।

টিলার মাথার মতো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা যমুনোত্রী ও আশপাশের সব কিছু কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। দূরে হালকা নীল আকাশের নিচে পশ্চিম থেকে পূর্ব প্রান্ত জুড়ে চিরতুষারাবৃত

বন্দরপুন্‌ছ পর্বতমালার শিখর ও তার বিস্তৃত বক্ষ। তার নিচ থেকে রুপালী রেখার মতো তিনটি সরু ধারা নেমে এসে এক হয়ে কিছুদূর নেমে যমুনোত্রী মন্দিরের পিছনে পাহাড়ের ঘন জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। আবার এসে দেখা দিয়েছে মন্দিরের ঠিক নিচে। তারপর বাঁক নিয়ে বেগে চলেছে নিচের দিকে। অল্পদূর গিয়ে স্রোতস্বিনী আবার তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে ঘুরে গেছে ডানদিকে, আমরা সেই বাঁকের মুখে টিলার উপর দাঁড়িয়ে আছি। কি নয়ন মনোহর দৃশ্য! নির্বাক, নিস্তব্ধ হয়ে আমরা লীলাময়ী প্রকৃতির এই রসলীলা উপভোগ করতে লাগলাম—কখনো খালিচোখে, কখনো বা বাইনাকুলারের সাহায্যে। সারা পথের শ্রান্তি, ক্লান্তি কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে, মন এক অনাবিল আনন্দে ভরপুর।

এর পর সামান্য উৎরাই পথে পাথর ডিঙিয়ে যমুনোত্রী ধর্মশালা ও দোকানগুলির চত্বরে এসে পৌঁছলাম।

সামান্য একফালি সমতল জায়গার উপর দাঁড়িয়ে একটা দোতলা-ধর্মশালা, নিচের তলায় চাল, ডাল ও তরিতরকারীর দোকান, উপরে যাত্রীদের ঘর। বারান্দায় বহুযাত্রীর সমাগম। কেউ কাপড় ছেড়ে স্নান করতে চলেছেন। শুদ্ধ শরীরে যমুনা মাঈর পূজা দেবেন। কেউ বা ওধারে কাঠের উনুন জ্বেলে রান্না করতে ব্যস্ত। অন্য ধারে এক সারিতে তিন চারটি পূজোপকরণ সামগ্রীর দোকান। শুকনো নৈবেদ্য-ফল, ফুলের বালাই নেই। নারকোল, মিছরি ও একখণ্ড রঙীন কাপড়ের টুকরো—এই হল পূজার অর্ঘ্য। আমরা তিনজন এই অর্ঘ্য কিনলাম। শশাঙ্কবাবু নাস্তিক মনোভাবাপন্ন হলেও এক যাত্রায় পৃথক ফল ফলতে দিলেন না। এইসব দোকানের পিছনে নিতান্ত জাগতিক পুরি, তরকারী ও মিঠাই-এর দোকানের সারি। সেখানে বসে খাবার জায়গাও আছে। অনেক যাত্রীই যমুনা মায়ের পূজা ও অঞ্জলি দান করে খেতে বসে গিয়েছেন, সকলের মুখেই পরম প্রাপ্তির আলো।

বেলা তখন দশটা, সূর্যতাপে অল্প গরম লাগছে। আমরা জিনিসপত্র ধামান্ সিং-এর জিম্মায় রেখে হালকা জামা কাপড় পরে পূজার নৈবেদ্য নিয়ে এগিয়ে চললাম। ইতিমধ্যে এক পাণ্ডাজি আমাদের কব্জা করেছেন। খুব ভাল করে দর্শন ও পূজা করিয়ে দেবেন। পারিশ্রমিক আমাদের খুশি মতো।

ধর্মশালার চত্বর ছাড়িয়ে পাথরের উপর দিয়ে চলেছি। একটু গিয়েই নদীতে বড় বড় পাথরের উপর কাঠের তক্তা ফেলা সাঁকো পার হয়ে ওপারে এলাম। তারপর বেশ কয়েকটা উঁচু সিঁড়ি উঠে যমুনা মায়ের মন্দির। মন্দিরে যাবার পথে দুটি উষ্ণ-কুণ্ড, নিচেরটির জল কালো, নোংরা, তাতে নামতে ইচ্ছা করে না। উপরেরটা কিছু বড়, জল পরিষ্কার না হলেও অত নোংরা নয়। শশাঙ্কবাবু নামলেন না। আমি ও লালুবাবু ধীরে-ধীরে শরীরে গরম সইয়ে নেমে পড়লাম। জল খুব গরম। অনেকে দেখলাম গামছাতে চাল বেঁধে 'কুণ্ড'র জলে ডুবিয়ে রাখছেন। একটু পরেই ফুটে তা ভাত হয়ে যাবে। সেগুলি রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে মহাপ্রসাদের পর্যায়ে উন্নীত হবে। আপনজনের মধ্যে তা বিলিয়ে ওঁরা পুণ্যের ভাগ দেবেন।

গৌরীকুণ্ড ও বদরিনাথে উষ্ণ কুণ্ডর জল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যমুনোত্রীর উষ্ণ কুণ্ডর জলে স্নান করায় স্থানমাহাত্ম্য ছাড়া আর কিছু নেই।

স্নানান্তে পাণ্ডাজি আমাদের একটি স্বল্প প্রশস্ত আঙ্গিনায় নিয়ে এলেন। সেখানে পূজারী আসীন। তিনি মন্ত্র পড়িয়ে পূজার অর্ঘ্য ও দক্ষিণা নিলেন। কি মন্ত্র পড়ালেন আর আমরাই বা কি পড়লাম, নিজেরাই বুঝতে পারলাম না। কেবল দেখলাম একটি বড় শিলাখণ্ড, তার পাশে ছ-ইঞ্চি আন্দাজ ব্যাসের একটি গর্ত, যা থেকে ফোয়ারার আকারে ফুটন্ত জল উঠছে নিচ থেকে। পাণ্ডাজি বললেন এর নাম 'গোরখ কুণ্ড'। মা যমুনা নাকি এখানে তপস্যা করেছিলেন, তারই ফলে এই তুষারতীর্থ থেকে উষ্ণ কুণ্ডর সৃষ্টি। এখানে তাই প্রত্যেক

পুণ্যার্থীকে পূজা দিতে হয়, আমরাও দিয়েছি। মন্দিরের বিগ্রহের সামনে পূজা না দিয়ে এখানে কেন দিচ্ছি, এ প্রশ্ন আমার মনে জেগেছিল। এখন তার জবাব পেলাম গোরখ কুণ্ডর এক পাশে একটি নালা দিয়ে তার উপচে-পড়া জল নিচে বয়ে-যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এজল স্বচ্ছ, নিচের কুণ্ডর জলের মতো কালো নোংরা নয়।

এখানে পূজা সেরে পাণ্ডা আমাদের নিয়ে এলেন যমুনোত্রী-মন্দিরে। নিরাভরণ, নিরলঙ্কার, ভাস্কর্যহীন এই মন্দির সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ, পাথরের দেওয়াল স্থানে-স্থানে ফেটে গেছে, চালা টিনের—সব মিলিয়ে নিতান্তই সাধারণ এ মন্দির, অথচ তারই দর্শনাকাঙ্ক্ষায় যুগ-যুগ ধরে অগণিত যাত্রী দুর্গম, বিপদসঙ্কুল পথ, অতিক্রম করে এ দীর্ঘ গিরিপথ পরিক্রমা করেছেন, আজও করছেন, যমুনা মাঈ ও হিমালয়ের দুর্বার আকর্ষণ—এ ছাড়া আর কি বলব।

গর্ভ মন্দিরের অভ্যন্তরে বিগ্রহ—বামে যমুনা, ডাইনে গঙ্গা দেবীর-মূর্তি। নানা বেশ-ভূষা ও অলঙ্কারসংযোগে তাঁদের সাজান হয়েছে। যমুনার মূর্তি কালো পাথরের, গঙ্গারটি শ্বেতপাথরের। উভয়ের মাথার উপর কারুকার্য-করা রৌপ্যছত্র। তার উপরে সাদা ও গেরুয়া রং-এর কাপড়ের চন্দ্রাতপ, সামনে পূজার উপকরণ। আমরা নৈবেদ্য ও দক্ষিণা বাইরে পূজার স্থানে দিয়ে এসেছি শুনে পূজারী ক্ষুব্ধ হয়ে যা বললেন তার মর্মার্থ—বিগ্রহ যখন এখানে তখন অন্যত্র পূজা দিয়ে আসার অর্থ কী? অগত্যা এখানেও কিছু দক্ষিণা দিতে হল। ভক্তিরসাপ্লুত চিত্তে মা গঙ্গা ও যমুনাকে প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা করলাম, "মা আমার পূজা গ্রহণ কর, অন্তরের মালিন্য ঘুচিয়ে তাকে কর নির্মল ও শুদ্ধ। দেবী, তোমাদের আশীর্বাদ যেন নিত্য আমার উপর বর্ষিত হয়।"

মন ভরে গেল।

মা যমুনা ও গঙ্গার দর্শন, পূজা সাঙ্গ হলো—চারিদিকের সুন্দর দৃশ্য দেখতে-দেখতে ফেরার পথে চলতে শুরু করি।

একটা বাঁক ঘুরে চড়াই রাস্তা উঠে গেছে। অল্প দূরে একটা টিলার উপর ঘন গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে একটা বাংলো ধরনের কাঠের বাড়ী। শুনলাম ওটা নাকি বনবিভাগের নিরীক্ষণ বাংলো। সরকারী কর্মচারীরা কাজে আসলে এখানে থাকেন। ক্ষেত্রবিশেষে পর্যটকদেরও ছু-একদিন থাকতে দেওয়া হয়।

যমুনোত্রীতে রাত্রে প্রচণ্ড শীত। থাকা খাওয়ারও সুব্যবস্থা নেই। কালিকমলিওয়ালার ধর্মশালা জরাজীর্ণ। এ সব কারণে খুব কম যাত্রীই আজকাল এখানে রাত্রিবাস করেন। তাঁরা সকালে এসে দেবী দর্শন ও পূজা সেরে জানকীবাঈ চটি বা ফুলচটিতে ফিরে গিয়ে রাত্রিবাস করেন। পাণ্ডারাও কাজকর্ম শেষ করে দিনের শেষে তাদের নিবাস খুরশালী গ্রামে ফিরে যান।

আমরা এসে যমুনার তীরে একটা বড় উপল খণ্ডের উপর এসে বসি। ফেনিলোচ্ছ্বাসে নীল জলরাশি বিরামহীন কলধ্বনি করতে-করতে নৃত্যচপল ছন্দে নিম্নে বহমান। উপরে তিনটি ধারার সম্মিলিত জল যমুনা রূপে মন্দিরের পাদস্পর্শ করে বয়ে যাচ্ছে, তার উপরিভাগ সূর্য কিরণের ছটায় ঝলমল। বড়-বড় ঢেউগুলি পাথরের মাথার উপর দিয়ে চলেছে, ছোটগুলির ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে ধবধবে সাদা নুড়ি। সামনে বহু উঁচুতে দণ্ডায়মান বিশাল বন্দরপুন্ছ পর্বতমালা। চিরনীহারাচ্ছন্ন, চির সৌন্দর্যময় তার রূপ।

সবার উপরে নির্মল নীল আকাশ, তার মাঝে পেঁজা তুলোর মতো ভারহীন সাদা মেঘ ভেসে চলেছে, সব মিলে প্রকৃতি সৌন্দর্যের এক অপরূপ পশরা সাজিয়েছেন। শশাঙ্কবাবু এর মধ্যে এক ফাঁকে যমুনার শীতল জলে স্নান করে নিয়েছেন। নানা বয়সী মেয়ে-পুরুষ এখানে স্নান-রত। যৌবন চাঞ্চল্যভরা তরুণ-তরুণীরা স্নানের বেশে একে অন্যকে ক্যামেরার মধ্যে ধরে রাখতে ব্যস্ত। আমি নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছি, এসেছিলাম যমুনার উৎস সন্ধানে। সে এখান

থেকে আরও চার মাইল চড়াই পথে অতি দুর্গম বিপদসঙ্কুল পথের ওপারে চম্পাসর হিমবাহের অমৃত কুম্ভে। সেখানে যাওয়া আমাদের সম্ভব হবে না। এবারের মতো তাই এখানেই ইতি।

ভাবছি এই সেই যমুনা, হিমবাহের উৎস থেকে নিঃসৃত তার জলরাশি। এখান থেকে হিমালয়ের আকাশ-ছোঁয়া গিরিশ্রেণী ও তার কোলে লালিত চীর, পাইন ও দেওদার বনের মধ্যদিয়ে সমতলে প্রবাহিত হয়ে তাকে শস্য-শ্যামলা করেছে। পথে তার দুকূলে গড়ে উঠেছে কত তীর্থ, কত মন্দির, কত জনপদ। এই যমুনারই কূলে প্রিয়া-বিরহ-কাতর সম্রাট শাহজাহান গড়ে তুলেছিলেন তাঁর মমতাজের স্মৃতিভরা অপূর্ব মর্মরসৌধ তাজমহল, আজও যা আপন মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে।

বসে আছি। মন চলে যায় সেই দ্বাপর যুগের কালে, যখন কৃষ্ণ প্রেমে পাগলিনী শ্রীরাধা মধুবৃন্দাবনে ছুটে বেড়িয়েছেন যমুনার কূলে। মনে পড়ে কবির সেই গান—

"যমুনারই তীরে
মুরলী বাজাত শ্যাম
রাধা রাধা বোলে।"

আমি কবি নই, সাহিত্যিক নই, সাধারণ পর্যটক মাত্র। হিমালয়ের পথে-পথে অপার আনন্দে ঘুরে বেড়াই। স্থানমাহাত্ম্যে এখানে এসে সংসারের সব কিছু ভুলে যাই। সারা মন ভরে যায় এক অসীম পবিত্রতায়।

চলুন, এবার ওঠা যাক্, নাহলে বেলা থাকতে জানকীবাঈ চটিতে ফিরতে পারব না। লালুবাবুর কণ্ঠস্বরে বাস্তব জগতে ফিরে এলাম। শশাঙ্কবাবুও আমার মতো ভাবে বিভোর হয়ে বসে ছিলেন। ওঁরও ধ্যান ভাঙাতে হল।

চায়ের দোকানে এসে এক পেয়ালা চা ও সামান্য জলযোগ সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। ধামান্ সিং আগে থেকেই তৈরি ছিল।

চরিতার্থমানসে ফিরে চলেছি। মন পরম প্রাপ্তির আনন্দে আচ্ছন্ন। উৎরাই পথ, গতির রাশ টেনে ধরতে হচ্ছে ভারমুক্ত শরীরটাকে পিছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে, তবু মনে হচ্ছে যেন দৌড়ে চলেছি। অতি উৎসাহের বশে আছাড় না খাই, সেই ভয়ে মাঝে-মাঝে পরস্পরকে সাবধান করে দিচ্ছি। শশাঙ্কবাবু একটু আগে-আগে চলেছেন। মনে হচ্ছে উনি অনেক নিচে নেমে গেছেন। ওঁকে ধরবার জন্য কখন কখন আমরা দুজন ছেলে মানুষের মতো কদম বাড়াচ্ছি। একটু পরেই আবার পথের দুর্গমতার কথা ভেবে গতির রাশ টেনে ধরছি। মাঝে-মাঝে হো-ও-ও বলে আওয়াজ করে ও হাত তুলে শশাঙ্কবাবু ওঁর উপস্থিতির জানান দিচ্ছেন, আমরাও তার প্রতিধ্বনি করছি। মাঝে-মাঝে দেখা হচ্ছে চড়াই-পথে ক্লান্ত পদাতিক ঘোড় সওয়ার ও ডুলি-ডাণ্ডি-চড়া যাত্রীদের সঙ্গে। "যমুনা মাঈ কি জয়" "হিম্মত রাখুন, ধীরে চলুন, আর একটু কষ্ট করলেই পরম প্রাপ্তির অপার আনন্দ আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে"—ইত্যাদি উৎসাহ-বাণীর সাহায্যে ওঁদের চাঙ্গা করে তুলছি।

এভাবে গড়গড়িয়ে নেমে উনিশে বাঁকের একটির পর একটি অতিক্রম করছি। পাহাড়ে তো কতো জায়গায় ঘুরেছি কিন্তু এমন 'Z' আকারের পাকদণ্ডি কোথাও দেখিনি। উঠবার সময় যে ক্লান্তি ও অবসাদ ছিল তা সম্পূর্ণ বিদূরিত। মহাতীর্থ যমুনোত্রী পরিক্রমা করে সুস্থ, সবল দেহে পরমানন্দে নেমে চলেছি। উঠতি-পথে আশে-পাশে তাকিয়ে দেখার মতো মনোবল ছিল না। এখন মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে সব কিছু দেখ্‌ছি। ঘন চীর ও পাইন বনের মধ্য দিয়ে পাকদণ্ডি। বাঁয়ে বহু নিচ দিয়ে বহমানা যমুনা। তার কলধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ডান দিকে গহন অরণ্য। তার অভ্যন্তরে কত হিংস্র ভালুকের বাস কে জানে। তাঁরা দয়া করে আমাদের দর্শন না দিলেই বাঁচি। ধামান সিং অবশ্য অভয় দিয়ে বলল, "এত যাত্রী চলেছে, এর মধ্যে ওরা সামনে পড়বে না।"

উনিশে বাঁকের তিন-চারটা ঘুরতে বাকি, এমন সময় দেখি ব্যস্ত ভাবে তিন চারজন সিপাই উপরে উঠছে। কি ব্যাপার! ওরা বলল পিছনে বারকোটের মহকুমাধীশ হুজুর আসছেন। ওরা তাঁর অগ্রিম নকীব। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে 'হুজুর' আসছেন দেখা গেল। আঁট-সাঁট প্যাণ্ট পরে, মাথায় ফৌজী টুপি লাগিয়ে ও চোখে কালো চশমা পরে আপন মর্যাদাসচেতন 'হুজুর' চলেছেন যমুনোত্রী-দর্শনে। ওঁর পিছনেও দু-জন সিপাই। তার পিছনে আমাদের বুধ-সিং—স্যানাচটির কুলি ঠিকাদার আর গতকালের সকালের রঙ্গমঞ্চের নায়ক। দীর্ঘ, ঋজু-দেহী বুধ সিং, উনিশে বাঁকের ঐ অমন কঠিন চড়াই কেমন সহজে অতিক্রম করছে। হাতে একটা বন্ধ করা ছাতা, সেটাকে লাঠির মতো ঘোরাতে-ঘোরাতে উঠছে। আমাদের দেখে নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞাসা করল ভালভাবে আমাদের যমুনাজীর দর্শন হয়েছে কিনা। আমরা হাঁ বলাতে ও খুশী হল ও বলল মহকুমাধীশ আজকেই জানকীবাঈ চটি ফিরবেন, ওকেও তাঁর সঙ্গে ফিরতে হবে।

চলতে-চলতে ভৈরব ঘাঁটি পার হয়ে আমরা জংলা চটিতে পৌঁছলাম। সকালের চা-দোকানি হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল ওর গরিবী দোকানে এক পেয়ালা চা পান করে যেতে। আমরা ঠিক সময়ের আগেই নামছি, খুশীমনে রাজি হয়ে পথের ধারে ঐ গাছের গুঁড়ি মার্কা বেঞ্চের উপর বসে পড়লাম। দোকানি হরি সিং গরম চা নিয়ে এল। লালুবাবু প্যাকেট থেকে দুখানা করে বিস্কুট দিলেন। হরি সিংকে জিজ্ঞাসা করলাম এখানে ব্যাবসা কেমন চলে। ও বলল বছরে সাত মাসের বেশী তো যাত্রী চলাচল বন্ধ থাকে। গরম কালে মে-জুন আর শীতকালে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-মাসে যাত্রীর আনাগোনা, সে সময়টা সামান্য কিছু যা বিক্রি, বাকী মাসগুলি সব বন্ধ। বীফগাঁয়ে ওর বাড়ী, রোজ ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এখানে এসে সন্ধ্যায় ফিরে যায়।

লালুবাবু দুঃখ করে বললেন সামান্য কটা পয়সা রোজগারের জন্য এরা কি পরিশ্রমই না করে।

চা-পান ও স্বল্প বিরতির পর আমরা জংলা চটি ছেড়ে চললাম। পথ অনেক জায়গায় সরু ও খারাপ হলেও আমরা অনায়াসে চলেছি, আকাশ এখন মেঘহীন, রৌদ্রও কড়া। সকালের ভিজা রাস্তা এখন অনেক জায়গাতেই শুকিয়ে গিয়েছে। নামার সময় যেখানে পাহাড় থেকে জল চুঁয়ে পড়ছিল ও ফাটল দেখেছিলাম, সেটা এখনও তেমনি বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। খুব সাবধানে ওর তলা দিয়ে পার হয়ে এলাম। অনবরত জল পড়ে রাস্তা এখানে ভীষণ পিছল, একটু অসতর্ক হলেই ধরণীতলে চিরশয্যা।

এভাবে চলতে-চলতে দু-ঘণ্টার মধ্যেই একটু প্রশস্ত যায়গায় এসে দাঁড়ালাম। নিচে ছোট উপত্যকার উপর জানকীবাঈ চটির ঘরবাড়ীগুলি দেখা যাচ্ছে। ঐতো, সরকারী নিরীক্ষণ ভবন, আর একটু নিচে ঐ তো দেখতে পাচ্ছি আমাদের যাত্রীনিবাস।

মিনিট পনেরর মধ্যেই "যমুনা মাঈ কি জয়, গঙ্গা মাঈ কি জয়" ধ্বনি দিতে দিতে আমরা জানকীবাঈ চটি যাত্রী-নিবাসে এসে পৌঁছলাম। বেলা তখন ঠিক দেড়টা। আজ দিনের বাকীটুকু ও রাত্রে—এখানে বিশ্রাম। স্নান ঘরে গিয়ে ভালকরে হাত-মুখ ধুয়ে ধামান সিং-এর জিম্মায় ঝোলাগুলি রেখে সোজা পাশীর হোটেলে এসে খেতে বসে গেলাম। এক হাঁড়ি বাসমতি চালের ভাত তখন সবে উনুন থেকে নামান হয়েছে। ঐ গরম ভাত, সঙ্গে ডাল ও তরকারীর 'ককটেল'। উদর-দেবতাকে পরিপূর্ণ তৃপ্ত করে যাত্রী-নিবাসে ফিরে এলাম। বাহাদুর সিং ততক্ষণে আমাদের ঘর খুলে দিয়েছে। বিছানা পেতে তাতে গা এলিয়ে দিলাম। শরীরে ক্লান্তি, কিন্তু মন পরিপূর্ণ যমুনোত্রী তীর্থ পরিক্রমা করে আসার আনন্দে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। লালুবাবুর ডাকে উঠে বসলাম। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, বাইরে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে।

বাহাদুর সিং একটা লণ্ঠন জ্বেলে দিয়ে গেল। আমরা কম্বল গায়ে জড়িয়ে কালকের যাত্রার পরিকল্পনা ঠিক করে ফেললাম।

একটু পরে পাশের ঘর থেকে অনুপ ও মহেন্দ্র সিং এসে আমাদের ঘরে বসল। ওরা আজ সমস্ত জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে জরীপ করেছে। অনুপ বলল যমুনোত্রীর পথে বাস-রাস্তা হয়ত ভবিষ্যতে জানকীবাঈ চটি পর্যন্ত আসতে পারে, কিন্তু বাকী সাড়ে-চার মাইলটুকু হাঁটাপথই থেকে যাবে। পাহাড় কেটে এই সরু ও চড়াই পথ বাস চলার উপযোগী করা প্রায় অসম্ভব, আর তার সার্থকতাই বা কতটুকু।

এপথে যাঁরা আসেন তাঁরা এটুকু হেঁটে হিমালয়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করতে চাইবেন না। সত্যই তো। বাসে আসতে আসতে কত সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়েছে, কিন্তু সেগুলি সঙ্গে সঙ্গেই চোখের আড়ালে চলে গিয়েছে। ক্ষণিকের দেখা দৃশ্যগুলি অচিরেই ঝাপসা হয়ে যাবে।

সেকালে যারা এ পথে বহুদূর থেকে হেঁটে হিমালয়ের তীর্থগুলি পরিক্রমা করেছেন তাদের কষ্ট অনেক বেশী হয়েছে, সময়ও অনেক বেশী লেগেছে, কিন্তু তাঁরা যা দেখেছে তার ছবি চিরস্থায়ী হয়েছে। লক্ষ্যপথে পৌঁছে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী আনন্দলাভ করেছেন।

গল্প বেশ জমে উঠেছিল। অনুপদের চাপরাশী এসে খবর দিল, রাতের খাবার তৈরী। ওরা বিদায় নিয়ে উঠে পড়ল। কাল ভোরে আমরা বেরিয়ে পড়র ফিরতি পথে স্যানাচটি। ওদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। লালুবাবু ওদের অনেক ধন্যবাদ দিলেন, নানা তথ্য জানান ও সঙ্গদানের জন্য। ওরা বলল "সেটা তো উভয়তঃ আমরাই কি কম আনন্দ পেলাম আপনাদের সঙ্গলাভে।"

শশাঙ্কবাবুর কবি-স্বভাব। ধীর উদাত্তকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের কবিতার কলি আবৃত্তি করে উঠলেন,—

“কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই—
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।”

হিমালয়ের পথে আমরা তো মুসাফির, কবির ভাষায় “টুকরো করে কাছি আমি ডুবতে রাজি আছি”। এই বেপরোয়া বন্ধনহীন ভ্রমণের-পথে কত অজানাকে জানার সৌভাগ্য হল। কত দূর কাছে এল আর পরিচয়হীন অনাত্মীয় সস্নেহ আলিঙ্গনে নিমেষে আমাদের আপন করে নিল।

আমরা যোশীর হোটেলে গিয়ে তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া শেষ করে ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। বাইরে কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। দরজা, জানলা বন্ধ থাকাতে হিমেল হাওয়ার ঝাপটা আসছে না। গরম জলের ব্যাগটা কম্বলের নিচে রেখে শুয়েছি। বেশ আরাম লাগছে। শশাঙ্কবাবু লণ্ঠনটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে ডাইরি খুলে বসলেন। রোজ রাত্রে শোবার আগে ওঁর রোজ-নামচা লেখা চাই। এ ছাড়া কলকাতার বাড়ীতে চিঠি লিখতে হবে, বিধবা মা আছেন। উনি ভাবছেন চিঠিগুলি ঠিক সময়েই গিয়ে পৌঁছবে। আমি বললাম যে এপথে লেখা ওঁর সব চিঠি এক সঙ্গে গিয়ে কলকাতা পৌঁছবে, তাও সম্ভবতঃ আমরা কলকাতা ফিরে যাবার পরে, অতএব! উনি একটু মুচকি হেসে বললেন, “তা হোক, আমি তো এখন থেকে সময় মতো লিখে আমার কর্তব্য শেষ করলাম, ওরা যখন হয় পাবে।” ভাল যুক্তি।

উৎরাই-পথে নামতে লালুবাবুর হাঁটুর ব্যথাটা চাড়া দিয়ে উঠেছে। গরম জলের ব্যাগটা কখনো হাঁটুর উপর কখনো বা পিঠের তলায় রাখছেন। বলছেন “আর একটা ব্যাগ পেলে বড় ভাল হত। এক সঙ্গে পিঠ ও হাঁটু দুই গরম করা যেত।” আমি বললাম “তিনটা থাকলে আরও ভাল হত। তৃতীয়টি মাথার ধারে রাখতে পারতেন”।

ছুটো কম্বলেও ওঁর শীত মানাচ্ছে না। মশারিটাও কম্বলের নিচে তোষকের মতো পেতেছেন, অথচ ওটা আনাতে আফ্‌শোশের অন্ত ছিল না।

রাত্রি এগারটা। শশাঙ্কবাবুর চিঠি ও রোজ-নামচা লেখা শেষ হয়েছে। জয় মা যমুনা, জয় মা গঙ্গা বলে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

শেষ রাত্রে বেশ গাঢ় ঘুম এসেছিল। লালুবাবুর ডাকে উঠে পড়তে হল। ঈপ্সিত সময়ে ঘুম ভাঙা ওঁর বেশ আয়ত্তে আছে। টর্চ জ্বেলে দেখি ঘড়িতে তখন সাড়ে-চারটা। লণ্ঠন জ্বেলে বিছানা বেঁধে ফেললাম। দরজা খুলতেই বাইরের হিমেল হাওয়া সমস্ত অন্তস্তল পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল।

বাইরে তখনও ঘন অন্ধকার। আকাশ কুয়াশায় আচ্ছন্ন হলেও বৃষ্টি পড়ছে না। এদিকে শশাঙ্কবাবু তখন বিছানা-বাঁধার-ফাঁকে ফাঁকে মৃদুকণ্ঠে আবৃত্তি করে চলেছেন—

"যাত্রা করো যাত্রা করো যাত্রীদল,
উঠেছে আদেশ
বন্দরের কাল হ'ল শেষ।"

ধীরে-ধীরে নিশা-অবসানে দিনের আলো ফুটে উঠতে লাগল। কুয়াশার আড়ালে সূর্যদেব লুকিয়ে। সময় তখন সাড়ে-পাঁচটা। যোশীর হোটেলে চা ও গরম জিলিপি খেয়ে পৌনে-ছ-টার সময় আমরা রওনা হলাম। ইতিমধ্যে বাহাদুর সিংকে ঘর ভাড়া বাবদ তার পাওনা মিটিয়ে দিয়েছিলাম, আর কিছু বকশিশও।

যমুনা মাঈ কি জয়, গঙ্গা মাঈ কি জয় ধ্বনি দিতে-দিতে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে আমরাও রওনা হলাম স্যানাচটির পথে।

কুয়াশা কেটে গেছে। সূর্যদেব তাঁর সপ্তাশ্ববাহিত রথে দিনের পরিক্রমা শুরু করেছেন।

মনের আনন্দে স্বচ্ছন্দগতিতে চলেছি। সারা আকাশ রৌদ্র-ছটায় উদ্ভাসিত। বাঁফ্‌গাঁয়ের মাঠে গাছতলায় এখনও বহু যাত্রী রয়েছেন। জিনিস-পত্র বেঁধে তাঁরা তৈরী হচ্ছেন আজকের যাত্রা শুরু করার জন্য। গাঁয়ের ছেলে-মেয়েরা ঝুড়ি মাথায় নিয়ে মাঠের

দিকে চলেছে চাষের জন্য। যেতে-যেতে সরল কৌতুক-মিশ্রিত-দৃষ্টিতে আমাদের পানে তাকিয়ে আছে। সাজ পোশাক ওদের দীন অবস্থার পরিচয় দেয়।

আরও কিছুটা পথ প্রায় সমতল মাঠের মধ্য দিয়ে। যমুনার ওপারে খরশালী গ্রামের ঘরবাড়ী ও মন্দির দেখা যাচ্ছে।

প্রায় সাতটার সময় আমরা এসে ফুলচটি পৌঁছলাম। চারিদিকে ফুলের শোভা মন ভরিয়ে দেয়। যাবার সময় আমরা এখানে দুপুরের-আহার সমাধা করেছিলাম। লালুবাবু বললেন, শুনেছি এখানে যমুনার জলে নির্ভয়ে স্নান করা যায়। যাবার বেলায় সময় ছিল না, এখন তো হাতে অনেক সময়, চলুন, স্নান করে যাই। স্নানার্থী আমরা ফুলচটি থেকে নেমে উঁচু-নিচু মাঠের মধ্য দিয়ে চললাম। নদী এখানে অনেকটা এগিয়ে এসেছে পথের ধারে। ওপারে পাহাড়ের মাথায় ও তার ঢালে অবাধে গরু, ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে, গড়িয়ে পড়ার কোন লক্ষণই নেই। মাঝে-মাঝে সবুজ গাছ, বেশীর ভাগ জায়গায় শুকনো পাথর। দূরে বন্দরপুন্ছ পর্বতমালার নিম্নভাগ গহন অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। তার বক্ষে হিংস্র শ্বাপদের অবাধ সঞ্চরণ। মানুষের যাতায়াতে ক্ষুব্ধ তারা আজ পথভাগ পরিত্যাগ করে অরণ্যের গভীরে আশ্রয় নিয়েছে। নিচে পুণ্য প্রবাহিণী যমুনা। প্রস্তর-খণ্ডের মধ্য দিয়ে সর্পিল-গতিতে তাঁর গহননীল জলরাশি বয়ে চলেছে, কলধ্বনিতে মনে আনন্দের সুর রণিত হয়ে ওঠে। নগ্নগাত্রে নেমে পড়ি জলে। হিমশীতল জল যেন সমস্ত অঙ্গে মৃত্যুর স্পর্শ বুলিয়ে দেয়। এই জন্যই কি যমের বোন যমুনা?

স্নানে ক্রমশঃ অপার আনন্দের অনুভব হতে লাগল। পূর্বমুখ হয়ে সূর্যদেবকে প্রণাম করলাম। লালুবাবুর তাড়ায় বেশীক্ষণ স্নান-সুখ উপভোগ করা গেল না, উঠতে হল। স্নানান্তে সারাদেহে মৃদু উষ্ণতার আমেজ লাগাতে খুব আরাম পেলাম। চায়ের দোকানে

এক পেয়ালা চা পান করে আবার শুরু হল পথ-চলা। হনুমান চটিতে স্বল্প বিরতি। সেখানেই জল খাবার খেয়ে নেব।

প্রফুল্লমনে উৎরাই পথ দিয়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে নেমে চললাম।

আমরা তখন ফুলচটি ও হনুমান চটির প্রায় মাঝামাঝি পথে। গাছের ছায়ায় বেশ আরামে এগিয়ে চলেছি। দূর থেকে ভেসে আসা ঢাক-ঢোলের বাজনা ও কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ কানে এল। একটু পরে দেখি বহু লোক বিভিন্ন সাজে ঢোলক ও কাঁসর বাজাতে-বাজাতে আসছে। ওরা তখনও বেশ নিচে, আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। ওদের মাঝখানে সুন্দরভাবে সাজান একটা চতুর্দোলা। পাল্‌কি বয়ে নেবার মতো চারজন লোক সেটা বয়ে চড়াই-পথে উঠ্‌ছে। আমরা একটু চওড়া জায়গায় পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়াই। খুব সমারোহ সহকারে ঢাক ঢোল, কাঁসর বাজিয়ে গান গাইতে-গাইতে মিছিল নিয়ে ওরা চলেছে। ওদের একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম ওরা আসছে উত্তরকাশী থেকে, যাবে যমুনোত্রী। সেখানে যমুনা ও গঙ্গা মাঈর পূজা দিয়ে আবার ফিরে যাবে উত্তরকাশী। হেঁটে যাচ্ছে, পূজা দিয়ে ফিরবেও সেভাবে। এটা ওদের বার্ষিক উৎসব। খুব ধুম-ধামের সঙ্গে পালন করে। ওদের এদলে সারা গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-পুরুষ নিয়ে প্রায় জনা-পঞ্চাশেক ভক্ত আছে। আজ রাত্রে ফুলচটিতে বিশ্রাম করে কাল ভোরে রওনা হবে যমুনোত্রী।

মনে মনে ওদের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়কে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারলাম না। বাসে যাবার উপায় থাকা সত্ত্বেও ওরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পায়ে-চলে এ পরিক্রমা শেষ করবে। বাস-পথে না এসে সোজা পাহাড়ী পাকদণ্ডি পথ দিয়ে চলছে এই দল। এ পথে দূরত্ব কম, কিন্তু পথ অনেক দুর্গম ও বিপদ-সঙ্কুল। চড়াইও কঠিনতর, সেই সঙ্গে হিংস্র জন্তুর ভয়ও অনেক বেশী। কিন্তু প্রকৃত তীর্থকামীর

কাছে 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য'। তাই ভাবনাহীন চিত্তে ওরা এগিয়ে চলেছে যমুনামায়ীর দর্শন-লাভ মানসে।

ওদের চলার সঙ্গে সঙ্গে ঢাক, ঢোল, কাঁসরের আওয়াজও মিলিয়ে গেল। আমরাও চলতে-চলতে যমুনার পুল পার হয়ে হনুমান চটি এসে পৌঁছলাম। সেই দোকান-পাট, হোটেল, ধর্মশালা ও পথের দুধারে বিশ্রামরত যাত্রী-মুখর হনুমান চটি। পথ চলতে-চলতে যেন একটা জংসন স্টেসন। আমাদের হাতে সময় অঢেল, ক্ষিদেও পেয়েছে। চা ও খাবার খেয়ে তার পর এগুব। একটা দোকানে ঢুকে চা, পকোড়া ও জিলিপির ফরমাশ দিলাম। সবই গরম-গরম তৈরী হচ্ছে।

হনুমান চটি ছাড়িয়ে রাস্তা সঙ্কীর্ণ, অসমতল। উৎরাই-পথে দ্রুত-গতিতে নেমে চলেছি। মাঝে-মাঝে অল্প চড়াই, তা অতিক্রম করতে কোন কষ্ট হচ্ছে না।

আরও কিছুদূর চলতে-চলতে আমরা হাঁটা-পথ ও নূতন তৈরি বাস-পথের সংযোগস্থলে এসে পৌঁছলাম। এখানে ট্যাকসি ও জীপওয়ালাদের ভীড়। ডুলি, ডাণ্ডির অনেক যাত্রীদের নিয়ে ওরা স্যানাচটি পেরিয়ে উত্তরকাশীর দিকে যাবে। আমরা তিনজন পদাতিক। যমুনোত্রী দেখে পরিপূর্ণমনে স্যানাচটি ফিরে চলেছি। সেখান থেকে বাসে রওনা হব গঙ্গোত্রী-পথে।

রাস্তা এখন চওড়া ও হালকা উৎরাই। বাস চলার মতো করে তৈরী হয়েছে। খুব আরামে হেঁটে চলেছি। ডান দিকে নিচ দিয়ে বহমানা যমুনা যেন আমাদের ভরসাবাণী শোনাতে-শোনাতে সঙ্গে-সঙ্গে চলেছেন।

বাস চলার মতো চওড়া করে নূতন-তৈরী রাস্তা এখনও শেষ হয়নি। আগামী বছরের যাত্রীরা হয়তো হনুমান চটি পর্যন্ত বাসে যেতে পারবেন। যমুনোত্রী যেতে হাঁটাপথের দূরত্ব তখন আরও চার-মাইল কমে গিয়ে মাত্র আট মাইল থাকবে।

আমরা এখন শব্দের চেয়েও আগে-চলার-যুগে বাস করছি। যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী-গোমুখ পরিক্রমায় যে সময়ের প্রয়োজন, তার মধ্যে এই বিংশ শতাব্দীতে কয়েকবার বিশ্ব-পরিক্রমা করে আসা যায়। মাত্র বিশ বছর আগেও মধ্য হিমালয়ের এই অঞ্চলগুলিতে পদ-পরিক্রমা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। বহু জায়গায় রাস্তা বলে কোন-কিছুর অস্তিত্বই ছিল না। বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পায়ে-চলা-পথ ছিল দুর্গম ও হিংস্র জন্তু-অধ্যুষিত। সেই সঙ্গে ছিল আবহাওয়ার-প্রতিকূলতা। বহুস্থানে ভয়ঙ্কর ধস্ নেমে যাত্রীদের পথ অবরোধ করেছে, বৃষ্টি ও আঁধি এসে করেছে বিভ্রান্ত। খাদে গড়িয়ে পড়ে কত যাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতির এই ভয়ঙ্কর প্রতি-কূলতার উপর বারবার জয়ী হয়েছে হিমালয়ের প্রতি মানুষের দুর্বার আকর্ষণ। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে তাঁরা ছুটে এসেছেন হিমালয়ের টানে। পুণ্যকামী, সৌন্দর্য-পিপাসু, ব্রহ্মজিজ্ঞাসু—সকল অভিযাত্রীর মিলনতীর্থ ভারতের উত্তর শিয়রের এই অতন্দ্র প্রহরী হিমালয়। আবার যুগ-যুগান্ত ধরে হিমালয়কে ভিত্তি করে ভারতবর্ষ যে সভ্যতা ও ঐতিহ্যকে লালন করে এসেছে, তাকে বিশ্লেষণ করতে ছুটে এসেছেন বিদেশী পর্যটকের দল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। এঁদের মধ্যে স্যার ফ্রান্সিস ইয়ং হাসব্যাণ্ড, ফ্রান্স স্মাইথ, জর্জ ফ্রান্সিস্ হোয়াইট ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। স্বদেশী অভিযাত্রী পর্যটকদের মধ্যে ইদানীং কালে জলধর-সেন, সর্বশ্রী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল মহাশয়দের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তাঁরা দুর্গম ও বিপদ-সঙ্কুল-পথে হিমালয়ের এক থেকে অন্য প্রান্তে বহুবার ভ্রমণ করেছেন। ওঁদের লেখা ভ্রমণ-কাহিনীগুলি পর্বত-প্রেমিকদের অনুপ্রেরণা যোগায়। যত দেখছি, যত ঘুরছি "দেখার আকাঙ্ক্ষা বেড়েই যাচ্ছে।"

আমাদের দুর্ভাগ্য, চিরতুষারাবৃত কৈলাসপর্বত ও অপার

সৌন্দর্যের আকর মানস সরোবর আমরা দেখতে যেতে পাব না, কারণ বর্তমানে তা চীন-কবলিত। যদি কোনদিন আবার "হিন্দি-চীনি ভাই-ভাই" হয় ও ততদিন সক্ষম হয়ে বেঁচে থাকি, তবেই সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে পারে। আজ সে আশা সুদূরপরাহত।

কৈলাস-মানস সরোবর কোন্ পথে যেতে হত লালুবাবুর এ প্রশ্নের উত্তরে বললাম, এ "দুটি হিমতীর্থ হিমালয়ের শেষ সারির শৃঙ্গগুলির ওপারে তিব্বতে অবস্থিত। আলমোড়া, যোশী মঠ, মানা, গঙ্গোত্রী, শ্রীনগর (কাশ্মীর)-এ-সব জায়গা থেকেই কৈলাস-মানস-সরোবর যাবার পথ ছিল। বেশীর ভাগ যাত্রীই অবশ্য আলমোড়া, যোশীমঠ বা বদরিনাথ থেকে এ পথে পাড়ি দিতেন। দূরত্ব কোথাও দু-শ, কোথাও একশ ষাট, কোথাও বা দু-শ চল্লিশ মাইল। অত্যন্ত দুর্গম, হিম-শীতল-পথ অতিক্রম করে, অভিযাত্রীরা এ তীর্থ পরিক্রমা করতেন।

তিব্বতের রাজধানী লাসা থেকে মানস সরোবরের দূরত্ব আটশ মাইল।

সিন্ধু, বর্ণালী, ব্রহ্মপুত্র ও শতদ্রু নদীর উৎস মানস সরোবর। এর উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে এদের উৎপত্তি।

বিভিন্ন অভিযাত্রীদের বর্ণনা থেকে জানা যায় পৃথিবীর এই বৃহত্তম হ্রদ সমুদ্রতীর হতে ১৪,৯৫০ ফুট উঁচুতে তিব্বত উপত্যকায় অবস্থিত। এর পরিধি ৫৪ মাইল, গভীরতা প্রায় ৩০০ ফুট এবং প্রায় ২০০ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে এর অবস্থান। বর্ণনায় আরও আছে শীতকালে সমস্ত হ্রদ তুষারস্তূপে পরিণত হয়, বসন্তে আবার তা গলে পরিণত হয় এক অবর্ণনীয় সুন্দর হ্রদে। তখন এর জল যে-কোন হিমবাহ নিঃসৃত নদীর জলের মতো সুস্বাদু*। এর স্ফটিক-স্বচ্ছ-জলের মধ্য দিয়ে সরোবরের বক্ষে ছড়ান নানা রং-এর ছোট-বড় পাথরের নুড়িগুলি যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে তা নাকি বড় সুন্দর। এর-দীর্ঘ

* Kailash Mansarovar, Swami Pranavanada.

যমুনোত্রীর মন্দির ও তপ্তকুণ্ড

ঝালার নিকটে ভাগিরথী নদী
ফটো : এস্. এস্. মুখার্জ্জী

লঙ্কা ও ভৈরবঘাটির মধ্যবর্ত্তি জাহ্নবী নদী

গঙ্গোত্রীর দৃশ্য
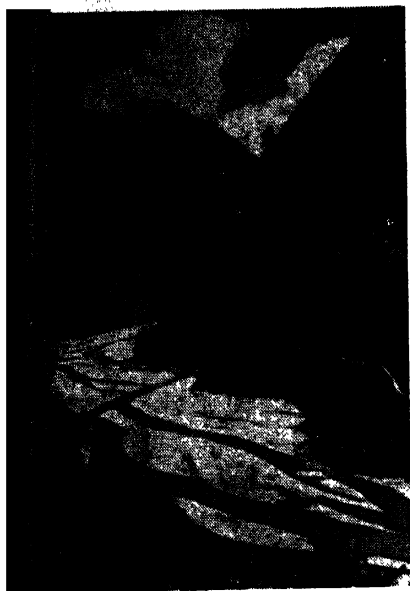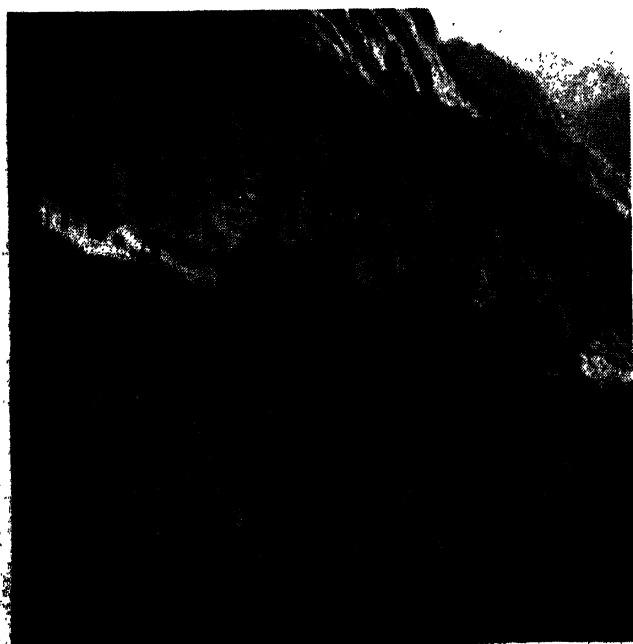
গঙ্গামাতার মন্দির—গঙ্গোত্রী

ফটো : এস্. এস্. মুখার্জ্জী

ভাগিরথী শৃঙ্গ—গোমুখের পথে

ফটো : অমিত দে

ভূজবাসী লালবাবার আশ্রম

ফটো : অমিত দে

গোমুখ
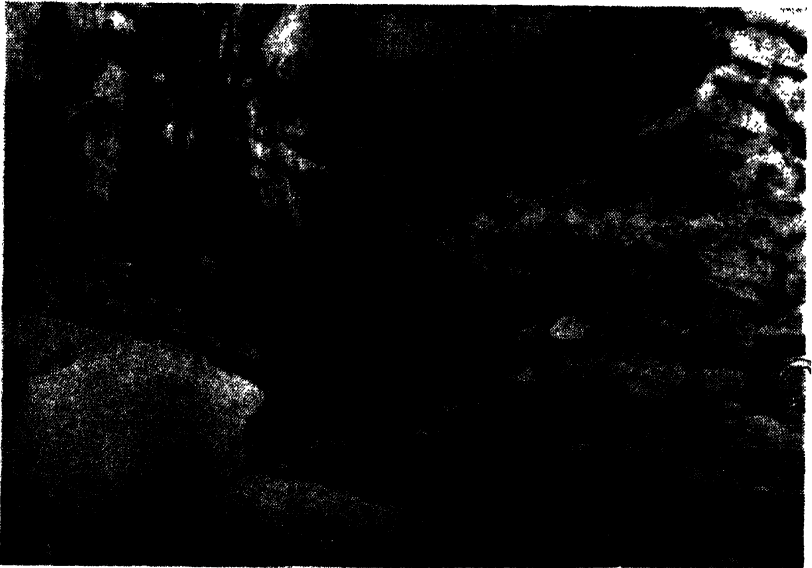
কূলের স্থানে-স্থানে তিব্বতীদের মঠ অবস্থিত। ওঁদের শাস্ত্র বলেন মানস সরোবরের একাংশ দেবতাদের বাসভূমি। সেকালে এর ভিন্ন-ভিন্ন অংশে নেপাল, ভূটান, লাদাখ ও ভারতীয়দের বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, এ অঞ্চলগুলির মধ্যে অবাধ যাতায়াত ও বেচাকেনা চলত। তিব্বত চীনের কবলিত হবার পর সে সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

মানস সরোবরের বিশাল বক্ষে বিভিন্ন ঋতুতে ছোট-বড় ঢেউ-এর খেলা। তাতে ভাসতে দেখা যায় নানা শ্রেণীর রাজহংস। উত্তরে চিরতুষারাচ্ছন্ন মহিমময় কৈলাস। তার উপর সূর্য-কিরণের ছটা ও মানস সরোবরের স্বচ্ছ-গভীর-জলে তার প্রতিফলন যে অপূর্ব সৌন্দর্যের পটভূমি রচনা করে তা তুলনাহীন। ভাষা তাকে রূপ দিতে অক্ষম। কবি বলেছেন—

"মানস সরোবর কৌন্ পরসে।
বিন বাদল হিম্ বরষে॥"

অর্থাৎ মানস সরোবরে কে পারে যেতে, যেখানে বিনা মেঘে তুষার ঝরে।

লালুবাবু আক্ষেপ করে বার-বার বলতে লাগলেন, আহা এমন অপূর্ব স্থান আমরা দেখতে পাব না।

গল্প করতে-করতে বেশ স্বচ্ছন্দগতিতে এগিয়ে চলেছি। এক সময় শশাঙ্কবাবু উল্লসিতকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন।—এসে গিয়েছি, এসে গিয়েছি। ঐ দেখুন নিচে স্যানাচটি দেখা যাচ্ছে। মহা-আনন্দে "যমুনা মাঈ কি জয়, গঙ্গা মাঈ কি জয়" বলে ধ্বনি দিয়ে উঠলাম।

মূল রাস্তা থেকে পাকদণ্ডি নেমে গেছে। তার শেষেই চারিদিক পাহাড়-ঘেরা স্যানাচটির উপত্যকা ও ডানদিকে বয়ে যাওয়া নীল যমুনাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। তরতর করে আমরা নেমে এলাম দশ মিনিটের মধ্যে। উঠবার সময় লেগেছিল প্রায় আধ-ঘণ্টা। নিচে নেমে সোজা চলে এলাম যাত্রীনিবাসের বারান্দায়।

ধামান সিং ও তার সাথী মালপত্র নিয়ে আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। বেলা তখন এগারটা বেজেছে।

হাত-মুখ ধুয়ে আমি ও লালুবাবু ছুটলাম বাসের টিকিট পাবার জন্য লাইন দিতে। চত্বরের চারিপাশে তখন অগণিত যাত্রীর ভীড়, অথচ স্ট্যাণ্ডে একখানাও বাস নেই। পথে নাকি ধস্ নেমে রাস্তা বন্ধ হয়েছে। তা মেরামত হবার আগে আসতে পারবে না। কয়েক-খানা ট্যাক্সি ও দুখানা মিনিবাস দাঁড়িয়ে আছে। তাদের বাঁধা যাত্রীরা 'ওপরে' অর্থাৎ যমুনোত্রী গিয়েছেন, ফিরে এসে ওগুলিতে চড়বেন।

এদিকে যাত্রীনিবাসে ঘর খালি নেই। যদি রাত্রে থাকতে হয় তবে অন্য কোথাও ভাগ্য পরীক্ষা করতে হবে, দেখা যাক্।

টিকিট ঘরের কাছে একটি যুবকের সঙ্গে আলাপ হল, নাম পরিমল সাহা। ওরা তিন বন্ধু কলকাতা থেকে এসেছে, যাবে গঙ্গোত্রী। আমরাও একই পথের যাত্রী শুনে খুব খুশী হয়ে বলল "খুব ভাল হল, এক সঙ্গে যাওয়া যাওয়া যাবে"। পরিমল আরও বলল "ও একজন টিকিট-বাবুর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছে, আজকের প্রথম বাসেই উঁচুশ্রেণীর তিনখানা টিকিট পাবে। আমাদের তিন বন্ধুর জন্যও টিকিট কাটতে ভিতরে চলে গিয়েছে সে"। বন্দোবস্ত পাকা করে এল, নামও লিখিয়ে এল। একটু অবাক হলেও খুব আশ্বস্ত হলাম। পরিমল শুধু বলল "ভাববেন না, ঠিক 'ম্যানেজ' হয়ে যাবে"। লালুবাবু ছুটলেন শশাঙ্কবাবুকে এ সুখবর দিতে।

পরিমল আমাকে নিয়ে যাত্রী শিবিরে এল। সেখানে ওর অন্য দুই সঙ্গীর সঙ্গেও পরিচয় হল। ওদের নাম রোহিত মণ্ডল ও গৌর মুখার্জি। বরাহনগরে রোহিতের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরীর একটি কারখানা আছে। গৌর মুখার্জি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবগারী বিভাগে কর্মী। পরিমলেরও যন্ত্রপাতি সরবরাহের নিজস্ব ব্যবসা। এরা তিনজনই যুবক, বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। মিষ্টভাষী, কর্মঠ ও সাহায্য-পরায়ণ এই তিনটি যুবকের সঙ্গে আলাপ করে খুব ভাল লাগল।

পরিমল বলল, ওরা কাল দুপুরে জানকীবাঈ চটি থেকে ফিরেছে। তখন সব বাস ছেড়ে গিয়েছে, রাত্রে ছিল এই শিবিরে। মাটির মেঝে, কোন দরজা-জানলা নেই। লম্বা একটানা বিরাট 'হল-ঘর'। তাতে অন্ততঃ দুশো যাত্রী আশ্রয় নিয়েছে ঢালাও বিছানা পেতে। টিনের চাল, সারারাত শীতে খুব কষ্ট হয়েছে, যার ফলে বেচারাদের গলাও বসে গেছে। সকালে উঠে তিন-চার কাপ আদা দেওয়া চা খেয়ে কিছুটা ভাল বোধ করছে। শশাঙ্কবাবু বললেন, আজ যদি বাসে টিকিট না পাই তবে আমাদেরও কি এই গতি হবে? পরিমল বলল, নিশ্চিন্ত থাকুন, বাস যদি ছাড়ে তবে আমরা ছ-জন জায়গা পাবই।

বাসের টিকিট সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে যাত্রীনিবাসের বারান্দায় ফিরে এলাম। তত্ত্বাবধায়কের নিষেধ অগ্রাহ্য করে যাত্রীরা সেখানে যে-যার বিছানা রেখেছে। শশাঙ্কবাবুও আমাদের তিনজনের জায়গা রেখেছেন। ধামান সিংকে বিছানা পাহারা দিতে বসিয়ে রেখে আমরা খেয়ে এলাম।

দুপুর গড়িয়ে বেলা তিনটে। একখানা বাসেরও দেখা নেই। কয়েক'শ যাত্রী উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষারত বাস-চত্বরের চারিধারে। হাঁটতে-হাঁটতে আমরা যমুনার পুলের উপর এসে দাঁড়ালাম। স্যানা চটির একটু উপরেই একটা বাঁকের মুখে যমুনা দুটো পাহাড়ের মধ্য দিয়ে প্রচণ্ডবেগে হঠাৎ নেমে আসাতে ছোট একটা জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে। পাহাড়ের কোলে ঘন জঙ্গল। মনে হচ্ছে যেন তার ভিতর থেকে হঠাৎ এক ঝলক দেখা দিয়েই তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে যমুনা নিচে অবতরণ করছেন। মেঘহীন নির্মল আকাশে প্রখর সূর্য-কিরণ নদীর স্বচ্ছ জলের উপর প্রতিফলিত হয়ে ঝল্‌মল্‌ করছে। বড়-বড় পাথরের নুড়িগুলিতে ধাক্কা খেয়ে যমুনা চলচঞ্চল বেগে বয়ে চলেছেন। শশাঙ্কবাবু এ সুন্দর দৃশ্যের ফটো নিতে ভুললেন না।

হঠাৎ একটা হৈ হৈ শব্দ শুনে পিছনে চেয়ে দেখি অনেক যাত্রী গোল হয়ে এক জায়গায় জড় হয়েছে। আমরাও তাড়াতাড়ি সেখানে

গেলাম। বারকোটের মহকুমাধীশ যমুনোত্রী দেখে ফিরছেন। উনি যাত্রীদের সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়ে অধীনস্থ কর্মচারীদের উপদেশ দিচ্ছেন। কয়েকজন নিবেদন করলেন তাঁরা অনেকেই গতকাল থেকে গঙ্গোত্রীর বাসের জন্য অপেক্ষা করছেন। রাত্রে শীতে খুব কষ্ট পেয়েছেন। আজও এখনো পর্যন্ত বাসের দেখা নেই। মহকুমাধীশ অত্যন্ত কোমলভাবে সহানুভূতি জানিয়ে আশ্বাস দান করে যা বললেন তার মর্মার্থ—ধস্ নামাতে বাসের রাস্তা বন্ধ ছিল। কিন্তু উনি খবর পেয়েছেন রাস্তা পরিষ্কারের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। এবার কিছুক্ষণের মধ্যেই পর পর ১৫।১৬ খানা বাস আসতে শুরু করবে। জনতা শান্ত হয়ে সহিষ্ণুতার সঙ্গে তাঁর কথা মেনে নিল।

আমরা উদ্দেশ্যহীনভাবে ইতঃস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছি ও উদ্বেগের সঙ্গে বাসের অপেক্ষা করছি। পরিমল গেছে টিকিট ঘরের কাছে। বিকাল সওয়া-ছটা বেজেছে, এর পর বাস এলে আজ কি আর ফিরতি পথে রওনা হবে? এখানে রাত্রিবাস করতে হলে কোথায় আস্তানা গাড়ব ভাবছি। সূর্য ডুবে গেলেও দিনের আলো নেভেনি। হঠাৎ পুলের ওপারে বাঁকের মুখে একখানা বাস আসতে দেখা গেল। "গঙ্গা মাঈ কি জয়" ধ্বনিতে সমস্ত স্যানা চটি জেগে উঠল। সকলে তীরবেগে টিকিট ঘরের দিকে ছুটল। এরপর প্রায় আধ মিনিট পর পরই এক-এক করে বারখানা বাস এসে স্ট্যাণ্ড ও তার আশ-পাশ জুড়ে দাঁড়াল। চারিদিকে হট্টগোল ও তীব্র উত্তেজনা, যাত্রীরা ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করছে। কয়েক মিনিট পরেই পরিমল "পেয়েছি,-পেয়েছি, টিকিট পেয়েছি, বাসের নম্বর ৪৬৭১, এখুনি মালপত্র তুলুন" বলে ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়াল। প্রচণ্ড ভীড়ের গুঁতোগুঁতিতে ও বেচারার সার্টের একটা হাতা ছিঁড়ে গেছে। আমরা অবিলম্বে ৪৬৭১ নম্বর বাস খুঁজে বার করে মালপত্র তার ছাদে তুলে ফেলে যে যার সিটে বসে পড়লাম। পরিমল অসাধ্য-সাধন করেছে।

সকলেই প্রথম শ্রেণীর টিকিট পেয়েছি। আশা করিনি আজ রওনা হতে পারব।

দশ মিনিটের মধ্যে যাত্রীতে বাস ভরে গেল। দেহাতী ভাই-বহিনরা যে যার পোঁটলা-পুঁটলি সিটের নিচে বা পায়ের কাছে রেখেছেন, সবার মুখেই স্বস্তির ছাপ। ঠিক পৌনে সাতটায় "গঙ্গা মাঈ কি জয়" ধ্বনির মধ্য দিয়ে আমাদের বাস স্যানা চটি ছাড়ল। ড্রাইভার শিব সিং-এর পাশে আমার বসার জায়গা হয়েছে।

বাস এঁকে-বেঁকে অপ্রশস্ত বন্ধুর রাস্তার উপর দিয়ে ধীরে-ধীরে চলল। সারথি শিব সিং দক্ষ হাতে বাসের হাল ধরে রয়েছে। অল্প দূর গিয়েই অনেকটা নিচে দাঁড়িয়ে-থাকা যমুনা চটির ঘরবাড়ীগুলি ও তার পাশ দিয়ে বহমানা-যমুনা অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ল। মা যমুনাকে ভক্তিভরে প্রণাম জানালাম। যাত্রীদের একজন বললেন গাংনানি পর্যন্ত না গিয়ে আজ রাত্রে কুথনৌরে বিশ্রাম করলে ভাল হয়। শিব সিং এতে রাজি হল না। উত্তরকাশীর দিকে যতটা এগিয়ে যেতে পারব, আগামী কাল তত সকাল-সকাল সেখানে পৌছান সম্ভবপর হবে। গাংনানিতে কালিকমলিওয়ালা ধর্মশালা ও খাবার হোটেল আছে। সকলেই শিব সিং-এর কথা মেনে নিলাম।

অন্ধকার পথ। শুক্লা তৃতীয়ার একফালি চাঁদ অল্পক্ষণের জন্য পুবের আকাশে উঁকি দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে। হেডলাইট জ্বেলে আঁকাবাঁকা পথ ধরে বাস সাবধানে এগোচ্ছে। পরিমল ও গৌর মনের আনন্দে ওদের অমরনাথ যাত্রার কাহিনী শোনাচ্ছে। সেবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে মাঝপথে নাকি ওদের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। প্রস্তাব করল সামনের বছর আবার যাত্রা করবে আমাদের তিনবন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে। ছ'জনের দল বেশ ভালই হবে।

রাত্রি আটটার সময় বাস এসে গাংনানি পৌঁছল। তাড়াতাড়ি নেমে আমি ও গৌর ধর্মশালার সন্ধানে ছুটলাম। রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা নেমে আঁকাবাঁকা-পথে নদীর তীরে কালি কমলিওয়ালার ধর্মশালা। লম্বা ধরনের দোতলা বাড়ী। অত্যন্ত জরাজীর্ণ, কত কাল সংস্কার হয়নি কে জানে। চৌকিদার আমাদের দোতলায় নিয়ে গিয়ে একটা ঘর দখল করতে বলল। সারা বাড়ীটা যেন একটা নিস্তব্ধ প্রেতপুরী। টর্চ জ্বেলে আধ-ভাঙা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে দেখি সিঁড়ির দুধারে তিনখানা করে ঘর। তার জানলা ও দরজার কপাটও ভাঙা, ঘর ভর্তি ধুলো। মনটা দমে গেল। কি করব স্থির করতে না পেরে নিচে নেমে এসে বাসের দিকে চললাম। পথে পরিমলের সঙ্গে দেখা। ও আমাদের ডাকতে আসছিল। করিৎকর্মা পরিমল রাস্তার ধারে একখানা ঘর ঠিক করেছে। ভাড়া আজ রাতের জন্য চার টাকা। মালপত্র নিয়ে এতটা পথ নেমে ধর্মশালায় আশ্রয় নেওয়া ও রাত চারটার সময় আবার বাঁধা-ছাঁদা করে বাসের ছাদে মালপত্র তোলা বেশ কঠিন ব্যাপার। সুতরাং রাস্তার ধারের ঘরেই থাকা সুবিধা। আমরা চৌকিদারকে একথা বলে উপরে উঠে এলাম।

পরিমলের ঠিক-করা ঘরটি রাস্তার ধারে একটু উঁচু জায়গায়। রোহিত, লালুবাবু ও শশাঙ্কবাবু ততক্ষণে সকলের মালপত্র নিয়ে এসেছেন। চা দোকানের একটা ছোকরাও একাজে সাহায্য করছে। ওকে দিয়ে ভাল করে ঘরের ধুলো ঝাড়িয়ে নিলাম। নানা রকম কসরত করে জানলার পাটগুলো বন্ধ করা হল। জনতা প্রথায় পাতা হল ছ'জনের ঢালা-বিছানা।

পরিমল, রোহিত ও গৌর যে শুধু অত্যুৎসাহী তাই নয়, অত্যন্ত পরোপকারী ও কর্মঠ। আমরা তিনজন বয়ঃজ্যেষ্ঠ। আমাদের শারীরিক পরিশ্রম লাঘবের চেষ্টায় ওরা সব সময় যত্নশীল। চা ও খাবারের যোগাড়, রাত্রে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা—সব কিছুতেই ওরা

যুবোচিত উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এসেছে। হিমালয় ভ্রমণে ওদের মতো সাথী পাওয়া সত্যই দুর্লভ ভাগ্যের ব্যাপার।

দোতলায় কাঠের মেঝের উপর বিছানা পাতা হল। দেওয়াল-ঘেঁষা একখানা তক্তার আধখানা ভেঙে গেছে। বেশী চাপ পড়লে পুরোপুরি ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা। আমাদের মধ্যে গৌরই সবচেয়ে ক্ষীণতনু, ওকেই ধারে দেওয়া হল। তার পাশে পরিমল। গৌর বলল, রাতে যদি তক্তা ভাঙে তবে ও পরিমলকে জড়িয়ে ধরে ওকে নিয়ে নিচে পড়বে নয়তো ভারী হাতে পরিমল ওকে পাশে টেনে নেবে। সকলে হেসে উঠলাম।

রাত্রি নটা বেজেছে। রাস্তার অন্য পারে খাবারের দোকান। রুটি ও তরকারী ফরমাশ দেওয়া হয়েছে। জায়গা অকুলান বলে তিনজন করে খেতে গেলাম। ছোট দোকান, সেই হরেকরকম বন্দোবস্ত। সকাল-বিকালে চা-ভুজিয়া, দুপুর ও রাত্রে ভাত-রুটি। দোকানী গরম-গরম সেঁকা রুটি পরিবেশন করল। সঙ্গে মটরডাল, কাঁচা পেঁয়াজের কুচি ও চাটনি। বসেছি এক ধারে, পাতলা চটের পর্দাটা ছিঁড়ে গিয়ে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। নিচে অল্প দূর দিয়ে যমুনা বয়ে চলেছেন। ওপারে পাহাড়, তার ঢালে ছোট-ছোট কুটির নিয়ে একটা গ্রাম। মিটি-মিটি আলো জ্বলছে। শুনলাম অদূর ভবিষ্যতে এখানে 'রজন' তৈরীর কারখানা হবে। গাংনানী ও তার চারপাশে অনেক চীর গাছ। তার গা থেকে চুঁয়ে-পড়া রস সংগ্রহ করে রজন তৈরী হয়। নিচের রাস্তা দিয়ে বিদ্যুৎবাতি গেছে। কারখানার-প্রস্তুতি-পর্ব চলছে বোঝা গেল।

খাওয়া শেষ করে এসে শুয়ে পড়লাম। রাত্রি সাড়ে-দশটা। কাল ভোর চারটায় বাস ছাড়বে।

বেশ রাত থাকতেই লালুবাবু যথারীতি সকলকে ডেকে তুললেন। তৈরী হয়ে মালপত্র নিয়ে আমরা বাসে গিয়ে বসলাম।

চারটে বাজতে তখন কুড়ি মিনিট বাকী। কনডাকটার খুব ঘন-ঘন হর্ন বাজাচ্ছে যাত্রীদের উদ্দেশ্যে। দেহাতী ভাই-বহিনরা আগেই এসে যে-যার জায়গা দখল করে বসেছেন। গৌর মাটির গেলাসে করে আমাদের সবার জন্য গরম চা নিয়ে এল। পরিমল সরবরাহ করল জনপ্রতি দুখানা করে বিস্কুট। বলল, এটা বেড-টি, তবে বেডে না দিয়ে বাসে পরিবেশন করা হল।

যাত্রীরা সকলে এসে গেছে। কনডাকটার ঘণ্টা বাজাতেই ড্রাইভার শিব সিং এঞ্জিন চালু করল। সব ঠিক আছে শুনে বাস ছাড়ল। যাত্রী কণ্ঠের "গঙ্গা মাঈ কি জয়" ধ্বনি ঘুমন্ত গাংনানিকে জাগরিত করে তুলল। বাস চলল উত্তরকাশীর পথে। ঘড়িতে তখন ঠিক চারটে।

ঘন অন্ধকার পথের মধ্য দিয়ে নির্জন রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বাস চলেছে। হেড লাইটের তীব্র আলোতে পথ দেখতে পাচ্ছি। দুধারে ঘন জঙ্গল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। বাইরে বেশ কন্‌কনে শীত। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা থেকে রক্ষা পেতে সব জানলা বন্ধ করা হয়েছে। সামনে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে সর্বাঙ্গ গরম জামা কাপড়ে মুড়ে ও বাঁদর টুপি মাথায় দিয়ে আত্মরক্ষা করছি। সহযাত্রীরা অনেকেই ঘুমে ঢুলছেন, কেউ বা ঘুমিয়েই পড়েছেন। গঙ্গোত্রীর পথে সফল-যাত্রার-শুরুতে সকলেই নিশ্চিন্ত।

অনেকের মতো আমিও সিটের উপর কাত হয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। শিব সিং ডেকে বলল, মহারাজ, সামনে চেয়ে দেখুন, কি সুন্দর দৃশ্য। ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

নিশা-অবসানে ভোরের আলো ফুটে উঠছে। পুবের আকাশ সূর্যের অগ্রদূত অরুণের ছটায় উদ্ভাসিত। ডান দিকে পাহাড়। বাঁদিকে অনেক নিচে এক সুন্দর উপত্যকা। তার ঘর, বাড়ী, নদী খুব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কখনও বা ঝাঁকে-ঝাঁকে মেঘ এসে পাহাড়ের গা দিয়ে ভেসে যাচ্ছে, তখন সেগুলি দৃষ্টি পথের বাইরে চলে যাচ্ছে। মেঘ উড়ে গেলে আবার দৃশ্যমান হচ্ছে সেই মনোরম উপত্যকা। কোথা দিয়ে যাচ্ছি জিজ্ঞাসা করাতে শিব সিং বলল, আমরা অনেকক্ষণ আগে বারকোট, সিলকিয়ারী ও ধরাসু পার হয়ে এসেছি, এবার আসবে ব্রহ্মখাল। এখানে পনের মিনিট জলযোগের বিরতি।

সঙ্গীদের মধ্যে লালুবাবু ও শশাঙ্কবাবু উঠে বসেছেন। বাকী চারজন আপন-আপন সিটে সুখ নিদ্রায় বিভোর। পরিমল যথারীতি নাসিকা গর্জন করে চলেছে।

আঁকাবাঁকা পাহাড়ী রাস্তার চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে আমাদের বাস এগিয়ে চলেছে। একটানা চড়াই-এর পর অনেকটা উৎরাই পথে চলেছে। সমুদ্রতীর থেকে উচ্চতা ৮০০০ ফুট থেকে নামতে নামতে ৫০০০ ফুটে পৌঁচেছে। ঠাণ্ডা হাওয়ার দাপটও কম লাগছে। একসময় পথে বসান মাইল-স্টোন পড়ে বুঝলাম ব্রহ্মখাল থেকে মাত্র দু-মাইল দূরে আছি। শিব সিংও সে কথা ঘোষণা করে বলল, ব্রহ্মখালে বাস থামবে পনের মিনিট—চা ও নাস্তা সেরে নেবার জন্য।

মিনিট দশেক পরেই বাস এসে ব্রহ্মখালে দাঁড়াল। বেশ জমজমাট বসতি। রাস্তার দু-ধারে চা, খাবার ও মনি-হারি দোকান। আমাদের আগে আরও চারখানা বাস এসে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের যাত্রীরা নেমে চায়ের দোকান ভর্তি করেছেন। আমরা নেমে একটাতে গিয়ে বসলাম। দোকানী গরম-গরম পকোড়া ভাজছে। অন্য দুটো থালা-ভর্তি সদ্য-ভাজা জিলিপি। পরিমল আমাদের সবার জন্য গরম পকোড়া, জিলিপি ও চায়ের ফরমাশ দিয়ে এল।

বাসের দেহাতী ভাই-বহিনরা লোটা ও দাঁতন নিয়ে বাঁ-ধারে রাস্তা থেকে নামা ঢালের দিকে চলে গেলেন ভোরের কাজ সারতে।

এখানে পুলিশ চেকপোস্ট ও গেট আছে। সব বাস এখানে থামে। পুলিশের কাছ থেকে ছাড়পত্র পেলে তবে এগোতে পারে।

আমাদের বাস থেমেছে পুলিশ চৌকির সামনে। ড্রাইভার ও কন্ডাকটার খাতাপত্র নিয়ে সেখানে গেছে ছাড়পত্র আনতে।

একটু পরেই বাসের ঘন-ঘন হর্নের শব্দে সচকিত হয়ে উঠে পড়লাম। এখনই বাস ছাড়াবে। ইতিমধ্যে আমাদের বাসের পিছনে আরও দু-খানা বাস এসে দাঁড়িয়েছে। বাস স্ট্যাণ্ড যাত্রী-মুখরিত, চল-চল ব্যস্ততা। এমন সময় দেহাতী যাত্রীদের মুখীয়াজী এসে হাতজোড়

করে ড্রাইভার সাহেবকে নিবেদন করলেন একটু অপেক্ষা করতে। ওঁর সাথীরা সকলে এসে পৌঁছয়নি। তিনি হাঁক-ডাক-করে ওদের ধরে আনতে গেলেন। ড্রাইভার অবশ্য বলল, ভয় নেই কাউকে ফেলে বাস যাবে না। তবে যত দেরী হবে, উত্তরকাশী পৌঁছতে তত সময় লাগবে। চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওঁরা এসে হাজির হলেন ছুটতে-ছুটতে। কেউ কেউ বা মুক্ত-কচ্ছ অবস্থায়।

"গঙ্গা মাঈ কি জয়" যাত্রীদের সমস্বরে ধ্বনির মধ্যে বাস ছাড়ল। এখান থেকে সোজা উত্তর কাশী। পথে আর কোথাও থামবে না।

এখন আমাদের বাস চলেছে ভাগীরথীর অববাহিকা ধরে সর্পিল-পথ ঘুরে-ঘুরে। রাত্রে সম্ভবতঃ বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, তাই মাঝে-মাঝে ধস্ নামছে। পাহাড়ী শ্রমিকরা অনবরত বেলচা আর Fork-এর সাহায্যে ঝুরোমাটি ও পাথরের টুকরোগুলি সরিয়ে খাদের ধারে ফেলে দিয়ে পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছে। কোথাও বা অল্পক্ষণের জন্য বাসকে থামতে হচ্ছে ধস্ পরিষ্কারের জন্য। কোথাও পথ এত সঙ্কীর্ণ যে বাসের পিছনের চাকা চলেছে কিনারা থেকে চার-ছ ইঞ্চি মাত্র দূর দিয়ে। ডান দিকে অতল খাদ। তার নিচ দিয়ে বয়ে চলেছেন খরস্রোতা ভাগীরথী। পাথর-ঢালা-রাস্তার উপর দিয়ে যেতে-যেতে বাস কখনো এদিক-ওদিকে হেলে পড়ছে। আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে দৃঢ়হাতে বাসের হাল ধরে আছে সারথি শিব সিং। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অর্জুনের সারথির চেয়ে তার দায়িত্ব কিছু কম নয়। একটু বেসামাল হলে একেবারে নদীগর্ভে গিয়ে পড়ব। সামনের সিটে আমরা গভীর উৎকণ্ঠায় বসে আছি। জনতা শ্রেণীর যাত্রীরা নিরুদ্বেগে গঙ্গামায়ীর স্তোত্র পাঠ করছেন। জানলা বন্ধ থাকায় ওঁরা এই বিপদ-সঙ্কুল-পথের কিছুমাত্র দেখতে পাচ্ছেন না।

লালুবাবু বললেন এর চেয়ে হাঁটা-পথের যুগ ছিল ভাল। যাত্রীরা খেয়াল খুশি মতো ধীরে সুস্থে যেতেন। বাস উল্‌টে সলিল-সমাধির আশঙ্কা ছিল না।

আমরা উত্তরকাশীর দিকে এগিয়ে চলেছি। পাহাড়ের গা কেটে আঁকা-বাঁকা ও চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এবার এসে পড়লাম একটা নালার মুখে। সামনে দেখি পাহাড়ের গা-বেয়ে-নামা একটা বড় ঝরনার জল তীব্রবেগে এসে নালা দিয়ে বয়ে ভাগীরথীর বুকে আছড়ে পড়ছে। নালার উপর বাস-চলার সেতু। সেতু পার হয়েই একটা তীক্ষ্ণ বাঁকের মুখে এসে বাস থেমে গেল। সামনে বিরাট ধস্ নেমে পথ বন্ধ। ও ধারের কিছুই দেখা যাচ্ছে না, পাহাড়ের উপর থেকে বিরাট স্রোতে জল নামছে। কখন এত বৃষ্টি হল কে জানে।

ড্রাইভার শিব সিং খুব চিন্তিত হয়ে নেমে পড়ল। কন্‌ডাকটার ছুটল ধসের ওপারে কি আছে দেখতে, এসে বলল সাত-আটজন নেপালী কুলি ওধার থেকে ধস্ পরিষ্কার করতে শুরু করেছে। আধঘণ্টা তো নিশ্চয় লাগবে পথ চালু হতে। আমরা ক'জন বাস থেকে নেমে এসে রাস্তায় দাঁড়ালাম।

উপরে পাহাড়ের গা বেয়ে অবিশ্রান্ত ধারায় জল নামছে। সেই সঙ্গে বয়ে আসছে ঝুরো চুন রং-এর নরম কাঁকর ও মাটি। নিচে গর্জন করতে-করতে চলেছেন প্রমত্তা ভাগীরথী। কি রুদ্র সুন্দর রূপ। কিন্তু যাত্রার পথে আমরা রুদ্রের শান্ত সুন্দর রূপটুকুই দেখতে চাই, ভয়ঙ্করকে নয়। প্রণতি জানিয়ে প্রার্থনা করলাম "রুদ্র! যত্তে দক্ষিণং মুখম্, তেন মাং পাহি নিত্যম্"। নিচের দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মাথা ঘোরে। উপর থেকে কয়েকটা বড় পাথর তীরবেগে খাদ পেরিয়ে নদীতে পড়ে প্রচণ্ড স্রোতে বেশ কিছুদূর গড়িয়ে গিয়ে থামতে দেখলাম।

"রাস্তা বন্ গিয়া, রাস্তা বন্ গিয়া" বলে কন্‌ডাকটার চেঁচিয়ে উঠল। আমরা বাসে গিয়ে বসলাম। নেপালী কুলিরা ধস্ খাদে ফেলে দিয়ে পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে। অদ্ভুত এদের কর্ম-ক্ষমতা।

সগর্জনে বাস এগিয়ে চলল। অত্যন্ত সাবধানে ও ধীরে শিব সিং চালাচ্ছে। ধসের এলাকা পার না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস নেই। আবার

ধসলেই হল। বাসের উপর বড় ধস্ পড়লে হয়ত সবসুদ্ধ সমাধি-প্রাপ্ত হব।

শিব সিং আমাদের নিরাপদেই ধস্ এলাকা পার করে নিয়ে এল। সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লাম।

এগিয়ে চলেছি উত্তরকাশীর পথে। বিশাল পর্বতশ্রেণী ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। তারা এখন চারিদিকে ছড়ান। বিস্তৃত উপত্যকার মধ্য দিয়ে বাসের রাস্তা। ডান হাতে একটু দূরে সর্পিল-গতিতে বহমানা ভাগীরথী। শস্যশ্যামলা এই উপত্যকা ঘিরে সবুজ গাছপালায়-ভরা পাহাড়। যতদূর চোখ যায় সবুজ খেত। তার শেষে গৈরিকবরণা প্রমত্তা ভাগীরথী। পাহাড়ের ঢালে ও নদীর ও পারে ইতস্তত বাড়ীগুলি এক গ্রাম্য পরিবেশের সাক্ষ্য দিচ্ছে। এতক্ষণ ধরে পাহাড়ী-পথে কেবল চড়াই-উৎরাই পরিক্রমা করেছে আমাদের বাস। এবার চলেছে প্রশস্ত উপত্যকার শ্যামল তৃণভূমির মধ্য দিয়ে। নীলআকাশের মাঝে ভেসে চলেছে টুকরো-টুকরো মেঘ। তার ফাঁক দিয়ে সূর্যদেব তাঁর রক্তরশ্মি বিকিরণ করছেন। সব মিলিয়ে এক চোখ-জুড়ান দৃশ্য।

এরকম পটভূমির মধ্য দিয়ে চলতে-চলতে বাস উত্তরকাশীর উপকণ্ঠে এসে পড়ল। সকলের সঙ্গে ড্রাইভার শিব সিংও "গঙ্গা মাঈ কি জয়" ধ্বনি দিয়ে আমাদের বাস শহরের কেন্দ্রস্থল বাস-স্ট্যাণ্ডে এনে দাঁড় করাল।

আমরা তাড়াতাড়ি নেমে পূর্বব্যবস্থামতো কন্‌ডাকটারকে নিয়ে নিকটবর্তী পুলিশ চৌকিতে গিয়ে Inner Line Permit* এর আবেদন-পত্র জমা দিয়ে বেরিয়ে এলাম। এই অনুমতি-পত্র ছাড়া উত্তরকাশীর আগে যাতায়াত সামরিক গুরুত্ব-পূর্ণ কারণে নিষিদ্ধ।

বিদেশীদের অবশ্য এ অনুমতিপত্র দেওয়া হয় না। যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী এলাকায় প্রবেশ ওঁদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ভারতীয়দের অবশ্য যমুনোত্রী এলাকায় প্রবেশে কোন বাধা নেই।

এদিকে বাস ডিপোতে এসে দেখি বিরাট হৈ-চৈ পড়ে গেছে। চারিদিক থেকে প্রচুর বাস এসে জড় হয়েছে এলোমেলোভাবে। যাত্রীরা ইতস্তত ছুটোছুটি করছে। সব মিলিয়ে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। পরিমল বলল কোন গোলমাল ঘটেছে মনে হচ্ছে। খোঁজ নিতে ও চলে গেল ডিপোর অফিসের দিকে।

একটু পরেই পরিমল ছুটতে-ছুটতে এসে যা খবর দিল তাতে তো চক্ষুস্থির। বাসওয়ালাদের সঙ্গে সরকারী কর্তৃপক্ষের বাদানুবাদের ফলে সমস্ত বাস ড্রাইভাররা ধর্মঘট করেছে। সন্তোষজনক মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত একটা যাত্রী-বাসও উত্তরকাশী থেকে নড়বে না। আজ তো নয়ই, আগামীকাল বিকালের আগে মিট্‌মাটের সম্ভাবনা নেই। অতএব আজ ও কাল এখানেই থাকতে হবে। অন্য সকলে চিন্তিত হলেও আমরা খুশীই হলাম। এই সময়ের মধ্যে উত্তরকাশীর যতটা পারি দেখে নেব।

কিন্তু একটা আস্তানা তো চাই। আমি ও পরিমল বেরিয়ে পড়লাম।

বাস ডিপোর কাছেই বড় রাস্তার উপর বিরলা ধর্মশালা। বেশ বড় দোতলা বাড়ি। সেখানে আমাদের ছ-জনের থাকবার মতো দোতলায় একখানা ঘর পেলাম। ঘরটা বেশ বড় ও সবদিক দিয়েই পছন্দসই। আমাকে রেখে পরিমল চলে গেল মালপত্র ও দলের অন্য সকলকে নিয়ে আসতে। ওরাও এসে ঘর দেখে খুব খুশি। মালপত্র রেখে স্নান সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

উত্তরকাশী। ভাগীরথীর পুণ্য সলিলে স্নাতা, যুগ-যুগ ধরে শতসহস্র মুনি-ঋষি, সাধু-সন্তদের ধ্যানের-ধন এই উত্তরকাশী। এর

পবিত্র মাটির প্রতি ধূলিকণায় মিশে আছে তাঁদের জীবনের কাহিনী। এর আকাশ-বাতাস মুখরিত তাঁদের স্তব-গানে।

বরুণা ও অসি নদীর মিলিত ধারা এসে ভাগীরথীতে পড়েছে এখানে। তুষার-শুভ্র হিমালয়-গিরিশৃঙ্গের মাঝখানে খানিকটা সমতল ভূমিতে অতি মনোরম-পরিবেশে গড়ে উঠেছে উত্তরাখণ্ডের এই প্রসিদ্ধ জনপদ। সেকালে উত্তরকাশী ছিল কেবল সাধু-সন্তদের বাসস্থান। ভাগীরথীর দু-কূলে গড়ে উঠেছিল দেবালয়, সাধুদের অন্ন-সত্র ও পুণ্য লোভাতুর তীর্থযাত্রী ও হিমালয় পরিব্রাজকদের চলার-পথে বিশ্রামের জন্য কালীকম্‌লিওয়ালা, বিরলা ও অন্যান্য ধর্মশালাগুলি। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মা আনন্দময়ীর আশ্রম, শঙ্কর মঠ প্রভৃতি দেবস্থান।

ভাগীরথীর তীরে এখানকার রাজঘাট, মণিকর্ণিকাঘাট, কেদার-ঘাট প্রভৃতি ঘাটগুলি স্বভাবতঃই বারাণসীর কথা মনে করিয়ে দেয়। ভারতের সমতলখণ্ডে যেমন বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার নামধন্য বারাণসী, উত্তরাখণ্ডে তেমন উত্তরকাশী। এখানেও উপাস্য-দেবতা দেবাদিদেব শঙ্কর ও মা অন্নপূর্ণা। বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটে যেমন অগণিত-যাত্রী পুণ্যতোয়া জাহ্নবী স্নানে পবিত্র হন, উত্তরকাশীতে কলস্রোতা ভাগীরথীর তুহিন-শীতল-জলে স্নানেও সেই একই পুণ্য।

হিমালয় পথের পথিক! এখানে ভাগীরথীর কূলে দাঁড়িয়ে তার অশ্রান্ত কলধ্বনি শোন। ওপারে সুদূর-প্রসারী হিমবানের দিকে চেয়ে দেখ। উপলব্ধি কর তার তুষারশুভ্র মৌন-রূপ, যুগ-যুগ ধরে আপন মহিমায় যা মহিমময়। অপার আনন্দে সারা দেহ-মনের কালিমা ধুয়ে যাবে। আসবে নিষ্কলুষ প্রশান্তি। পরমতীর্থ-উত্তরকাশী।

প্রবাদ আছে ঘোর কলিযুগে সমতলের কাশী যত পাপের পঙ্কিলতায় ডুবে যাবে, তার মাহাত্ম্য তত নিষ্প্রভ হবে। উত্তরকাশীর মাহাত্ম্যও তত বৃদ্ধি পাবে।

আমরা শহরের প্রধান পথ ধরে চলেছি। দু-ধারে ছোট-বড় বিপণী। তা ছাড়া বাস, জীপ ও পথচারীর ভীড়—সব মিলিয়ে সর্বত্র কর্মব্যস্ততার চিহ্ন।

আমরা এগিয়ে চলি এখানকার মন্দিরগুলি দেখতে। কিছুটা গিয়ে প্রথমে পেলাম বিশ্বনাথের মন্দির। তোরণ পেরিয়ে প্রশস্ত আঙ্গিনা। তাতে কিছু যাত্রীর ভিড় পূজা দেবার জন্য। আঙ্গিনা পেরিয়ে মূল মন্দির। মন্দিরের ভাস্কর্যে বিশেষত্ব কিছু নেই, খুব পুরাকালের বলেও মনে হয় না। শুনলাম টিহরির রাজা নাকি এ মন্দির তৈরী করিয়েছিলেন। আগেই বলেছি কলিতে বিশ্বনাথ সমতলের কাশী ছেড়ে হিমালয়ের উত্তরকাশীতেই অধিষ্ঠিত হবেন। লালুবাবু বললেন নিজের আবাস হিমালয়ের কাছে বলে বোধহয় বাবা বিশ্বনাথের পক্ষপাতিত্ব উত্তরকাশীর উপর। তাই বারাণসী ছেড়ে এখানে অধিষ্ঠিত হবার এত ঝোঁক।

এর পরে অল্প দূরত্বের মধ্যেই পরশুরাম, অন্নপূর্ণা ও সোনার ত্রিশূলে শোভিত শিবমন্দির। শেষেরটি স্থাপন করেছিলেন জয়-পুরের মহারাজা। শিবমন্দিরের বাইরে সুন্দর, বাঁধান চওড়া আঙ্গিনা। তার দুধারে লম্বা বারান্দায় সারি-সারি অনেকগুলি ঘর—পূজারী ও মন্দিরের কর্মচারীদের বাসের জন্য। বারান্দা ও আঙ্গিনার মাঝের মাটিতে সুন্দর বাগান। তাতে নানা রং-এর ও নানা জাতের গোলাপ ফুলের বাহার। এ ছাড়াও আছে কিছু চাঁপা ও টগর ফুলের গাছ। সব মিলিয়ে দেখতে ভারী সুন্দর।

কয়েকটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে নাটমন্দিরে এলাম। পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত এই নাটমন্দিরের এক কোণে এক ভদ্রলোক গীতা পাঠ করছেন। মধ্যবয়সী গেরুয়াধারী। এঁর প্রতিভাদীপ্ত কান্তির এক অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে। তাই বোধহয় আমরা ওঁর কাছে গিয়ে বসলাম। প্রসন্নহাস্যে পরিষ্কার বাংলায় উনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কোথা থেকে এসেছি এবং যাব কোথায়? প্রণাম করে ওঁর কথার জবাব

দিলাম। বললেন "খুব ভাল, গোমুখ খুব সাবধানে যাবেন, পথে ভূজবাসাতে লালবিহারী বাবার কুটিয়াতে রাত্রে আশ্রয় নেবেন। ওঁর নিজের কথা জিজ্ঞাসা করাতে পরিচয় দিলেন। প্রবাসী বাঙালী, এলাহাবাদে জন্ম, পড়াশুনাও সেখানে। রসায়ন শাস্ত্রে এম. এসসি. পাস করে ওখানকার এক কলেজে ছ'বছর অধ্যাপনাও করেছিলেন। বিবাহের চার বছর পরে স্ত্রী বিয়োগ হয়। সেই থেকে আসক্তির বন্ধন কেটে যেতে থাকে। তার পর একদিন কিসের এক অনির্দেশ্য আকর্ষণে হরিদ্বারের পথে বেরিয়ে পড়েন। দু-বছর সেখানে কনখল পল্লীতে ছিলেন। তার পর উত্তরকাশী চলে আসেন আজ থেকে আট বছর আগে। সেই থেকে এখানেই স্থিতি। বছরে একবার হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিব্রাজক হয়ে ঘুরে বেড়ান। বাকী সময়টা উত্তরকাশীতে নিজের ছোট্ট কুটিয়াতে থাকেন। প্রায়দিনই সকালের দিকে মন্দিরে এসে গীতা পাঠ করেন। এভাবে মহেশ্বরের পায়ে নিজেকে সঁপে দিয়ে পরমানন্দে দিন অতিবাহিত করছেন। নাম জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, সন্ন্যাসী জীবনের নাম অচ্যুতানন্দ।

লালুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন উত্তরকাশী তো খুব উচ্চমার্গের সাধু-সন্তদের বাস স্থান, এঁরা কোথায় থাকেন। স্বামিজী উত্তরে বললেন, এঁরা প্রায় সকলেই থাকেন শহরের উপকণ্ঠে উজলী নামে এক বসতিতে। উনিও সেখানে একটি ছোট্ট কুটিয়া তৈরী করে বাস করছেন। লালুবাবু নাছোড়-বান্দা, জিজ্ঞাসা করলেন আমরা যদি কাল সকালে ওঁর কুটিয়াতে যাই তবে ওঁর কিছু অসুবিধা হবে কিনা। মিষ্টি হেসে অচ্যুতানন্দ বললেন, "মোটেই না, বরং খুবই খুশী হব। ওঁকে প্রণাম করে আমরা বেরিয়ে এলাম।

পৌরাণিক ঐতিহ্যের গৌরবপূর্ণ স্থান উত্তরকাশী। মহাভারতের প্রসিদ্ধ কিরাতার্জুন যুদ্ধ এখানেই সংঘটিত হয়েছিল।

চলতে-চলতে বাস ডিপোর কাছে এসে পড়েছি। পরিমল বলে উঠল একটা বাজে। এবার কোন হোটেলে ঢুকে খেয়ে নেওয়া যাক্।

চকের দুধারে আধুনিক কায়দায় সাজান কয়েকটি হোটেল। ওরই মধ্যে পরিচ্ছন্ন ও নিরিবিলি দেখে "কাশ্মীরী হোটেলে" ঢুকে পড়লাম। এখানে আমিষ-ভোজের ব্যবস্থা আছে। হরিদ্বার পৌঁছোনো থেকে নিরামিষ খাওয়া চলেছে। আমিষ দিয়ে মুখ বদলাবার জন্য সবাই ব্যগ্র। হোটেলওয়ালাকে অর্ডার দেওয়া হল ভাত ও মাংস, মাছ এখানে পাওয়া যাবে না।

সরু চালের সুগন্ধি ভাত, ধবধবে সাদা। তার সঙ্গে আলু-মটরের তরকারী ও এক প্লেট মাংস। টেবিলে প্লেটে রয়েছে টমাটোর 'সস' ও কাঁচা পেঁয়াজের কুচি। ইচ্ছামতো নিয়ে খাও। ভোজনটা বেশ ভালই হল। হোটেলের পাওনা মিটিয়ে ধর্মশালায় চলে এলাম।

একটু দিবানিদ্রা শেষ করে বেলা সাড়ে-তিনটে নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়লাম শহর দেখার উদ্দেশ্যে। পরিষ্কার আকাশ, রোদও কড়া।

চারিদিকে হিমালয়ের বিস্তৃত শাখাগুলির মাঝখানে 'ডুন' বা উপত্যকার উপর উত্তরকাশী। আয়তনে খুব বড় না হলেও সামরিক, প্রতিরক্ষা এবং অন্যান্য দিক দিয়ে এ শহর আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশে পাহাড়ের গায়ে বসান ছোটবড় ঘরবাড়ী। শহরের এক ধার দিয়ে ভাগীরথী প্রচণ্ড স্রোতে বয়ে চলেছেন। পৌরাণিক উত্তরকাশী ছাপিয়ে আজ গড়ে উঠেছে আধুনিক উত্তরকাশী। বেশ কর্মব্যস্ত শহর। সামরিক ও অসামরিক অসংখ্য বাস, ট্রাক, জীপ, ট্যাক্সি ও প্রাইভেট গাড়ী চলাচল করছে। কয়েকখানা মিনি বাসও দেখলাম। গঙ্গোত্রী যাবার পথে এটাই সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। আগেকার টিহ্‌রি জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করে উত্তরকাশী এখন পৃথক জেলায় পরিণত হয়েছে। জেলার সদর দফতরও এই শহরে। সেজন্য এখানে সরকারী আদালত, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, থানা, পূর্ত বিভাগের অফিস, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি সব কিছু নিয়ে রমরমা শহর।

শহরে বিরলা, বাজোরিয়া প্রভৃতি বড়-বড় শিল্পপতিরা ধর্মশালা ও মন্দির তৈরী করেছেন। এগুলি এবং দুর্গাবাড়ী, কালীবাড়ী, মা আনন্দময়ীর আশ্রম, শঙ্কর মঠ প্রভৃতি মন্দির ও জনহিতকর সংস্থা-গুলির তত্ত্বাবধানের জন্য 'অছি' বা 'ট্রাস্টি' আছে।

এগুলি ছাড়াও দুটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান দেখলাম। সংস্কৃত-মহাবিদ্যালয় ও জওহরলাল ইনস্টিট্যুট অব্ মাউন্টেনিয়ারিং।

প্রথমটি অর্থাৎ সংস্কৃত-মহাবিদ্যালয় মাত্র পাঁচটি বিদ্যার্থী নিয়ে বহু বছর পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল কয়েকজন সাধু ও সমাজসেবীর উদ্যোগে। আজ সেখানে ১৫০ থেকে ২০০ জন ছাত্র শিক্ষা পেয়ে থাকেন। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও ধর্মপথে অনুপ্রাণিত-করা এবং নানা কাজের মধ্য দিয়ে মানব কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করতে শেখানই এ প্রতিষ্ঠানের আদর্শ। সারা পৃথিবীতে আজ আমরা স্বার্থান্ধ, পরের কল্যাণ সম্বন্ধে প্রায় উদাসীন বললেও অত্যুক্তি হয় না। অতীত গৌরবের কথা অবজ্ঞার সঙ্গে আলোচনা করে আমরা গর্ব অনুভব করি। সংস্কৃত-মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শ আজ যদি স্বল্প-সংখ্যক ছাত্রেরও জীবনের আদর্শকে পরিবর্তিত করে তাদের 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' নিয়োজিত করতে পারে, তবে সেখানেই তার সার্থকতা।

দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ জওহরলাল ইনস্টিট্যুট অব্ মাউনটেনি-য়ারিং দেশের তরুণ, তরুণীদের পর্বতারোহণ-শিক্ষা দিয়ে খুবই প্রশংসনীয় কাজ করছে। বিশাল হিমালয়। তার নানা দিকে ঘুরে বেড়াবার অপার আনন্দ। উপযুক্ত শিক্ষা না থাকলে অভিযাত্রীর ভূমিকা নেওয়া প্রায় অসম্ভব। প্রতি বছরই নানা সংস্থার দলগুলি এর ভিন্ন ভিন্ন গিরিশৃঙ্গ জয়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। পর্বতারোহণের উপযুক্ত শিক্ষা থাকলে জয়ের পথ অনেক সুগম ও সহজ হয়। এ সব ছাড়াও এ ধরনের শিক্ষা ওদের শরীর ও মনকে সুস্থ রাখে। ওদের জয়ের গৌরবে দেশেরও গৌরব বাড়ে।

শশাঙ্কবাবু বললেন, আমাদের দেশে পর্বতারোহণের প্রথম শিক্ষা-কেন্দ্র দার্জিলিং-এর "হিমালয়ান মাউনটেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট" মুখ্যত স্বর্গীয় জওহরলাল নেহরু এবং ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ঐকান্তিক চেষ্টাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অত্যন্ত কর্মব্যস্ত রাজনৈতিক জীবন ও প্রশাসনিক গুরুদায়িত্বের মধ্যে থেকেও দেশের এই দুই বরণীয় সন্তান হিমালয়ের নিবিড় আকর্ষনে মধ্যে মধ্যে এর নিভৃতে আশ্রয় নিয়েছেন, একান্তে এর নৈসর্গিক শোভা উপভোগ করেছেন।

গল্প করতে-করতে চলেছি। একজন পথচারীকে জিজ্ঞাসা করলাম এখানে মা আনন্দময়ীর প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ী কোথায়। তিনি আমাদের সঙ্গে করে সেখানে পৌঁছে দিলেন। পরিমল বলল, এতো দেখি একটা বসতবাড়ীর মতো দেখতে, মন্দির কোথায়? লালুবাবু বললেন সব মন্দিরেই কি চূড়া থাকে নাকি? পশ্চিম-ভারতের বেট্ দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর রানী সত্যভামা, রুক্মিণী ও জাম্ববতীর মন্দিরগুলি ওখা বন্দর ও নৌকায় যেতে সমুদ্রের মাঝখান থেকে সাধারণ দোতলা বাড়ীর মতো দেখায়। শশাঙ্কবাবু বললেন, মুসলমান বাদশাদের ধ্বংস-লীলার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সেকালে এ ব্যবস্থা নেওয়া হত।

একই কারণে সোমনাথে রানী অহল্যাবাঈ প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির নির্মিত হয়েছিল এক জনবহুল পল্লীর অভ্যন্তরে সাধারণ বাড়ীর মতো। তাই সে মন্দির ও তার নিচের গর্ভ গৃহে শিব-লিঙ্গ আজও অক্ষত আছে। দেশ স্বাধীন হবার পরে বিরাট আকার ও অপূর্ব প্রাচ্য-স্থাপত্য-কলা নিয়ে আরব সাগরের বেলাভূমির উপর তৈরী হয়েছে নূতন সোমনাথের মন্দির। মূল সোমনাথের মন্দির ধূলিসাৎ করা জমির উপরই গড়ে তোলা হয়েছে এই মন্দির, এবং একাজে নিয়োগ করা হয়েছিল মুসলমান কারিগর। আরব সাগরের উপকূলে এই অপূর্ব দেবালয়নির্মাণে স্বর্গত বল্লভ ভাই প্যাটেলের ছিল অসামান্য অবদান।

আমরা সামনের প্রশস্ত অঙ্গন ও বাগান পেরিয়ে মূল বাড়ীতে এলাম। বেশ বড় বারান্দা, তার ধারে তিন-চারখানা ঘর। তারই একখানা ঠাকুরঘরে বিগ্রহ কালীমাতা। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে মা আনন্দময়ী তাঁর ভক্তদের সহায়তায় এ কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা করেন। মূলতঃ তাই এটি বাঙালীর প্রতিষ্ঠান।

পাশেই শঙ্কর মঠ। কালীবাড়ী দেখে আমরা সেখানে গেলাম। এখানে স্বামী শুদ্ধদেবের সঙ্গে আলাপ হল। বহুকাল ধরে স্বামিজী এ মঠে আছেন। বয়স এখন সত্তর বৎসর। হিমালয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে বহুকাল ধরে ঘুরে যোগীশ্রেষ্ঠ ও ব্রহ্মর্ষিদের সংস্পর্শে এসেছেন। নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন, প্রচুর পড়াশুনা করেন মনে হল।

আমাদের হাতে সময় বেশী ছিল না। সূর্য অস্ত গিয়ে আঁধার নেমে আসছে। স্বামিজীরও সন্ধ্যা আহ্নিক করবার সময় হল। ওঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করে আমরা বেরিয়ে এলাম।

উত্তরকাশী শহর তখন রাস্তা ও ঘর-বাড়ীর বৈদ্যুতিক আলোতে ঝলমল করছে। দূরে পাহাড়ের উপর কালেকটার সাহেবের বাংলোতে ও শহর থেকে সেখানে যাবার রাস্তায় আলোগুলি দীপান্বিতার আলোর মতো দেখাচ্ছে। আমরা ধীরে-ধীরে এসে রাজঘাটের সিঁড়িতে বসলাম। এটি কালীকম্‌লিওয়ালার ধর্মশালার স্নানের ঘাট। ধর্মশালা থেকেই পাকা বাঁধান সিঁড়ি নেমে এসেছে ভাগীরথীর জল অবধি।

সামনে দিয়ে কলস্রোতা ভাগীরথী বয়ে চলেছেন। সবে সন্ধ্যা নেমেছে। বহু লোক ঘাটে সমবেত। কেউ বা পুণ্যলোভাতুর তীর্থযাত্রী, কেউ পর্যটক, কেউ বা অভিযাত্রী। আপন ভাবে সবাই বিভোর।

নদীর ঘাটে এই পবিত্র পরিবেশে প্রায় একঘণ্টা বসে থেকে আমরা ফিরে চললাম রাতের আশ্রম বিরলা ধর্মশালার দিকে। রাত্রি

তখন আটটা বেজে গিয়েছে। দুপুরের সেই "কাশ্মীরী হোটেলে" খেয়ে ফিরে এলাম।

বিরলা ধর্মশালা তখন যাত্রীতে গমগমে্। আমরা যে যার বিছানায় এসে শুয়ে পড়ি।

ঠাণ্ডা বেশী নেই। একখানা কম্বল ও মোটা চাদরেই হয়ে যাবে। শশাঙ্কবাবু একটু শীতকাতুরে। উনি একখানা বাড়তি কম্বল এনেছেন। ইতিমধ্যে পরিমল ও রোহিত সারাদিনের খরচের হিসেব করে কার কত দিতে হবে বলে দিল। পরিমল একাধারে আমাদের হিসাবরক্ষক ও খাজাঞ্চি। যে যার পাওনা মিটিয়ে দিলাম।

স্থির হল কাল ভোরে উঠেই উজলীর দিকে বেরিয়ে পড়ব। সাধু-সন্তদের পল্লী দেখে বেলা এগারটার মধ্যেই ফিরে আসতে হবে। শিব শিং নাকি জানিয়েছে কাল বেলা বারটা নাগাদ বাস ধর্মঘট মিটে যাবার সম্ভাবনা। তার পরই বাস ছাড়বে।

'গঙ্গা মাঈ কি জয়' বলে দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম।

ব্রাহ্মমুহূর্তে লালুবাবুর ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলে দৃষ্টি প্রসারিত করে ভাগীরথীকে প্রণাম জানালাম। মুখ হাত ধুয়ে এসে বিছানা বেঁধে ও অন্য জিনিষপত্র গুছিয়ে একেবারে তৈরী করে রাখলাম। যাতে ফিরে এসে আর সময় নষ্ট না করতে হয়। ধর্ম-শালার মুসাফিররা ততক্ষণে অনেকেই জেগে উঠেছেন।

ঠিক সাড়ে-ছ'টার সময় আমরা বেরিয়ে পড়লাম উজলীর দিকে। ধর্মশালার গায়ে একটা দোকানে চা-পান করে ও দু'খানা করে বিস্কুট খেয়ে আপততঃ জলযোগের পর্ব সারা হল।

উত্তরকাশী শহরের বাইরে বাসস্ট্যাণ্ড থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে পৌর শাসন এলাকা ছাড়িয়ে গঙ্গার ধারে শান্ত, নির্জন পরিবেশে গড়ে উঠেছে সাধু-সন্তদের এই বিস্তৃত উপনিবেশ। পাহাড়ের গায়ে

বা তার কোলে সাধারণভাবে তৈরী কুটিরের মতো দেখতে সাধুদের কুটিয়াগুলি। আমরা অনেক খুঁজে গতকাল বিশ্বনাথের মন্দিরের প্রাঙ্গণে দেখা অচ্যুতানন্দের কুটিয়াটি আবিষ্কার করলাম। অত্যন্ত সাধারণভাবে নির্মিত ছোট একতলা বাড়ী। অতি পরিচ্ছন্ন ও প্রায় আসবাবহীন একটি ঘর। শুধু একখানা খাট ও সাধারণ শয্যা। দুটি আলমারি ভর্তি বই। দু-কোণে রাখা দুটি ধূপদানি থেকে চন্দনধূপের গন্ধে সারা ঘর সুরভিত। অচ্যুতানন্দজী স্নিগ্ধ হাসি দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। ওঁকে প্রণাম করে মেঝেতে পাতা সতরঞ্চিতে বসলাম।

এখানকার সাধুদের প্রসঙ্গে উনি প্রথমেই বললেন স্বামী অখণ্ডা-নন্দর কথা। উত্তরকাশী শহরের আধুনিকীকরণে অপূর্ব সংগঠন-শক্তির অধিকারী এই নিরলস কর্মযোগী সন্ন্যাসীর অবদান অসামান্য। এঁর বাংলার শরীর। গ্লাসগো থেকে এন্‌জিনিয়ারিং পাস করে করে এসে ইনি বাঙ্গালোরে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। প্রায় বার বছর আগে সব কিছু ছেড়ে আত্মীয় বন্ধুদের অজ্ঞাতে হঠাৎ একদিন এখানে চলে আসেন। তার পর থেকে শুরু হয় একাধারে ওঁর সাধক ও সমাজসংস্কারকের জীবন। উত্তরকাশী পৌর-প্রশাসন-সংস্থা-স্থাপনে উনি প্রধান উদ্যোক্তা এবং বহুদিন উনি ছিলেন এর কর্ম-সমিতির সভ্য। সংস্কৃতমহাবিদ্যালয় মুখ্যত ওঁরই সংগঠন ক্ষমতাতে গড়ে উঠেছে। স্বামিজীর অদ্ভুত কর্মক্ষমতা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, ও অতি মধুর ব্যবহারের জন্য সকলেই ওঁকে গভীর শ্রদ্ধা করে। উত্তরকাশীর প্রতিটি জনহিতকর কার্যে ওঁর সক্রিয় সাহায্য বা সদুপদেশ অপরিহার্য। ওঁর বর্তমান বয়স মাত্র চুয়াল্লিশ বৎসর। উনি উত্তর-কাশীর বিবেকানন্দ নামে খ্যাত।

স্বামিজী যে কুটিয়াতে থাকেন তা অর্জুনদাস বাবার কুটিয়া নামে পরিচিত। তিনি ঐ কুটিয়া তৈরী করেছিলেন।

এ কুটিয়াটি দুর্গাবাড়ীর কাছে অবস্থিত।

মনে পড়ল রুদ্র প্রয়াগের আধুনিকীকরণে সেখানকার অন্ধ ও নিরক্ষর সন্ন্যাসী সচ্চিদানন্দের অবদানের কথা।

অচ্যুতানন্দজি বললেন উত্তরকাশীতে প্রায় ১২৫-১৫০ জন সাধু আছেন। এঁদের মধ্যে অনেকে 'ভাণ্ডারা' অর্থাৎ বিভিন্ন ট্রাস্টের অন্ন-সত্র থেকে খাবার পেয়ে থাকেন, অন্যরা নিজ নিজ কুটিয়াতে বন্দোবস্ত রাখেন। ভাণ্ডারা থেকে রুটি ও ডাল পরিবেশন করা হয়।

'উজলী'তে দু-একটি আধুনিক ধরনের পাকা বাড়ীও আছে। একটি হল স্বামী চিন্ময়ানন্দর। ওঁর দোতলা বাড়ীকে 'কুটিয়া' না বলে আশ্রম বলা চলে। সর্বশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত চিন্ময়ানন্দজীর খ্যাতি সারা ভারতে বিস্তৃত। নানা শহর পরিক্রমা করে উনি সহজ সরল ভাষায় গীতার কঠিন শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করেন।

লালুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, এখন উত্তরকাশীতে সর্বাপেক্ষা প্রধান সাধু কে আছেন। অচ্যুতানন্দজি বললেন, তাঁর নাম স্বামী গঙ্গানন্দ। বর্তমান বয়স শুনেছি ৯৫ বৎসর। উজলীতে অবস্থিত কৈলাশ-আশ্রমের একটি কুটিয়াতে থাকেন। স্বামিজী আরও বললেন আগে উজলী অঞ্চল ঘন অরণ্যপূর্ণ ছিল। বাঘ ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর অবাধ সঞ্চরণ ছিল সেখানে। এ সব পরিষ্কার করে আজ এই শহরতলীতে সাধু-সন্তদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। আধুনিক উত্তরকাশীর যতই সম্প্রসারণ হয়েছে, সাধুরা ততই লোকালয় থেকে দূরে নির্জনে চলে গিয়েছেন। এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে উজলী।

উত্তরকাশীতে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কি-কি দেখবার আছে জিজ্ঞাসা করাতে স্বামিজী বললেন, মহাভারতে বর্ণিত কিরাতার্জুনের যুদ্ধ এখানে হয়েছিল। বারনাবতে জতুগৃহ-যেখানে পঞ্চপাণ্ডব ও মাতা কুন্তীর বাস ছিল, দুর্যোধনের দুষ্ট মন্ত্রী পুরোচন কর্তৃক তাতে অগ্নিসংযোগ, সুড়ঙ্গপথে ওঁদের গঙ্গাতীরে এসে নৌকায় ওপারে যাওয়া—এ সবই এখানে সংঘটিত হয়েছিল। শহর থেকে কিছুদূরে লাক্ষা-মন্দির নামে একটি মন্দির আছে। প্রবাদ, ওখানেই জতুগৃহ

ছিল। ইদানীং ভাঙাচোরা এই লাক্ষা-মন্দিরের কিছু কিছু সংস্কার করা হয়েছে।

পঞ্চপাণ্ডবরা যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে ও পরে তপস্যার কালে উত্তরাখণ্ড পরিক্রমা করেছিলেন তা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে।

ইতিহাসবর্ণিত ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নেতা নানা ফড়্নবিশ আত্মগোপন করেছিলেন এখানকার এক পাহাড়ী কুটিরে। আজ এক শতাব্দীরও বেশী পরে দেশবাসী ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই দেশনেতাকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

এ সব কারণে উত্তরকাশী এক মহাতীর্থ।

অচ্যুতানন্দজীর সঙ্গে আলাপ করে অপার আনন্দ লাভ হচ্ছিল। কিন্তু সময় কম। বেলা বারটায় আমাদের বাস ছাড়বে, এখন দশটা বাজে। ওঁর দেওয়া প্রসাদ পেয়ে ওঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম।

উত্তর কাশী সম্বন্ধে মোটামুটি জানা হল, মনটা খুব ভাল লাগছে। বাস ছাড়ার সময় এগিয়ে এল। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে পথের ধারে একটা হোটেলে খাওয়া শেষ করে আমি শশাঙ্ক ও লালুবাবু বাসে এসে নিজেদের জায়গা দখল করলাম। পরিমল, রোহিত ও গৌর ধর্মশালায় গিয়ে কুলির সাহায্যে মালপত্র এনে বাসের মাথায় তুলল।

বাসে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে পরিমল বলল, আজ সকালটা বেশ কাটল সাধুসঙ্গে। অনেক তো দেখলাম, যা দেখিনি 'সেই বড় নয়'। যা কিছু দেখা হল না তার কথাও তো শুনলাম।

বাসের ধর্মঘট মিটে গিয়েছে। সব যাত্রী ইতিমধ্যে এসে যে-যার জায়গা দখল নিয়েছেন। কন্‌ডাকটার গুণে গুণে দেখছে সকলে এসেছে কিনা। ড্রাইভার শিব সিং এসে ঘন-ঘন হর্ন দিতে লাগল। 'সব ঠিক হ্যায়' শুনে সে বাস ছাড়ল। সবার সম্মিলিতকণ্ঠে ধ্বনি উঠল, "গঙ্গা মাঈ কি জয়।" বেলা বারটা বেজে দশ মিনিট। আজকের যাত্রা শেষে আমাদের বাস যাবে শেষ সীমা 'লঙ্কা চটি' পর্যন্ত। সেখান থেকে হেঁটে ভৈরবঘাঁটি। ওখানে অন্য বাস আমাদের নিয়ে যাবে ছ'মাইল দূরে গঙ্গোত্রী। এখানেই অনেকের পরিক্রমার শেষ। তারপর তাঁদের ফেরার পালা। আমাদের আকাঙ্ক্ষা আরও এগিয়ে গোমুখ যাবার।

বাস ও ট্যাক্সি ডিপো পার হয়ে উত্তরকাশীর জনবহুল অংশ ডানদিকে রেখে বাস ক্রমশঃ চড়াইপথে চলল। একটু পরে শহরের বাইরে এসে পড়লাম। গঙ্গার ধার দিয়ে পথ। এঁকে-বেঁকে চলেছে। তিন মাইল পরে গঙ্গোত্রী এসে পৌঁছলাম। এখানেই 'অসি' নদীর সঙ্গে ভাগীরথীর সঙ্গম।

গঙ্গোত্রী পুলিশ-চেক-পোস্টের সামনে 'গেট'। তার বাইরে আমাদের বাস এসে দাঁড়াল। এর ওপারে 'ইনার লাইন পারমিটে'র এলাকা শুরু। দুজন পুলিশ কনস্টেবল এসে বাসের যাত্রীদের পারমিট পরীক্ষা করে অনুমতি দেবার পর বাস ছেড়ে দিল। যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী এলাকায় বিদেশীদের প্রবেশ নিষেধ এবং এ ব্যাপারে বেশ কড়াকড়ি। ধরাসুর একটু আগে রাস্তার ধারে বেশ বড় একটা টিনের বোর্ডে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি ও সাবধান-বাণী লেখা আছে।

গঙ্গোত্রী ছেড়ে বাস চলল আঁকা-বাঁকা পথ-ধরে। আগের দিন

বৃষ্টি হবার দরুণ ধস্ নেমে পথে অবরোধ সৃষ্টি হয়েছে। নেপালী কুলিরা তা মুক্ত করতে ব্যস্ত। একস্থানে বাস খুব সাবধানে ধসের উপর দিয়ে কাত হয়ে পার হল। ক্ষণিকের জন্য মনে হল সাগরের ঢেউ-এর দোলায় জাহাজের বুকে যেন ভেসে চলেছি। ডান দিকে একশ ফুট নিচু খাদ। তার পাশ দিয়ে নদী। সামান্য অসতর্কতায় বাস গড়িয়ে নিচে পড়লেই আমাদের সলিল-সমাধি। অসামান্য-দক্ষতার সঙ্গে আমাদের সারথি শিব সিং ধসের ওপারে বাস নিয়ে এল।

এরপর মোটামুটি পরিষ্কার রাস্তা। ডানদিক দিয়ে গৈরিকবসনা খরস্রোতা ভাগীরথী নৃত্য-চপল-ছন্দে বয়ে চলেছেন, সুন্দর উপত্যকা, যেন পটে লেখা। পথের ধারে পাহাড়ের গায়ে চীর ও দেবদারু গাছের ঘন অরণ্য। সমতলে নানা রং-এর অজস্র ফুলের মেলা। প্রকৃতির এই অপূর্ব লীলা-নিকেতনের দিকে চেয়ে দুচোখ জুড়িয়ে যায়।

গঙ্গোত্রী ছেড়ে সাত মাইল এগিয়ে আমরা 'মানেরী' পৌঁছলাম। সমুদ্রতীর থেকে ৪৩৮০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত 'মানেরী' একটি সমৃদ্ধ স্থান। এখানে ধর্মশালা ও সিন্ধু-পাঞ্জাব সদাব্রত আছে। হাঁটাপথ-কালের যাত্রীরা উত্তরকাশী থেকে এগিয়ে প্রথম রাত্রে এখানে আশ্রয় নিতেন। এখানেও একটা পুলিশ-চৌকি আছে। এখানেও এক দফা 'চেকিং' হল, অবশ্য নামমাত্র।

আমরা বাইরে এসে নদীর ধারে দাঁড়ালাম। অল্প নিচু দিয়ে স্রোতস্বিনী ভাগীরথী বয়ে চলেছেন। অল্পদূরে তার কূলে আধুনিক কায়দায় গড়া অনেকগুলি অস্থায়ী শিবির। Maneri-Bhalli Project Diversion Dam-এর প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। শিবিরগুলি ওদের কর্মীদের আবাস ও গুদাম-ঘর। টিহরিতে এরকম আর একটা বাঁধ তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে। এ দুটি সম্পূর্ণ হলে এ অঞ্চলে শিল্প সমৃদ্ধির সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের।

মানেরীতে দশ মিনিট বিরতির পর বাস ছাড়ল। শুরু হল আবার সঙ্কীর্ণ বন্ধুর-রাস্তা।

মানেরী থেকে পাঁচ মাইল দূরে এসে মাল্লা। এখান থেকে কেদারনাথ যাবার হাঁটা-পথ আছে। হিমালয় প্রেমিক পদযাত্রীরা অনেকে এপথে কেদারনাথ-গঙ্গোত্রী পরিক্রমা করেন।

মাল্লা পার হয়ে আরও দু-মাইল দূরে ভাটোয়ারী এসে বাস থামল। এখানে আর-এক-দফা আমাদের পারমিট পরীক্ষা করা হল।

ভাটোয়ারী উত্তরকাশী জেলার একটি মহকুমা শহর। ডাক-বাংলো, বনবিভাগের বিশ্রামাবাস, ধর্মশালা, ডাকঘর, হাসপাতাল—এসব নিয়ে আজকের ভাটোয়ারী গড়ে উঠেছে। একটা চায়ের দোকানে ঢুকে এক পেয়ালা চা নিয়ে বসলাম। দোকানের অন্য অংশে মণিহারী ও মুদির দোকান। বড় শহর হলে এর নাম হত 'ডিপার্টমেন্টাল স্টোর', অর্থাৎ যেখানে সব কিছুই পাওয়া যায়। এ অঞ্চলে ব্যাবসা-বাণিজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে ভাটোয়ারীর প্রসার ক্রমেই বাড়ছে।

হাঁটাপথ-কালের যাত্রীরা এখানে এসে বিশ্রাম ও রাত্রিবাস করতেন।

ভাটোয়ারী সমুদ্রতীর থেকে ৬০০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। এর অন্য নাম ভাস্করপ্রয়াগ। এখানে 'জল' ও ভাগীরথীর সঙ্গম। বেলা এখন দুটো বেজেছে। সুনীল, নির্মল আকাশে সূর্যদেব পশ্চিমপাটে উঠেছেন। মৃদুশীতল হাওয়া বইছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোলোভা। আমাদের এদৃশ্য উপভোগ করবার সময় নেই। আজকের বাস যাত্রার শেষ-ঘাঁটি 'লঙ্কা' এখনও 'দূর অস্ত'। আমরা এসে বসতেই বাস ছেড়ে দিল।

সঙ্কীর্ণ অসমান বন্ধুর পথের উপর দিয়েই বাস চলেছে। পথের ধারে পাহাড়ের গায়ে নানা সাবধান বাণী লেখা। ভাগীরথী কখনো

ডাইনে, কখনো বা সরু পুল পার হয়ে আমরা তাঁকে বাঁয়ে রেখে চলেছি, আবার অন্য পুল পেরিয়ে তার ডানদিকে। সর্পিল নদী, ঘন-ঘন তাঁর বাঁক। তাই কখনো তিনি আমাদের ডাইনে, কখনো বা বাঁয়ে। উত্তরকাশী থেকে এ পর্যন্ত আসতে ভাগীরথীর চঞ্চল ও প্রাণোচ্ছল রূপ দেখতে-দেখতে এসেছি, কিন্তু এখানে দেখলাম তাঁর রুদ্ররূপ। দুরন্ত স্রোতে উর্ধ্বফণা সহস্রনাগিণীর মতো ফুঁসে ফুঁসে চলেছেন।

এভাবে ন-মাইল রাস্তা চলে আমাদের বাস গঙ্গানীতে এসে দাঁড়াল। সমুদ্রতীর থেকে এর উচ্চতা ৭০০০ ফুট।

গঙ্গানী সেকালে হাঁটা-পথ-যাত্রীদের পরমনির্ভরযোগ্য রাত্রি-বাসের আশ্রয় ছিল। পথের ধারে ধর্মশালা, চটি ও দোকানপাটগুলি তাদের সেবা করত। আজ যাত্রীভরা বাস গঙ্গানীর উপর দিয়ে সোজা চলে যায়, কখনো বা পাঁচ-সাত মিনিটের জন্য দাঁড়ায়। এ যেন আজ দূরপাল্লার পথে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাগ স্টেশন।

শুনলাম মাইলখানেক দূরে ঋষিকুণ্ড। এখানে স্নানে দেহমনে অপূর্ব আনন্দ আসে। একটি গুহাকে কেন্দ্র করে এই তপ্ত কুণ্ড—হিমের দেশে উষ্ণ জলের প্রবাহ।

পরিমল জিজ্ঞাসা করল, যমুনোত্রী থেকে ফেরার পথেও তো এক গঙ্গানীতে আমরা রাত্রিবাস করেছিলাম। দুটো গঙ্গানী আছে নাকি? লালুবাবু তাড়াতাড়ি ওঁর ভুল সংশোধন করে বললেন, "সেটা ছিল গাঙ্গনানী আর এটা হল গঙ্গানী।" গৌর বলে উঠল, 'পাত্রাধার তৈল আর তৈলাধার পাত্র আর কি!'

বাস এখানে মিনিট পাঁচেক দাঁড়াল। আর এক দফা পারমিট পরীক্ষা করার জন্য। সিপাইজী বাসের জানলা দিয়ে উঁকিমেরে "সব ঠিক হ্যায়?" জিজ্ঞাসা করতে শিং শিং সঙ্গে-সঙ্গেই জবাব দিল, "জি, মহারাজ, বিলকুল্ ঠিক," আর সঙ্গে-সঙ্গেই 'সবুজ সঙ্কেত', বাসও ছেড়ে দিল।

আমরা ক্রমেই উপরে উঠছি। যত উপরে উঠছি, ততই হিমেল হাওয়া বইছে। ভাটোয়ারী ছাড়ার পর গরম সোয়েটার পরেছি। হাতে রেখেছি বাঁদরটুপি—প্রয়োজনে পরব বলে। পথের দৃশ্য একই রকম। বাঁ দিকে পাহাড়, তার ঢালে পল্লবভারাচ্ছন্ন দেওদার বন।

আরও চার মাইল চলে বাস লোহারীনাগ পার হল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭৪০০ ফুট উঁচু। এখানে একটি ধর্মশালা পরিত্যক্ত, অবহেলিত হয়ে পথের ধারে পড়ে আছে দেখলাম।

লোহারীনাগ ছাড়িয়ে বাস আরও উঁচুতে উঠতে লাগল ও তিন মাইল চড়াই শেষ করে এসে পৌঁছল 'সুখ্খি'। শিব শিং বলল এখান থেকে শুরু হবে বিখ্যাত চড়াই। ভাগীরথী এখানে খুব কাছ দিয়ে বয়ে চলেছেন। 'সুখখি'তে একটি ছোট ধর্মশালা আছে। তা আজ পরিত্যক্ত। যাত্রীরা আজকাল এখানে বিশ্রাম নেয় না।

সুখ্খি একটা বিরাট পাহাড়। তার কোল থেকে চূড়া পর্যন্ত মুহুর্মুহুঃ 'ঘুম' বা Hairpin Bend ভরা রাস্তা পাহাড়কে অতিক্রম করেছে। যেন এক বিরাট অজগর সাপ সমস্ত পাহাড়কে পাক দিয়ে বেঁধে নিচু থেকে উপরে উঠে গিয়ে আবার অন্য ধার দিয়ে ওপর থেকে নিচে নেমে এসেছে।' বাস গোঁ-গোঁ শব্দ করতে করতে ধীরে-ধীরে ওপরে উঠছে। একের-পর-এক ঘুম অতিক্রম করে মনে হচ্ছে যেন আর বোঝা টানতে পারছে না। সারথি ঘনঘন গিয়ার বদল করছে। মাঝে-মাঝে বাস থামিয়ে তেতেওঠা এনজিনকে ঠাণ্ডা করবার জন্য রাস্তার ধারের ছোট ঝরনা থেকে ঠাণ্ডা জল নিয়ে রেডিয়েটারে ঢেলে দিচ্ছে। মাঝে-মাঝে ভয় পাচ্ছি, এই বুঝি বিকল হল যন্ত্রদানব, নির্জন পাহাড়ের মাঝে আমাদের তাহলে কি দশা হবে। প্রতি 'ঘুম' বা Hairpin Bend-এর শুরুতে এক, দুই, তিন করে নম্বর লেখা বোর্ড আছে। এ রকম একটা বোর্ডের লেখা থেকে বুঝলাম, আমরা সমুদ্রতীর থেকে ৮৭০০ ফুট উপরে উঠে এসেছি। যত উপরে উঠছি ততই বেশী শীত-শীত অনুভব করছি। নিচে

ফেলে আসা রাস্তার দিকে চেয়ে বুঝতে পারছি যে কি দ্রুতগতিতে উপরে উঠছি। পাহাড়ের ঢালে ইতস্ততঃ ছড়ান ধান ও সবজির ক্ষেতগুলি যেন মরুভূমিতে 'ওয়েসিস্'। অনেক নিচ দিয়ে বহতা নদীর উপর সূর্যকিরণ পড়াতে জলের ধারা রুপোলী রেখার মতো ঝিক্-মিক্ করছে।

সুখ্ খি থেকে তিন মাইল পেরিয়ে একটা উৎরাই-শেষে আমরা 'ঝালা' এসে পৌঁছলাম। এখানে ভাগীরথীর উপর বড় লোহার পুল। তার মুখে বন্দুকধারী সিপাইরা পাহারা দিচ্ছে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সেতুর নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে।

ঝালার চারিদিকের দৃশ্য দেখে মন ভরে গেল। এখানে গঙ্গার রূপের বিচিত্র পরিবর্তন। কোথায় সেই অপ্রশস্ত খরস্রোতা ভীষণা নদী! তার পরিবর্তে একি শান্ত সমাহিত মূর্তি তার! দুপারে বিস্তীর্ণ বেলাভূমি। প্রশস্ত নদীর বুকে মাঝে-মাঝে চড়া পড়েছে। দুকূল ঘেঁষে মৃদু স্রোতের উপর হালকা ঢেউ-এর খেলা। সব কিছু মিলে বড় সুন্দর দৃশ্য।

ওপার থেকে ভেড়া ও ছাগলের পাল সমস্ত পুলটা জুড়ে আসছে, বাসকে দাঁড়াতেই হল। এ সুযোগে আমরা প্রাণভরে ঝালার চারিদিকের সৌন্দর্য দেখবার সুযোগ পেলাম।

ভেড়ার পাল চলে গেলে আমাদের বাস চলা শুরু করল।

ঝালার পুল পার হয়ে আবার একের পর এক 'ঘুম' অতিক্রম করে বাস চলেছে—যেন অতি ক্লান্ত পথযাত্রী দুরন্ত চড়াই-পথ লঙ্ঘন করছে। এভাবে তিন ও চার নম্বর 'ঘুমে'র মাঝে এক জায়গায় বোর্ডে লেখা 'হরশিল—১০ কিলোমিটার'। মনটা ভাল লাগল। এতক্ষণ পরে একটা লোকালয়ের কাছে এসে পড়েছি।

অল্প পরেই পাহাড়ের গায়ে বসান অনেকগুলি বাড়ী দেখা গেল। শিব শিং বলল 'ঐ হরশিল'। গর্জন করতে-করতে

আমাদের বাস এসে এখানে দাঁড়াল। শিব শিং ঘোষণা করল বাস এখানে পনের মিনিট দাঁড়াবে।

আমরাও নিচে নেমে দাঁড়ালাম।

ভাগীরথীর তীরে 'হরশিল' বহু পুরাতন ঐতিহ্যময় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি জনপদ। এর চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। এর অপর নাম গুপ্তপ্রয়াগ। এখানে হরগঙ্গা ও গঙ্গার সঙ্গম। এখানে একটি সুন্দর ডাক-বাংলো ও সরকারী বয়ন-শিল্পকেন্দ্র আছে। হরশিলে ঢুকবার আগেই একটি অপরিচ্ছন্ন শ্রীহীন বস্তি চোখে পড়ল, শুনলাম, ওটা তিব্বতী পাড়া। অতীতে হরশিল ভারত ও তিব্বতের বাণিজ্য-পণ্য লেনদেনের এক গুরুত্বপূর্ণ 'গঞ্জ' ছিল। এখান থেকে ভারত-তিব্বত সীমান্তবর্তী নেলাং গিরিবর্ত্ম খুব নিকটেই। সে পথে অবাধ বাণিজ্য চলত। একারণে বহু তিব্বতী ব্যাবসায়ী স্থায়ীভাবে হরশিলে বাস করতেন। দেশ স্বাধীন হবার পরও যতদিন পঞ্চশীল-নীতির আদর ছিল চীনের কাছে, ততদিন ওদের ব্যাবসা-বাণিজ্য অবাধে চলেছে। তারপর এল দুদেশের মধ্যে রাজনৈতিক মনোমালিন্য। "হিন্দি-চীনি ভাই ভাই"-এর জায়গায় রব উঠল "হিন্দি-চীনি দুশমন"। তিব্বত পড়ল চীনের আগ্রাসী কবলে। চিরকালের জন্য ভারত-তিব্বতের সীমান্ত বন্ধ হল। সীমান্তবর্তী এই ভারত ও তিব্বতবাসীদের বরাতে নেমে এল চরম দুর্দিন। তিব্বত থেকে আমদানি হত পশম। এখানে তা থেকে তৈরী হত কম্বল, গালিচা, গরমটুপি, সোয়েটার ইত্যাদি। এ ছাড়াও আমদানি হত চমরীর লেজ, নানারকম গাছ-গাছড়া ও জড়িবুটি। এ দিক থেকে রপ্তানি হত নুন, মশলা, তৈজসপত্র, সুতির জামা, জুতা, মণিহারী দ্রব্য ও প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি। শুনলাম চোরাপথে এখনও এসব জিনিসপত্রর লেনদেন হয়। পশমের জিনিস তৈরী

করবার কারখানা ঘরে-ঘরেই আছে। আমরা অনেকটা এরকম দেখেছিলাম বদরিনাথ পরিক্রমায় ওখান থেকে তুমাইল দূরে মানা গ্রামে।

পৌরাণিক ও ধর্মীয় খ্যাতি ছাড়াও আজকের হরশিল দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি। এখানে বেশ কয়েকটা 'ছাউনি' দেখলাম। মাঝে-মাঝে ওদের জীপ ও ট্রাকগুলি ধূলো উড়িয়ে চলে যাচ্ছে। এখানে ওদের একটা Ambulance unitও রয়েছে দেখলাম। গ্রামের লোকজন ও ফৌজীদের নিয়ে হরশিলে বেশ কর্ম-চঞ্চল-ভাব লক্ষ্য করলাম।

শিব সিং ইতিমধ্যে বাসের তপ্ত এনজিনকে শীতল জলপান করিয়ে ঠাণ্ডা করেছে। এবার সে হর্ন দিতে লাগল, ছাড়ার সঙ্কেত-ধ্বনি হিসাবে। এদিকে আলো কমে আসছে। চারিদিকে পাহাড়ের চূড়ায় তুষার-মুকুট। স্থানে স্থানে তা বিগলিত করুণাধারায় নেমে আসছে কালো পাথরের গা বেয়ে। কোথাও বা কয়েকটি ধারা মিলিত হয়ে ঝরনার রূপ নিয়ে ভাগীরথীর বুকে এসে মিশেছে।

যাত্রীরা সব উঠেছে জেনে নিয়ে "গঙ্গা মাঈ কি জয়" ধ্বনির মধ্য দিয়ে শিব সিং বাস চালু করল। আমরা আজকের যাত্রা-পথের শেষ-অঙ্কে এসে পৌঁচেছি। বহু ঈপ্সিত গঙ্গোত্রী আর মাত্র ন' মাইল দূরে।

হরশিল ছাড়বার পর রাস্তা আরও খারাপ। ঝুরো মাটির পাহাড়ের গা কেটে রাস্তা। তার উপর ছড়ান ছোট-বড় পাথরের খণ্ড। এর উপর দিয়ে আমাদের দক্ষ বাসচালক শিব সিং ধীরে ও অতি সাবধানে বাস নিয়ে চলেছে।

নিচে বয়ে চলেছেন ভাগীরথী। ঝালার শান্ত রূপের পরিবর্তে তিনি আবার খরস্রোতা প্রলয়ঙ্করী রূপ ধরেছেন।

হরশিল ছেড়ে আমরা এখন উৎরাই-পথে নামছি। নদী তাই ক্রমে কাছে এসে পড়ছে। আমরা একটা পাহাড়কে যেন

বৃত্তাকারে পরিক্রমা করছি। এ ভাবে দু' মাইল চলে আমাদের বাস ধরালিতে এসে পৌঁছল।

পাহাড়ের কোলে অবস্থিত ধরালী এ অঞ্চলে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রাম। ধারিওয়াল নামে পার্বত্যজাতির বাস এখানে। এর প্রাচীন নাম বিশ্বনাথপুরী, আর এক নাম শ্যামপ্রয়াগ। অপরূপ পটভূমিতে সাজান ছোট্ট গ্রামখানি! হিমালয়ের সীমাহীন বিশালতা ও তার কোল দিয়ে বয়ে-যাওয়া পুণ্যতোয়া তটিনী এর মাধুর্য বাড়িয়ে তুলেছে। জয়পুরের মহারাজের নির্মিত একটি ধর্মশালা আছে! শোনা গেল এই বাড়ীতে এককালে নাকি একজন ইংরাজ বাস করতেন। সিপাহি-বিদ্রোহের সময় তিনি প্রাণভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। ধূমায়িত বিদ্রোহের আগুনের মধ্যে একা বাস করা বিপজ্জনক হবে এতো জানা কথা।

ধরালীর আর একটি দর্শনীয় স্থান মাটির মধ্যে বসে-যাওয়া শিব মন্দির। মন্দিরটি নদী গর্ভের অল্প দূরে। মাত্র দশ-বার হাত মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে, বাকীটা ডুবে গেছে মাটির তলে। বাসে যেতে-যেতে-কনডাকটার আমাদের মন্দিরটা দেখাল।

নদীর ওপারে মুখবা গ্রাম, গঙ্গোত্রীর পাণ্ডাদের শীতকালীন আবাস। অকটোবর মাসের শেষ থেকে গঙ্গোত্রী জনপদ যখন তুষারাবৃত হয়ে যায়, পাণ্ডারা নেমে আসেন মুখবা গ্রামে। ছোট গ্রাম, কয়েকটা পাহাড়ী ঘর ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।

ধরালি ছাড়াতেই শুরু হল দেওদারের নিবিড় অরণ্যানী। শ্যামল বনানী, তার গাছের পাতায় পাতায় নাম-না-জানা বিচিত্র পাখীর কলরব। বাসের গর্জনে তারা ভয় পেয়ে দূরে উড়ে যাচ্ছে;

পশ্চিম দিগন্তে সূর্যদেব অস্তাচলে। নির্জন বনভূমির শান্তি বিঘ্নিত করে চলেছে আমাদের বাস। গঙ্গোত্রী আগতপ্রায়। বাসের সহযাত্রীরা মহানন্দে গঙ্গামাঈ আর শিবের স্তোত্রপাঠ করছেন, আর মাঝে-মাঝে তাঁদের জয়ধ্বনি দিয়ে উঠছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাস এসে পৌঁছল এক জংলা চটিতে। হিমালয়ের কোলে ছোট নামহীন চটি, পথের ধারে একটা মামুলি চায়ের দোকান, বসতির কোন নামগন্ধ নেই। এমন চটিগুলির নামই জংলা চটি। এখানে কাঠের তক্তা ফেলা পুলের উপর দিয়ে আমাদের বাস নদী পার হল, ভয় হচ্ছিল নড়বড়ে তক্তাগুলো যাত্রীভরা বাসের ভার সইতে পারলে হয়। জংলাতে বন বিভাগের একটা বিশ্রাম-গৃহ নিঃসঙ্গ একাকীত্বে দাঁড়িয়ে আছে।

শিব সিং আমাদের দেখালে এখান থেকে বাঁ হাতে চলে গিয়েছে লামাদের দেশ তিব্বতে যাবার একটা পথ। এ পথ চলে গিয়েছে তিব্বত সীমান্তর ওপারে গারটক পর্যন্ত। পথ না বলে পাকদণ্ডী বললেও হয়। হরশিলের মতো সেকালে অবাধে বেচা-কেনা চলত। আজ তা একরকম বন্ধ। চোরাপথে আনা-নেওয়ার ঝুঁকি ছাড়াও এ পথের দুর্গমতা তিব্বতীদের অনেকটা নিরুৎসাহ করেছে। অবশ্য অল্প বিস্তর লেনদেন এখনও আছে।

জংলা থেকে লঙ্কা চটির দূরত্ব মাত্র দু'মাইল। কিন্তু এ পথটুকুই সব চাইতে কঠিন ও ভয়ঙ্কর। বড় ও মাঝারি মাপের পাথরের টুকরো ফেলে তৈরী রাস্তা। এর সঙ্গে আছে দুরন্ত চড়াই ও তীক্ষ্ণ বাঁক। মোড় ঘোরার আগেই দেখলাম ভীষণা ভাগীরথী দু'পাহাড়ের মধ্যে বহু নিচু দিয়ে সগর্জনে বয়ে চলেছেন। খাদের ধারে পাইন গাছের ঘন বন, গোধূলি লগ্নের স্নিগ্ধ সমীরণ ও রক্তিম পশ্চিমাকাশ— সব মিলে একটা শান্ত সমাহিত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ডান দিকের পাথর খাড়াভাবে কেটে বাস-রাস্তা তৈরী করা হয়েছে। ধরালী থেকে যে পাহাড় ধরেছি, তার কোল থেকে উঠে চূড়া পর্যন্ত যেতে হবে আমাদের বাসকে। সে চূড়ায় বাসের শেষ-ঘাঁটি। যত উপরে উঠছি লতা গুল্ম ও বৃক্ষ চলে গিয়ে দেখা যাচ্ছে শুধু নগ্ন পাথরের দেওয়াল। অন্য দিকের দেওয়াল ভেদ করে কোন এক খরস্রোতা নদী এসে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। জনশ্রুতি,

কাছেই কোথাও জহ্নু মুনির আশ্রম ছিল। এখানে ভাগীরথী জটিল গিরিবর্তের মধ্যে এসে পথ হারিয়ে ফেলেন। তারপর রাজা ভগীরথের তপোবলে জহ্নু মনির উরুদেশ ভেদ করে আবার এসে দেখা দেন পৃথিবীর বুকে।

বাস চলেছে বন্ধুর পথের সর্পিল বাঁক ঘুরে-ঘুরে। কঠিন বাঁকের সঙ্গে জুটেছে দুরন্ত চড়াই। শিব সিং তাই খুব ধীরে ও সাবধানে বাস নিয়ে চলেছে। আমাদের মনে ভয় মিশ্রিত এক আনন্দানুভূতি।

দুস্তর চড়াই ও দুর্গম পথ পেরিয়ে আমরা এসে পৌঁছলাম বাসের শেষ ঘাঁটি লঙ্কা চটি। বেলা তখন সাড়ে পাঁচটা। সূর্যদেব তাঁর দিবসের পরিক্রমা শেষ করছেন, কিন্তু তাঁর অস্তরশ্মির আভায় পশ্চিম গগন তখনও রক্তিম।

লঙ্কা চটি একটা পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। চারিপাশ কেটে-কেটে সমতল করা হয়েছে। সেখানে গড়ে উঠেছে বাস স্ট্যাণ্ড, পরিবহণ ও পুলিশ কর্মচারীদের জন্য তৈরী ব্যারাক ধরনের বাড়ী ও খাবারের দোকানগুলি।

বাস থেকে নামতেই এক কুলি ঠিকাদার এসে আমাদের মালগুলি কুলি দিয়ে ভৈরব ঘাঁটি নিয়ে যাবার ও ফিরতি-পথে সেখান থেকে এখানে এনে বাসে তুলে দেবার ফুরণ করে ফেলল। প্রতি কিলোগ্রাম এক টাকা পঁচিশ পয়সা করে। আমরা রাজি হয়ে গেলাম। কুলিরা পিঠে মাল বাঁধতে শুরু করল।

বাস স্ট্যাণ্ড ও তার চারপাশে প্রচুর যাত্রী সমাগম। দশখানি বাস, দুটো মিনিবাস ও চারটা ট্যাক্‌সি দাঁড়িয়ে আছে। বাসগুলি সারাদিন ধরে যাত্রী এনেছে। কাল সকালে আবার যাত্রী বোঝাই করে উত্তরকাশী, কেদার-বদরী বা হৃষিকেশ রওনা হবে। মিনিবাস ও ট্যাক্‌সিগুলি রিজার্ভ করা যাত্রীদের জন্য। ওঁরা গঙ্গোত্রী গোমুখ দেখে ফিরলে সেগুলি ছাড়বে।

কুলিরা মালপত্র বেঁধে তৈরী, আমরা চা ও জলযোগ শেষ করে

ফিরে আসতেই ওরা রওনা হল ভৈরব ঘাঁটির-পথে। আমরা চললাম ওদের পিছু-পিছু।

লঙ্কা ও ভৈরব ঘাঁটির মাঝে মাত্র একটি নদীর ব্যবধান। এ পারে এক পাহাড়ের চূড়ায় লঙ্কা, ওপারে আর এক পাহাড়ের চূড়ায় ভৈরব ঘাঁটি—মাঝখান দিয়ে তীব্র স্রোতে বহমানা জাহ্নবী গঙ্গা এসে মিলেছেন ভাগীরথীর সঙ্গে। জাহ্নবী গঙ্গা আসছেন উত্তর-পূর্ব দিক থেকে। নেলাং গিরিবর্ত্মের ওপারে এক এক হিমবাহ তাঁর উৎসস্থান। ভাগীরথী বয়ে চলেছেন তাঁর উৎস গোমুখ থেকে পশ্চিম মুখে। সঙ্গম স্থলে ভয়ঙ্কর স্রোত। উন্মত্তা জাহ্নবী ধূম্রজাল সৃষ্টি করে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছেন ভাগীরথীর বুকে।

লঙ্কা ও ভৈরব ঘাঁটি পারাপারের জন্য পাকা পুল নির্মাণের কাজ চলছে। শেষ হলে বাস সোজা চলে যাবে ভৈরব ঘাঁটি হয়ে আরও ছ-মাইল আগে গঙ্গোত্রী। অর্থাৎ হৃষিকেশ থেকে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত একটানা বাসে। লঙ্কার পারে পুলের ভিত্তির কাজ সম্পূর্ণ। ওপারে এখনও কাজ চলছে। একবার নাকি তৈরী হবার পর জাহ্নবীর রুদ্র রোষে তা ভেসে গিয়েছে। আবার নূতন করে কাজ শুরু হয়েছে। আশা করা যায় দু-এক বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। বদরিনাথের পথে পাতালগঙ্গাকে যদি এঞ্জিনিয়াররা সেতু বন্ধনে বাঁধতে পেরে থাকেন তবে এখানেও তাঁরা নিশ্চয় সফল হবেন।

আজ গঙ্গোত্রী গোমুখ যাত্রীরা লঙ্কা থেকে পাক্‌দণ্ডী উৎরাই পথে নেমে বড়বড় প্রস্তরখণ্ডের উপর মোটা-মোটা কাঠের তক্তা-ফেলা সেতুর উপর দিয়ে নদী পার হয়ে ওপারে যান। তক্তাগুলি মোটা শিকল দিয়ে দুপারে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা, জল স্রোত বেশী হলে যাতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে না পারে।

তক্তার তলে জাহ্নবীর খরস্রোতা ভয়ঙ্করী রূপ দেখে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কোন রকমে পা পিছলে জলে পড়লে মৃত্যু

অনিবার্য। খুব সাবধানে তক্তার উপর লাঠি ঠুকে-ঠুকে ওপারে এলাম। এরপর শুরু হল দুস্তর চড়াই। সোজা খাড়া পাহাড় উঠে গেছে আকাশ পানে, তার বুক চিরে পাকদণ্ডী পথ। পাইন গাছের নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে আমরা ক'জন যাত্রী চলেছি। উঠতে হাঁপ ধরছে, গতি তাই অতি মন্থর। গায়ে গরম সোয়েটার, মাথায় বাঁদরটুপি ও হাতে দস্তানা পরেও শীতে কাঁপছি। দিনের আলো শেষ হয়ে সন্ধ্যা আসন্ন। যদি হঠাৎ বনের মধ্য থেকে হিংস্র ভালুক বেরিয়ে আসে তবে তো সর্বনাশ। যষ্টিমাত্র দিয়ে তো তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা যাবে না। নির্বিঘ্নে যাত্রা সমাপ্তির জন্য দেবী গঙ্গার উদ্দেশ্যে আকুল প্রার্থনা জানালাম। যাঁর চরণদর্শন মানসে পথের কষ্ট তুচ্ছ জেনেছি, তিনি যদি বরাভয়া হন, তবে কিসের শঙ্কা, কিসের দ্বিধা ?

ধীরে-ধীরে লাঠি ঠুকে আমরা চড়াই-পথের পাকদণ্ডী দিয়ে উঠছি। কুলিরা অত বোঝা নিয়েও আগে-আগে চলেছে। মাঝে-মাঝে ডুলি ও ডাণ্ডিতে করে শেঠজীরা আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাবার সময় গঙ্গা মাঈকি জয় বলে সম্ভাষণ করছেন।

সব সাগরেরই পার আছে, সব চড়াই-এরও শেষ আছে। প্রায় এক মাইল কঠিন চড়াই অতিক্রম করে আমরাও ভৈরব ঘাঁটিতে এসে পৌঁছলাম।

পাহাড়ের মাথায় পাইন ও ঝাউবনে ঘেরা ভৈরবঘাঁটি। রাস্তার এক পাশে চালাঘরে পাশাপাশি দু-তিনটে চা ও খাবারের দোকান। সেখানে লণ্ঠন জ্বলছে। পথ থেকে সামান্য একটু নেমে আধুনিক কায়দায় তৈরী যাত্রী-নিবাস বা 'ট্রাভেলার্স লজ'—স্যানাচটি ও জানকীবাঈ চটির যাত্রীনিবাসের মতো দেখতে। আমাদের পরিকল্পনা

অন্য রকম। ভাবছি এখানে বিশ্রাম না নিয়ে সোজা গঙ্গোত্রী চলে গেলে কেমন হয় ?

রাস্তার উপর গঙ্গোত্রী যাবার একখানা বাস দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে যাত্রী ভরে গিয়েও ছাদের উপর অন্ততঃ আট দশজনের ভিড়। আরও কিছু যাত্রী নিয়ে সে বাস গঙ্গোত্রী যাত্রা করবে। ড্রাইভার ঘনঘন হর্ন দিয়ে আরও যাত্রী আহ্বান করছে।

ইতিমধ্যে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে-থাকা গজেন্দ্র সিং-এর সঙ্গে আলাপ হল। ও যা বলল তাতে বুঝলাম এভাবে আমাদের যাওয়া অসম্ভব। এ বাস গঙ্গোত্রী থেকে ফিরে আসবে দেড়-দুঘণ্টা পরে, তারপর যাত্রী বোঝাই করে আর একবার যাবে। গঙ্গোত্রী পৌঁছবে রাত নটা নাগাদ। সেখানে কোনো যাত্রী-নিবাস বা ধর্মশালায় তিল ধারণের স্থান নেই। গতকাল বহু যাত্রী গাছতলায় পথের ধারে পড়েছিলেন। রাত্রে এই দুরন্ত শীতে ওভাবে রাত কাটালে নিউ-মোনিয়া রুখবে কে ? তার চেয়ে এখানকার যাত্রী নিবাসে রাত্রিটা থেকে কাল ভোরে গঙ্গোত্রী রওনা হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। গজেন্দ্র সিং আরও বলল, সে এখানকার যাত্রী-নিবাসের তত্ত্বাব-ধায়ক। আমাদের যাতে কোনো কষ্ট বা অসুবিধা না হয় সেদিকেও সে লক্ষ্য রাখবে।

শশাঙ্কবাবু একটু খুঁতখুত করতে লাগলেন। গন্তব্যস্থান গঙ্গোত্রীর এত কাছে এসে সেখানে রাত্রিবাস করব না, এটা ভাল লাগছে না। আমি প্রবল আপত্তি তুলে বললাম, "গঙ্গোত্রী যাবার যতই আকাঙ্খা থাক-না-কেন 'গঙ্গাযাত্রার' মোটেই বাসনা নেই, আজ রাত্রে ভৈরব ঘাঁটিতেই থাকতে হবে"। হাতের লক্ষ্মী অর্থাৎ এখানকার নিশ্চিত আশ্রয় পায়ে ঠেলে কোন্ বিপদ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দেব; লালুবাবু, পরিমল, [illegible]র ও রোহিত একবাক্যে আমাকে সমর্থন করলেন। আমরা যাত্রী-নিবাসে এলাম। গজেন্দ্র সিং আমাদের জন্য দুখানা বড় ঘর ঠিক করে দিল। পরিচ্ছন্ন

মেঝে, মোটা সতরঞ্চি বিছান তুখানা বড় ঘর খুবই পছন্দ-সই। গজেন্দ্র সিং একটা করে লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।

সারাদিন বাসের ধকলে ও ভৈরব ঘাঁটির চড়াই হেঁটে সবাই অপরিসীম ক্লান্ত। চায়ের দোকান থেকে তু'বালতি গরমজল আনাবার ব্যবস্থা হল। দক্ষিণা প্রতি বালতি পঁচিশ পয়সা।

হোলড্ অল খুলে যে যার বিছানা পেতে ফেললাম। পাশের ঘরগুলিও যাত্রী বোঝাই, নানাভাষার মিশ্রিত কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। কেউ গঙ্গোত্রী দেখে ফিরে এসেছেন, নিশা অবসানে রওনা হবেন হৃষিকেশের পথে। কেউ বা আমাদের মতো কাল সকালে বেরুবেন গঙ্গোত্রী-গোমুখের পথে। আমাদের মধ্যে লালুবাবুই বেশী মিশুক প্রকৃতির। পরিমল ঠাট্টা করে বলে উনি আমাদের পি.আর. ও.। তিনি ঘুরে এসে বললেন তুটো ঘরে বাঙালী যাত্রী রয়েছেন। ওঁরাও কাল সকালে গঙ্গোত্রী যাত্রা করছেন, গোমুখ যাবেন কিনা সেখানে পৌঁছে স্থির করবেন। আরও আনন্দের কথা একটা পরিবার এসেছেন শান্তিপুর থেকে, একেবারে ওঁর দেশওয়ালী।

বাথরুমে তু'বালতি গরম জল দিয়ে গিয়েছিল। ওদিয়েই আমরা হাত, মুখ ধুয়ে নিলাম। শশাঙ্কবাবু যথারীতি হিম-শীতল জলে স্নান করে দেহ শীতল করলেন।

সারা অঙ্গ শীতবস্ত্রে আচ্ছাদিত করে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। রাত্রি তখন সাড়ে-আটটা। নিঃসীম অন্ধকারের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একটানা ঝিল্লিরব শোনা যাচ্ছে। আকাশের বুকে ছেঁড়া-ছেঁড়া হালকা মেঘ, তার ফাঁকে লক্ষ-লক্ষ আলোকবর্ষ দূর থেকে তারাগুলি মিট-মিট করে জ্বলছে।

হোটেলে এসে খেতে বসলাম। বন্দোবস্ত প্রায় জানকীবাঈ চটিতে যোশীর হোটেলের মতো। মেঠো ঘরে টিনের চাল। চারিদিক ছিন্নচট ও ত্রিপলের পরদায় ঢাকা, ঠাণ্ডা তুরন্ত হাওয়ার দাপটে তা উড়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। খাবার টেবিলে রাখা প্রদীপগুলি নিভু-

নিভু। এরই মধ্যে আমরা ভাত রুটি খাওয়া শেষ করে ঘরে ফিরে এলাম।

রোহিতের মতলব ছিল ঘরে একটু আসর জমানর। পরিমল প্রায় ধমক দিয়ে বলে উঠল, "মামা, আর দেরী না করে শুয়ে পড়, তুমি তো কুম্ভকর্ণ বিশেষ, কাল ভোরে তোমাকে তুলতে প্রাণান্ত হবে।" বেচারা রোহিত, সুবোধ বালকের মতো বিছানায় গিয়ে উঠল।

স্থির হয়েছে গোমুখ দেখে ফিরবার পথে দু রাত্রি গঙ্গাত্রী বাস ক'রব। কাল ভোরে জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে গঙ্গোত্রীতে যাত্রী-নিবাস বা কোনো ধর্মশালায় রেখে যাব। গজেন্দ্র সিং এ ব্যাপারে সাহায্য করবে।

সারাদিনের ক্লান্তিতে কখন ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছিলাম জানি না, ঘুম ভাঙল লালুবাবুর ডাকে। ঘুম-জড়ান-চোখে জিজ্ঞাসা করলাম, "কটা বাজে"? উত্তর এল সাড়ে-চারটে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে পড়লাম। শশাঙ্কবাবুও উঠে পড়েছেন; টর্চবাতি জ্বলে দাড়ি কামাতে বসেছেন। বনে, উপবনে যেখানেই থাকুন, রোজ সকালে দাড়ি কামান আর ঠাণ্ডা জলে স্নান করা ওঁর চাই।

বিছানাপত্র বেঁধে ছটার কিছু আগেই আমরা তৈরী, কুলিরাও এসে গিয়েছে, মাল তুলে দেবে গঙ্গোত্রীর বাসে। গজেন্দ্র সিং এসে খবর দিল, জীপটা এখনই ছাড়বে, একটু বেশী পয়সা দিলে ওতেই যাওয়া যায়। আরাম আর সময়-সংক্ষেপের জন্য আমরা একবাক্যে রাজী হয়ে গেলাম। গজেন্দ্র সিং আমাদের সঙ্গে যাবে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত, সেখানে আমাদের জিনিসপত্রগুলি কোনো ধর্মশালা বা যাত্রীনিবাসে রেখে যাবার ব্যাপারে সাহায্য করতে।

খাবার দোকানে এসে গরম জিলিপি, সেউভাজা ও চা খেয়ে

বাইরে এসে দাঁড়ালাম। জীপগাড়ীর ড্রাইভার তার গাড়ীর তেল, জল সব পরীক্ষা করছে। এনজিন তো ঠাণ্ডা মেরে আছে, চালু করতে সময় লাগবে।

ড্রাইভার এন্‌জিন চালু করে হর্ন দিতে লাগল। আমরা তাড়াতাড়ি জীপে এসে বসলাম।

পাহাড়ের গা কেটে আঁকাবাঁকা রাস্তা, সেখান দিয়ে আমাদের জীপ চলেছে। রাস্তা মোটামুটি ভাল ও চওড়া। শুনলাম মাত্র তিনচার বছর আগে তৈরি হয়েছে। এক ধারে খাদের শেষে অনেক নিচে পাথরের আড়ালে ভাগীরথী অবিশ্রান্ত ধারায় সগর্জনে বয়ে চলেছেন। আমাদের মনে আনন্দ মিশ্রিত এক অপূর্ব উন্মাদনা জাগে।

যমুনোত্রী দেখে এসেছি, এবার গঙ্গোত্রী দেখার পালা।

একটানা প্রায় সোজা-রাস্তা-ধরে আমাদের জীপ চলেছে। ওধার থেকে যাত্রী-বোঝাই বাস চলে গেল ভৈরব ঘাঁটির দিকে। যাত্রা-শেষে ওরা ফিরে চলেছে ঘরমুখে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই জীপ গঙ্গোত্রী এসে পৌছল। "গঙ্গামাঈ কি জয়" ধ্বনি দিয়ে সকলে নেমে পড়লাম। কুলি যোগাড় করে আমাদের মালপত্র নিয়ে গজেন্দ্র সিং যাত্রী নিবাসের তত্ত্বাবধায়কের জিম্মায় রেখে এল। এবার সে ফিরে যাবে ভৈরবঘাঁটি। ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে কুলিদের মাথায় বিছানা ও সামান্য বোঝা চাপিয়ে আমরা চললাম পুলিশ-চৌকি। সেখানে গোমুখ যাবার পারমিট দেখাতে হবে। পথে গঙ্গোত্রী মন্দির দর্শন সেরেও সেখানে পূজা দিয়ে চা ও জলযোগ শেষ করলাম।

গঙ্গোত্রীতে অনেক-কিছু দেখবার আছে। আমরা তাই স্থির করেছি প্রথমে দূর ও দুর্গম পাড়ি গোমুখ দর্শন করে ফেরার পথে গঙ্গোত্রী এসে দুদিন থাকব। বর্ষা নামলে গোমুখের পথ আরও বিপদসঙ্কুল। আজ শুক্লা ত্রয়োদশী। শুনলাম এ সময়ে গোমুখ ও তার আশ-পাশের নৈসর্গিক দৃশ্য যেমন মনোহর, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। মেঘ ও বৃষ্টির জন্য বিপদের সম্ভাবনাও প্রচুর। তাই আগে গোমুখ দর্শন করে ফিরে এসে গঙ্গোত্রীতে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম নিয়ে সাধু-দর্শনের চেষ্টা করব।

কুলিদের সাহায্যে পুলিশ-চৌকি খুঁজে বের করে সিপাইজিকে Inner Line Permit দেখিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম গোমুখের পথে। মা গঙ্গা, তোমার কৃপায় যেন গোমুখদর্শন নির্বিঘ্ন হয় মনে-মনে এই প্রার্থনা জানাই।

আমাদের কুলি তথা গাইডদের নাম শের সিং ও কৃপাল সিং। ওরা হোল্ড-অল এবং ব্যাগ নিয়ে চলেছে, আমরা ওদের অনুসরণ করছি। মন্দিরের পিছন দিকে পাহাড়ের উপর দিয়ে পাকদণ্ডীপথ। এ পথ ভাগীরথীর ডান তীর ধরে গেছে, গোমুখ এখান থেকে প্রায়

তের মাইল। পাকদণ্ডী পথে অনেকটা খাড়াই উঠে আমরা মূল রাস্তার এসে পড়লাম। বাস স্ট্যাণ্ড থেকে এ রাস্তা শুরু হয়েছে।

গোমুখে এ পথ হিমালয় অভিযাত্রীদের "Gentle climb" বা হাল্‌কা চড়াই। আমাদের মতো যাত্রীদের পক্ষে অবশ্য Gentle নয়, বেশ কষ্টকরই মনে হয়েছে।

ধীরে-ধীরে চলেছি। সবার আগে পরিমল। তাকে আমরা এ পথে দলপতি মেনেছি। ওর বয়সও কম, স্বাস্থ্যপুষ্ট চেহারা, যথেষ্ট উদ্যমশীলও বটে। ওর পিছনে রোহিত, গৌর, শশাঙ্ক, লালুবাবু ও আমি। দলের মধ্যে আমি ও শশাঙ্কবাবু বয়ঃজ্যেষ্ঠ, লালুবাবু মাঝ বয়সী, পরিমল, রোহিত ও গৌর তো একেবারে যুবক।

চলতে-চলতে একবার পিছন ফিরে তাকালাম। গঙ্গোত্রীর মন্দির, ঘরবাড়ীগুলি ও গঙ্গার উপর পুল ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে, গঙ্গোত্রী ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। মন্দির ছেড়ে সামান্য এগোলেই নদীর বাঁক। সেখানে নদীতীরে বালক গঙ্গাদাস বাবার রাম মন্দির। গুহার ভিতর শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি। বাবা একাই থাকেন।

সঙ্কীর্ণ, বন্ধুর পথ ক্রমে সঙ্কীর্ণতর হয়ে আসছে। অতি সন্তর্পণে লাঠির সাহায্যে এগোচ্ছি। মেঘহীন নির্মল আকাশের নীল রং-এর পটভূমিতে সূর্যকিরণ ক্রমশঃই তীব্র হয়ে উঠছে। বাঁয়ে গগনচুম্বী পাহাড়, ডাইনে খাড়া নেমে যাওয়া খাদ। তার নিচু দিয়ে বহমানা ভাগীরথী। সর্পিল, সঙ্কীর্ণপথে তাঁকে কখনও কাছে দেখছি, কখনো বা দূরে সরে যাচ্ছেন। নদীর কলধ্বনি কখনও শ্রবণপথে আসছে, কখনও বা তা ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। ভাগীরথী চলেছেন তাঁর হিমালয়ের উৎস থেকে সাগর সঙ্গমে। আমরা চলেছি উজানপথে গোমুখে তাঁর উৎস দর্শন বাসনায়। যমুনোত্রীর দুরন্ত চড়াই-উৎরাই পরিক্রমা করে শরীরে যে ক্লান্তি এসেছিল তা এখন

বিদূরিত। আমাদের এতকালের আকাঙ্খা সফল হবার পথে—মন আনন্দোচ্ছল। লালুবাবু থেকে-থেকে বলে উঠছেন, "চরৈবেতি, চরৈবেতি"।

পথের দুধারে ভূর্জবৃক্ষ ঘন ছায়ার সৃষ্টি করেছে। রৌদ্রতপ্ত দেহ চড়াই-এ ক্লান্ত হয়ে মাঝে-মাঝে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করে। সবার কাঁধেই জলের ব্যাগ। তা খুলে ঢক্-ঢক করে তৃষ্ণা মেটাই। একটু বিশ্রামের পর আবার চলতে শুরু করি। আজকের যাত্রা শেষ হবে ভূজবাসা চটিতে, গঙ্গোত্রী থেকে এর দূরত্ব এগার মাইল। চড়াই ও ভাঙা পথ পেরিয়ে বিকালের আগেই সেখানে পৌঁছতে হবে। পথে লোকালয়ও নেই, আশ্রয়ের চটিও নেই। চীর বাসা বিশ্রামগৃহে আমরা নামব না। অতএব "চল্ মুসাফির আগে চল্।"

ভূর্জ গাছের ঘন ছায়া কখন-কখন আমাদের মাথার উপর চন্দ্রাতপের কাজ করছে, আবার সেগুলি পার হয়ে গেলে উন্মুক্ত আকাশের নিচে অকরুণ সূর্যকিরণে সমস্ত দেহ যেন ঘামে ভিজে যাচ্ছে। গরম সোয়েটার খুলে শুধু সার্ট ও প্যাণ্ট পরে নিজেদের হালকা করে চলেছি। মাঝে-মাঝে দলপতি একটা দুটো করে লজেন্স খেতে দিচ্ছেন তৃষ্ণা নিবারণের উদ্দেশ্যে। যেতে-যেতে দেখতে পাচ্ছি ছোট-ছোট গাছে নানা রং-এর অজস্র ফুলের বাহার। পাহাড়ী পথে খাদের ধারে সর্বত্র ফুলের মেলা। মাঝে-মাঝে তার সুবাসিত বাতাস বয়ে যাচ্ছে। শের সিং খাদের দিকে একটু নেমে ঝোপের মধ্য থেকে এক মুঠো গাছের পাতা তুলে এনে বলল, 'শেঠজি, এ হল বনতুলসী, এর গন্ধ খুব সুন্দর, খেতেও ভাল, বহু রোগ-হরও বটে। আমরা দু-একটা পাতা হাতে ঘষে গন্ধ নিলাম। রোহিত কিছু সঙ্গে রাখল, যদি পথে দরকার হয়।

ক্রমশঃ উপরে উঠছি। ডান ধারে খাদের অনেক নিচু দিয়ে গেরুয়া বসনা ভাগীরথীর জলধারা বয়ে চলেছে। কোথাও-কোথাও প্রকাণ্ড পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ছে। কোথাও বা তার মাথার

ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। সঙ্কীর্ণ বন্ধুর-পথ, নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘোরে। একটু অসতর্ক বা অন্যমনস্ক হলে খাদে পড়ে গঙ্গা-প্রাপ্তি সুনিশ্চিত। এ পথে চলতে তাই ডাইনে বা বাঁয়ে তাকান নিষেধ।

গোমুখ যাবার এ পথ তৈরী হয়েছে ১৯৬২ সালে। তার আগে পথ ছিল নদীর তীর দিয়ে। সে পথ নামেই পথ। আসলে তা ছিল নদীর শব্দকে অনুসরণ করে পাথরের নুড়ি বা পাথরের উপর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া। সে পথে গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখের দূরত্ব ছিল আঠার মাইল। গঙ্গোত্রী মন্দিরের পাশে বাঁধান-পুল পার হয়ে শুরু হত সে পথ। ধস্, ছোট বড় পাথরের নুড়ি ও ঝরনাগুলি পার হবার মধ্যে ছিল পদে-পদে বিপদ, এমনকি মৃত্যুর সম্ভাবনা।

মাঝে-মাঝে পাথরের ফাঁকে পাতলা বরফের আবরণে অতলস্পর্শী গহ্বর, অভিযাত্রীর ভাষায় ভয়াল Crevices, চলতে-চলতে তার মধ্যে পা পড়লে কোথায় অতলে তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে! এ ছাড়া পথে গাছ ও গুহার আড়ালে লুকিয়ে থাকত হিংস্র ভাল্লুক। একবার তাদের কবলে পড়লে আর রক্ষা ছিল না। এর সঙ্গে যোগ দিত প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা। সুন্দর আকাশ, শান্ত প্রকৃতি যে কোন্ মুহূর্তে ভীষণ করাল রূপ ধারণ করবে তা 'দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ'? গোমুখ যাত্রীদের প্রায়শঃ তুষারঝঞ্ঝা, আঁধি আর প্রবল বৃষ্টিপাতের মুখোমুখি হতে হত। কাছে কোথাও পাহাড়ী গুহায় আশ্রয় নিয়ে তখন নিজেদের প্রাণরক্ষা করতে হত। লোকে বলত এ পথ মহাপুরুষদের। তাঁদের পক্ষেই এ পথ সুখকর। সাধারণের পক্ষে তা ধর্মের তত্ত্বের মতোই 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া'। তাই তো সেকালে লোকের ধারণা ছিল, যে গোমুখ যায় সে আর ফিরে আসে না। হিমালয় তাকে নিজের বক্ষে চির আশ্রয় দেয়, তার জন্য নির্দিষ্ট থাকে ব্রহ্মলোক।

সে তুলনায় আজকের গোমুখ যাবার পথ কত সহজ, সুগম।

এর কিছু অংশ দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল হলেও একটা বাঁধা পথ আছে। কোথাও-কোথাও অবশ্য পাহাড়ের গা-কাটা রাস্তা অত্যন্ত অপরিসর, এমন কি দেড় বা দুফুট মাত্র চওড়া। মনে হয় যেন পাহাড়ের গায়ে কার্নিসের ওপর দিয়ে চলেছি। অন্যধারে পাতালস্পর্শী খাদ, তার নিচু দিয়ে বহমানা-ভাগীরথী। কোথাও পাহাড়ের গায়ে সাদা রং মাখিয়ে রাস্তার নিশানা দেওয়া আছে। নদীর ওপারে দূরে নীল আকাশের নিচে বিস্তৃতভাবে দাঁড়িয়ে আছে চির তুষারাচ্ছন্ন ভগীরথ ও শতপন্থ গিরিশৃঙ্গ—ধ্যানমৌন, আপন মহিমায় মহীয়ান্। তাদের উপর প্রখর সূর্যতাপ পড়ে ধীরে-ধীরে গলা-বরফের ধারাগুলি পাহাড়ের গা বেয়ে নামছে। তারপর তারা এক সঙ্গে মিলে ঝরনার রূপ নিয়ে প্রচণ্ড স্রোতে নিজেদের মিলিয়ে দিচ্ছে বেগবতী ভাগীরথীর বুকে। এ দৃশ্য দেখতে-দেখতে সারা মন পবিত্র হয়ে ওঠে। সংসারের প্রাত্যহিকতার বন্ধন থেকে সে মুক্ত হয় অবারিত উদার আকাশে। ভূমি থেকে ভূমার অন্বেষণে বন্ধনহীন চিত্ত তখন ব্যাকুল হয়ে ওঠে এই ভাবের উদয় ক্ষণস্থায়ী হতে পারে, কিন্তু সেই ক্ষণেরও মূল্য আছে।

পথের ধারে একটা প্রস্তর খণ্ডের উপর বসে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকি সৌন্দর্যের লীলানিকেতন হিমালয়ের দিকে। লালুবাবু আবৃত্তি করেন ঃ—

> “তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্ত সঞ্চিত
> তপস্যার মত। স্তব্ধ ভূমানন্দ যেন রোমাঞ্চিত
> নিবিড় নিগূঢ়ভাবে পথশূন্য তোমার নির্জনে,
> নিষ্কলঙ্ক নীহারের অভ্রভেদী আত্মবিসর্জনে।
> তোমার সহস্র শৃঙ্গ বাহু তুলি কহিছে নীরবে
> ঋষির আশ্বাসবাণী, শুন শুন বিশ্বজন সবে,
> জেনেছি জেনেছি আমি। যে ওঁকার আনন্দ আলোতে
> উঠেছিল ভারতের বিরাট বক্ষ হতে

আদি-অন্ত বিহীনের অখণ্ড অমৃতলোক পানে,
সে আজি উঠেছে বাজি, গিরি, তব বিপুল পাষাণে।
একদিন এ ভারতে বনে বনে হোমাগ্নি আহুতি
ভাষাহারা মহাবার্তা প্রকাশিতে করেছে আকৃতি,
সেই বহ্নি বাণী আজি অচল প্রস্তর শিখারূপে
শৃঙ্গে শৃঙ্গে কোন্ মন্ত্র উচ্ছ্বসিছে মেঘ ধূম্রস্তূপে।"

আমাদের মন যখন এক সুদূরতায় উদাস হয়ে উঠেছে, রসভঙ্গকারী দলপতি বলে উঠলেন, "চলুন, এবার এগুনো যাক, আর দেরী করলে ভূজবাসা পৌঁছতে দেরী হয়ে যাবে"। বিকালের দিকে ঝড়, বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। পথ তো সবটাই চড়াই। সময়ও বেশী লাগবে। পথে কোথাও খেয়ে নিতে হবে। আমরা উঠে পড়লাম।

ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলি। গঙ্গোত্রীর নদীকূল থেকে পাকদণ্ডী অতিক্রম করে যে হাল্‌কা চড়াই শুরু হয়েছে তা ক্রমেই কঠিন হতে থাকে। পথ বন্ধুর। মাঝে ধস্ নেমে বন্ধ হবার উপক্রম। শের সিং ও কৃপাল সিং মাল নিয়ে আগে চলেছে। পরিমল ওদের বলে দিয়েছে যে পথের বিপজ্জনক অংশগুলি সম্বন্ধে যেন আগে থেকে আমাদের সতর্ক করে দেয়।

চলতে-চলতে ক্লান্ত লাগলে চীর ও পাইন গাছের ছায়াতলে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। কখনও বা ঝরনার মতো বয়ে-যাওয়া বরফগলা জল অঞ্জলিভরে পান করছি, বোতলে ভরে নিচ্ছি। এমনিভাবে ধীরগতিতে চলেছি চড়াই-পথে আমাদের লক্ষ্য গোমুখের দিকে।

চীরবাসা পৌঁছতে তখন সাড়ে-তিন মাইল বাকী। ডাইনে গভীর খাদের নিচে ভাগীরথীর উত্তাল তরঙ্গ। তার ওপারে দেবগড় গিরি ও তার শুভ্র তুষারাবৃত শৃঙ্গ। সেখান থেকে প্রশস্তভাবে নেমে এসেছে একটা বিরাট থালার মতো বরফের শয্যা। তার নিচু থেকে তিন-চারটি রুপালী জলের ধারা নেমে এসে পাহাড়ের মাঝে পাইন

গাছগুলির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে, আবার দেখা দিয়েছে নিচে এসে। আরও নেমে সবকটি ধারা একত্র হয়ে ঝরনার রূপ নিয়ে প্রচণ্ড বেগে এসে ভাগীরথীর বুকে মিলেছে। ভাগীরথী এখানে করালরূপিণী। তীব্র বেগে গর্জন করতে-করতে নিচের দিকে বয়ে চলেছেন। বিরাট থালার মতো দেখতে হিমবাহটি অতি সুন্দর। বরফের প্রশস্ত বক্ষের উপর উঁকিমারা অনাবৃত পাথরের অংশগুলি ধূসর রং-এর বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে। বরফের উপর সূর্যকিরণ ঠিকরে প'ড়ছে। খালিচোখে বেশীক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ ঝল্‌সে যায়। আমরা রৌদ্রকিরণ থেকে রক্ষা করার কালো চশমা পরে ও দুরবীন দিয়ে দেখছিলাম। পাহাড়ের চূড়া চিরতুষারাবৃত ও বৃক্ষহীন। তার নিচের ভাগের ঢালে চীর ও পাইন গাছের ঘনবন। হিমবাহটি একস্থানে অর্ধচন্দ্রাকৃতি। সব মিলিয়ে সৌন্দর্যের এক নন্দনকানন।

বেলা দুটোর সময় আমরা চীরবাসা পৌঁছলাম। গঙ্গোত্রী থেকে এর দূরত্ব আট মাইল। অনেকটা নিচে ভূর্জ গাছের আড়ালে নদীতীর থেকে অল্পদূরে দাঁড়িয়ে আছে সরকারী বন বিভাগের বিশ্রামবাস। আমরা এখানে নামব না। আরও তিন মাইল এগিয়ে যাব ভূজবাসা। এখানে বিশ্রামবাস রাস্তার অনেক নিচে, রান্না বা খাবার কোনো ব্যবস্থাও নেই। আমরা তাই এখানে বিশ্রাম করবার পরিকল্পনা ত্যাগ করেছি।

এই বিশ্রামাবাসটি ছাড়া চীরবাসায় আর কোনো কুটির দেখা যায় না, আশপাশে কোথাও জনমানবের চিহ্নও নেই।

চীরবাসায় পথের ধারে গাছের ছায়ায় এক-একখানা পাথরের উপর আমরা বসে পড়লাম খাবার জন্য। সবারই শরীর অবসন্ন। লালুবাবু তৃষ্ণায় কাতর। গৌরেন প্রচণ্ড মাথা ধ'রেছে, দুটো 'স্যারিডন' বড়ি খেয়েও তা সারেনি। শশাঙ্কবাবু রাস্তা থেকে একটু উপরে উঠে একখানা বড় পাথরের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন।

আমার ডান পায়ের মোজার গোড়ালিটা একেবারে ছিঁড়ে গিয়েছে। গোমুখ যাবার জন্য 'বাটা'র নূতন 'হাণ্টার' মার্কা জুতো আজ সকালে গঙ্গোত্রীতেই প্রথম পরেছি। ছেঁড়া মোজার সঙ্গে নূতন জুতো পরে এতটা চড়াই হাঁটছি, পায়ে ফোস্কা পড়ার উপক্রম, সাবধানে হাঁটতে হচ্ছে, ফলে দু' পা ব্যথায় টন্‌টন্‌ করছে। বাড়তি মোজাও নেই, তাই বেশ ভাবনায় পড়েছি। গোমুখের পথের দুর্গমতম চড়াই এখনও অতিক্রম করা বাকী। পরিমল ও রোহিতের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। ওরা একটু নিচে নেমে একটা ঝরনা থেকে সবার জলের বোতল ভর্তি করে আনল। কি শীতল আর কি মিষ্টি আস্বাদ। লালুবাবুর জিভ শুকিয়ে গেছে, ঢক্‌ঢক করে ওঁর বোতল শেষ করে বললেন আঃ, "My Kingdom For A Drop of water."

আমাদের খাবার একেবারেই শুকনো, যাকে বলে Dry Lunch. গঙ্গোত্রীর হালুয়াই দোকান থেকে আনা পকোড়া, ঝুড়িভাজা, বরফি সন্দেশ ও জিলিপি। তাই ভাগ করে দেওয়া হল। পরম-তৃপ্তিসহকারে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মতো খেতে লাগলাম। শশাঙ্কবাবু ও আমি পরিমলকে আগেই বলেছিলাম, খেয়ে অন্ততঃ পনের মিনিট 'পাদমেকং ন গচ্ছামি', পূর্ণ বিশ্রাম। ভরাপেটে চড়াই এ হাঁটলে অল্প হাঁটলেই বুকে চাপ পড়ার জন্য হাঁপ ধরবে। পাহাড়ী-পথে চলতে খালিপেটে চলা অনুচিত, অল্পতেই বমি-বমি ভাব, মাথাঘোরা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়। সারা শরীর অবসন্ন হয়ে আসে, বসে-পড়া-ছাড়া, উপায়ান্তর থাকে না। তেমনি আবার বেশী খেলে নানা অস্বস্তি, চলতে গেলে হাঁপ-ধরা ইত্যাদি। সুতরাং একবারে বেশী না খেয়ে বারে-বারে অল্প খাওয়াই সবদিক দিয়ে ভাল, পেট ঠাণ্ডা থাকে, চলতেও কষ্ট হয় না। গতবারে কেদারনাথ ও এবারে যমুনোত্রীর দুর্গম চড়াই হাঁটা-পথে চলতে আমরা এ নীতি অনুসরণ করেছি।

খাওয়া শেষ করে গাছতলায় বিশ্রাম করছি এমন সময় দেখি একদল তরুণী পর্বতাভিযাত্রীর বেশে পাহাড়ে ওঠার যন্ত্রপাতি ও

মালপত্র কাঁধে নিয়ে গোমুখের দিক থেকে নেমে আসছে। ওদের দলপতি চলেছেন সবার পিছনে। ওঁর সঙ্গে আলাপ করলাম। ভদ্রলোকের নাম ক্যাপ্টেন এল. পি. শর্মা। এ মেয়েরা উত্তরকাশীর শিক্ষানবিস অভিযাত্রী। ক্যাপ্টেন শর্মা ওঁদের নিয়ে গিয়েছিলেন গোমুখে শিবির স্থাপনের সব বন্দোবস্ত করতে। তাঁবু খাটান ও আনুষঙ্গিক কাজ শেষ করে ফিরে চলেছেন ওঁদের চীরবাসা শিবিরে। সেখানে সরকারী বিশ্রামাবাস দখল করা ছাড়াও মুক্ত প্রাঙ্গণে নিজেদের তাঁবু খাটিয়েছেন। আজ রাত্রে ওখানে বিশ্রাম নিয়ে কাল ভোরবেলায় তল্পি-তল্পা গুটিয়ে ওঁরা গোমুখ রওনা হবেন। সেখান থেকে গঙ্গোত্রী হিমবাহ অনুসরণ করে আরও আগে।

ক্যাপ্টেন শর্মা চীরবাসা বিশ্রামাবাসের পথে নেমে গেলেন। আমরাও রওনা হলাম ভূজবাসার পথে। এখান থেকে তিন মাইল, কিন্তু পথে আছে বিপদসঙ্কুল ঝরনা ও ঝুরো পাহাড়।

সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছি। একটু এগিয়েই যে বড় ঝরনাটা পেলাম তাতে বেশ জল ও প্রচণ্ড স্রোত, দু পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে প্রবলবেগে নেমে আসছে। জলের উপরে বড়-বড় পাথর। শের সিং বেছে-বেছে পাথর খুঁজে তার উপর দিয়ে পার হল। তারপর এক-এক করে আমাদের পার হতে সাহায্য করল। পায়ের তলার পাথর উল্টে গেলেই 'পপাত ঝরনা জলে'। সেখান থেকে স্রোতের টানে একেবারে ভাগীরথীর কোলে মোক্ষলাভ। অতি সাবধানে পার হলাম। ঝরনার ওপারে ধস্ নেমে পথ নিশ্চিহ্ন। প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট উপরে রাস্তা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সে পর্যন্ত উঠব কি করে? এবারেও শের সিং সমস্যার সমাধান করল। কয়েকটা গুল্মলতার গুঁড়ি ধরে আর ঝুরো মাটিতে লাঠি ঠুকে-ঠুকে সে উপরে উঠে গেল। তারপর ধীরে-ধীরে নেমে এসে এক এক-করে আমাদের টেনে তুলল। এক হাতে গাছের গুঁড়ি ধরেছি, অন্য হাত শের সিং-এর হাতেধরা, পায়ে বাটার নূতন হাণ্টার জুতো; তার তলার রবার-

সোল পা পিছলে যাওয়া থেকে বিশেষভাবে রক্ষা করছে। সাধারণ কেডস্ জুতোর তলা দেহের ভারসাম্য রাখতে পারত না। এ ভাবে ধীরে-ধীরে আধা হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলাম। পরিমল ও রোহিত অবশ্য বাহাদুরি দেখিয়ে নিজেরাই উঠে এল। সকলে নিরাপদে উঠে এলে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। ভয়জনিত উত্তেজনায় সমস্ত শরীর তখনও কাঁপছে, পথের ধারে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম।

শের সিং তাড়া দিল, সামনে ঝুরো পাহাড়, সেও সাবধানে অতিক্রম করতে হবে, অতএব মিনিট দুই বিশ্রাম করেই উঠে পড়তে হল।

কিছুদূর চলার পরেই দেখা দিল সেই 'গিলা' বা ঝুরঝুরে বালি পথের পাহাড়। শের সিং ও কৃপাল সিং আমাদের আগে-আগে চলেছে। ওরা হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, "শেঠ, হুঁশিয়ার, উপর সে পাত্থর গির্ রহা, রোক যানা।" উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, সমূহ সর্বনাশ। পাহাড়ের উপর থেকে বিরাটাকৃতি সব পাথর তীরবেগে নিচে এসে খাদে গড়িয়ে পড়ছে। সেই সঙ্গে বইছে হাওয়া। আশপাশ তাই ধূলোয় ঢাকা, সামনের কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ধূলো-বালির ভয়ে চোখ্ বন্ধ করে পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছি।

প্রায় পাঁচ ছ' মিনিট পরে প্রকৃতির তাণ্ডব লীলা শান্ত হল। শের সিং ও কৃপাল সিং বলল ওরা একজন আগে যাবে, একজন থাকবে আমাদের সবার পিছনে। সামনের জন কিছুটা গিয়ে রুমাল নেড়ে নিশানা দিলে আমরা এক-এক করে এগুব। ওপরে বা নিচের দিকে একদম তাকাব না। দৃষ্টি থাকবে সোজামুখে। এভাবে সমস্ত ঝুরো পাহাড়টার গা কেটে তৈরী রাস্তা পার হতে হবে।

"তথাস্তু" বলে আমরা তৈরী হলাম। তখন কি জানি আর এক ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হতে চলেছি। শের সিং আগে চলল। পিছনে রইল কৃপাল সিং। এভাবে বিপজ্জনক পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। পরিমল, রোহিত ও শশাঙ্কবাবু আমার আগে। হঠাৎ

পরিমলের চিৎকার শুনতে পেলাম "ডাক্তারবাবু, এখুনি বসে পড়ুন, পাথর গড়াচ্ছে।" আমি যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঙ্গে-সঙ্গেই উপুড় হয়ে রাস্তার উপর শুয়ে পড়লাম। মুহূর্তের মধ্যে আমার মাথার উপর দিয়ে এক বিরাট প্রস্তরখণ্ড উল্কাপিণ্ডের বেগে ডানদিকের খাদে গড়িয়ে পড়ল, আর একটা ছোট পাথর আমার বাঁ হাত আঘাত করে নিচে পড়ল। আমি চোখ বন্ধ করে রুদ্ধনিঃশ্বাসে ইষ্ট দেবতাকে শরণ করছি। ভয়ার্ত হৃৎপিণ্ডের ধক্‌ধক্ শব্দ নিজেই শুনতে পাচ্ছি। ওঠার সাহস নেই। আবার যদি পাথর গড়িয়ে পড়ে। একটু পরে চিৎকার করে পরিমল বলল "এবার চলে আসুন, পাথরপড়া বন্ধ হয়েছে। আমি তখন উঠে গায়ের ধূলো ঝেড়ে চলতে শুরু করলাম। পিছনে লালুবাবু, গৌর ও কৃপাল সিং। 'উঃ, জোর ফাঁড়া কাটল'। সমস্বরে বলে উঠলেন লালুবাবু ও গৌর।

শের সিং তাড়া দিল। দুপুর গড়িয়ে যত বিকালের দিক যাবে, আবহাওয়া ক্রমশঃ খারাপ হবার সম্ভাবনা। মেঘ, ঝড় বৃষ্টি ও আঁধি একবার শুরু হলে পথচলা দায় হবে। এ পথে বেলা দুটোর মধ্যেই দিনের পরিক্রমা শেষ করে কোন কুটিয়া বা চটিতে আশ্রয় নিতে হয়। সৌভাগ্যবশতঃ গঙ্গোত্রী থেকে আমরা এতক্ষণ নির্মল আকাশকে মাথার উপর রেখে অনুকূল আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে এসেছি।

সাবধানে ধীরে-ধীরে ঝুরো পাহাড় এলাকা পার হলাম। উপর থেকে পড়া বড় ও মাটি মেশান ঝুরো পাথর বহু স্থানে সঙ্কীর্ণ রাস্তা রুদ্ধ করে দিয়েছে। আমরা লাঠির সাহায্যে পাহাড়ের দিকে ঘেঁষে বা পাথর সরিয়ে রাস্তা পার হচ্ছি। যত এগুচ্ছি, গাছ ও গুল্মলতা শেষ হয়ে গিয়ে একেবারে শুষ্ক পাহাড়ের রাজ্য দেখা দিচ্ছে।

ডান পাশের খাদের বহু নিচু দিয়ে বয়ে চলেছেন খরস্রোতা গেরুয়াবসনা ভাগীরথী। বড়-বড় পাথর পার হয়ে একের-পর-এক বাঁক অতিক্রম করে দুই গিরিশ্রেণীর মধ্যদিয়ে তিনি মুক্তধারায় প্রবাহিণী। গোমুখের হিমবান উৎস থেকে নির্গত হয়ে কত গিরি

প্রান্তর অতিক্রম করে চলেছেন সাগর-সঙ্গম অভিলাষে। দেখতে পাচ্ছি যেন পুণ্যশ্লোক নৃপতি ভগীরথ মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়ে মর্তের পথ দেখিয়ে দিয়ে চলেছেন পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবীকে।

কল্পনায় ছেদ্ টানতে হল। যতশীঘ্র সম্ভব ভূজবাসাতে পৌঁছতে হবে। সেখানে আজ রাতের আশ্রয় লালবিহারী বাবার আশ্রম। শের সিং ও কৃপাল সিং আমাদের নিরাপদ এলাকায় এনে দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে আশ্রমের উদ্দেশ্যে।

কিছুটা এগিয়ে রাস্তা থেকে অনেক নিচে কয়েকটা ছোট-ছোট কুটিয়া চোখে পড়ল। এতদূর থেকে মনে হচ্ছে যেন খেলাঘরের কুটির। এ নিশ্চয় লালবিহারী বাবার আশ্রম। "গঙ্গা মাঈ কি জয়" আমরা সমস্বরে ধ্বনি দিয়ে উঠলাম। ক্লান্ত শরীরে যেন নূতন করে শক্তির জোয়ার এল।

পথ আগের তুলনায় অনেকটা নিরাপদ ও প্রশস্তও বটে। ছোট-বড় শক্ত পাথর দিয়ে বাঁধান। চলতে একটু কষ্ট হলেও নিচে গড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা নেই। দূরবীন দিয়ে সমতলের কুটির ও তার সংলগ্ন প্রশস্ত অঙ্গন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। শশাঙ্কবাবু অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন। এবার দেখলাম উনি পথ ছেড়ে পাহাড়ের ঢাল দিয়ে নিচে নামতে শুরু করেছেন। ঢালের শেষেই লালবিহারী বাবার আশ্রম— আমাদের আজকের রাতের নীড়।

আমরাও অল্প পরেই নিচে নেমে আশ্রম-প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছলাম, বেলা তখন চারটে। পায়ে ব্যথা, অবসন্ন শরীর যেন আর নিজের ভার বইতে পারছে না। শের সিংরা ইতিমধ্যেই পৌঁছে বাবার আশ্রম থেকে অন্নপ্রসাদ পেয়ে গিয়েছে। আঙ্গিনার এক কোণে রাখা নিজের হোল্ড অলের উপর বসে পড়লাম। ডানদিকে সামান্য দূর দিয়ে পুণ্য প্রবাহিণী ভাগীরথী। উদার উন্মুক্ত আকাশের নিচে বসে পঙ্কিলতামুক্ত বাতাস বুকভরে গ্রহণ করে এতক্ষণ শান্তির নিশ্বাস ফেললাম।

আশ্রমটিকে একটি মাঝারি গোছের বাড়ী বলা যায়। মাটির দেয়াল, উপরে তার টিনের ছাদ। ভিতরে ঢোকার নিচু দরজা। তার ডান পাশে পরিচ্ছন্ন একটি পূজা মঞ্চ। সেখানে লালবাবার গুরুদেবের ছবি। তার নিচে বাক্সাকৃতি একটি দানপাত্র।

আঙ্গিনার অন্যপ্রান্তে একটা কুটিরের দেওয়াল ঘেঁষে ছুটো বিরাট উনুন, তাতে জংলী কাঠ জ্বলছে। তার উপর বিরাট তামার হাঁড়ি চড়ানো, যাতে ফুটছে নানা গাছ পাতা ও মস্‌লা দেওয়া চা। অন্য উনুনটাতে ভাত।

এমন সময় দেখলাম এক দীর্ঘদেহী সন্ন্যাসীকে। জটাজূটধারী সৌম্যমূর্তি। সারা মুখে প্রশান্তির দিব্যত্যুতি। নগ্ন গাত্রে কম্বলমাত্র আচ্ছাদন। কপালে লম্বা তিলক, চোখে পুরু লেন্‌সের চশমা, পরনে কৌপিন ও পায়ে হাওয়াই চটি। জিজ্ঞাসা করলাম লালবাবার দর্শন কোথায় পাব। তিনি একটু হেসে ভাঙ্গা গলায় বললেন, "বেটা, হামি লালবাবা, তু লোক আভি পৌঁছা। আঙ্গিনাসে থালি উঠা লে। হামার সাথ চল্‌, গঙ্গা মাঈকি প্রসাদ খা লে।" পাশে অনেকগুলি পিতলের থালা ও এ্যালুমিনিয়মের গেলাশ রয়েছে দেখলাম। আমরা একটা করে নিয়ে উনুনের ধারে বসে গেলাম। লালবাবা নিজেই উনুনে চড়ান বিরাট হাড়ি থেকে ভাত ও ডাল ঢেলে দিলেন। যারা আগে পৌঁছে অন্নপ্রসাদ পেয়েছেন তাঁরা এখন গেলাশ এনে চায়ের জন্য বসে গেলেন। এ দলে শশাঙ্কবাবুও রয়েছেন। উনি আমাদের আগে পৌঁছে ইতিমধ্যে অন্নপ্রসাদ পেয়েছেন। প্রসন্ন হাস্যে বাবা সবাইকে আহ্বান করে জংলী পাতা, বনতুলসী ও অন্য কি সব দিয়ে তৈরী স্পেশাল চা দিচ্ছেন। অন্নপ্রসাদের পরে আমরাও এক গেলাশ করে পেলাম। মিষ্টি ও ঝাল আস্বাদের সঙ্গে কেমন একটা সুন্দর গন্ধ পাচ্ছি। খুব তৃপ্তি করে খেলাম।

চা বিতরণ হয়ে গেলে বাবা আমাদের ছ' জনের থাকবার মতো একটা ঘর নিজেই দেখাতে নিয়ে চললেন—সে ঘর। নিচু দরজা

দিয়ে মাথা নিচু করে ঢুকে পৌঁছলাম একটা বড় হল ঘরে। সেখানে দশ-বার জন যাত্রী রয়েছেন। তার বাঁ পাশে একটা ঘর আমাদের জন্য নির্দিষ্ট হল। ঘরটা বেশ বড়, এক পাশে একটু উঁচু-করা কাঠের পাটাতনের নিচে কম্বল ও চাল ডাল রাখার ভাঁড়ার। বাকী অংশটুকু কৃপাল সিং ও শের সিংকে দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে আমরা যে যার নিজেদের বিছানা পেতে ফেললাম।

ভূজবাসাতে রাত্রিবাসের একমাত্র নিরাপদ আশ্রয় লালবাবার এই আশ্রম। সদা হাস্যময় কর্মযোগী এই সাধক, নিজেকে পরিপূর্ণ-ভাবে যাত্রীদের সেবাব্রতে উৎসর্গ করেছেন। ব্রহ্মমুহূর্তে শয্যা-ত্যাগের পর শুরু হয় তাঁর উপাসনা, আর দিনের আলো ফুটে ওঠবার আগেই তাঁর সেবাব্রতের আরম্ভ। ভোর না হতেই শিষ্যরা (মাত্র তিন-চারজন দেখেছি) উনানে চায়ের জল চড়ান। বাবা নিজ হাতে চা তৈরী করতে বসে যান। দুরন্ত শীত, অধিকাংশ প্রভাতই গভীর কুয়াশাচ্ছন্ন। তার মধ্যে একখানা কম্বল মাত্র সম্বল করে তিনি চা করতে বসে যান। যাত্রীরা এক-একটি গেলাশ নিয়ে আসে। বাবা ছাঁকা চা ঢেলে দেন। বিকাল বেলায় ঐ একই ব্যবস্থা।

দুপুর ও রাতের খাবার ভাত, রুটি ও ডাল। নিতান্ত সাধাসিধা ভোজ। কেউ শরীর খারাপ ও ঠাণ্ডার দোহাই দিয়ে পার পায় না। অনুরোধ, উপরোধ ও প্রয়োজনে রাগ দেখিয়ে সকলকেই খাওয়ান। বলেন, এ হল দেবতার প্রসাদ। না খেলে পাহাড়ী-পথে চলবে কি করে?

এই লালবাবার রাজস্থানের শরীর। বয়স এখন ৪৩ বৎসর। গ্রীষ্মকালে মে-জুন ও শীতকালে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে যাত্রীরা গোমুখ আসা-যাওয়া করে। এ ক' মাস অনলস আত্মসুখ-উদাসীন এই সাধু ব্রহ্মসাধনার একাগ্রতায় অহোরাত্র গোমুখ যাত্রীদের সেবা করে থাকেন। মঞ্চে রাখা দানপাত্রে কেউ কিছু দিল কি-না-দিল

সে সম্বন্ধে উনি উদাসীন। দরিদ্র যাত্রী বা তাঁদের মাল বয়ে আনা কুলিরা যে কিছু দিতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। গোমুখ যাত্রীর চোখে, আমাদের শাস্ত্রে যাঁকে 'সমদর্শী' বলা হয়েছে—লালবাবা তাই। ধনী-নির্ধনে কোনো বৈষম্য তাঁর আচরণে বিন্দুমাত্র নেই। পরিমলের প্রশ্নের উত্তরে বললেন একটি পর্ণকুটির আকারে এ আশ্রম স্থাপনা করা হয়। তখন মাটির দেওয়ালের উপর খড়ের চাল ছিল। সেই চালে আগুন লেগে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। তারপর জনসাধারণের দানকরা অর্থ দিয়ে উনি বর্তমান আশ্রম গড়ে তুলেছেন। কলকাতার শ্রীকমলকুমার গুহ মশাই (শঙ্কু মহারাজ) নাকি এ জন্য অনেক অর্থ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। চাল, আটা, কেরোসিন তেল—সবই সুদূর উত্তরকাশী থেকে লোকের মাথায় করে আনাতে হয়। লালবাবা আরও বললেন ওঁর গুরু গঙ্গোত্রী অঞ্চলের মহাযোগী বিষ্ণুদাস দেহরক্ষা করবার সময় ওঁকে আদেশ করে গেছেন এ ভাবে যাত্রীদের সেবা করতে।

লালবাবা প্রতিবছর গঙ্গাসাগর মেলায় তীর্থ করতে যান। ফেরার পথে কলকাতাতে কিছু দিন থাকেন। আশ্রমের জন্য কেউ কিছু সাহায্য করলে গ্রহণ করেন।

এই সদাহাস্যময় নিরলস সেবাব্রতী সাধুকে শ্রদ্ধা বনত চিত্তে প্রণাম জানালাম।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥"

এ উক্তির সার্থকতা উপলব্ধি করি ওঁর সেবাব্রত দেখে।

রাত পোহালেই আমাদের যাত্রা শুরু হবে গোমুখের-পথে—যার মাত্র আড়াই মাইল দূরত্বে। শুনলাম কলকাতার চারটি ছেলে এখানে

পৌঁছে মালপত্র রেখে গোমুখ দেখতে গেছে। সন্ধ্যার পর ফিরে রাত্রে এখানে থাকবে।

বাইরের আঙ্গিনা পার হয়ে নদীর দিকে চলি। জংলী কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা আশ্রমের সীমানা। বাবার শিষ্য ও যাত্রীদের মাল বয়ে আনা কুলিরা জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ এনে উনুন জ্বালায়। কখনও আবার রাত্রে আশ্রমের বাইরে আগুন জ্বেলে রাখে ভালুকের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য।

এগুতে-এগুতে আমরা নদীতীরে গিয়ে দাঁড়াই। সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখা যায় তুষারাচ্ছন্ন শতপন্থ পর্বত উন্নতশিরে দণ্ডায়মান। তার ডানদিকে দেখা যাচ্ছে তুষারকিরীটীশালী শিবলিঙ্গ পর্বত। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি তার তিনটি থাম্বা। তু পাশের তুটি খর্বাকৃতি, মাঝেরটি লম্বা। ঢেউ-খেলান অংশ দিয়ে পরস্পরের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নতা বর্তমান, যেন তিনটি শিবলিঙ্গ একে অপরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে দাঁড়িয়ে আছে। শের সিং আমাদের সঙ্গে ছিল। শতপন্থ পর্বতের নিম্নদেশ দেখিয়ে সে বলল ওরই পাদদেশে ভাগীরথীর উৎস গোমুখ। একটা মাঝারি আকারের পাহাড় দেওয়ালের মতো পশ্চিমের পাহাড় থেকে আড়াআড়িভাবে নদীর দিকে নেমে এসে দৃষ্টিপথ থেকে গোমুখকে আড়াল করে রেখেছে। গোমুখ এখান থেকে মাত্র আড়াই মাইল দূরে হলেও পথ তুর্গম।

নদীর ও পারে পাহাড়ের কোলে গদ্দীদের মেষচারণ ভূমি। দিনের শেষে গোধূলি লগনে মেষগুলিকে একত্র করে ওরা নিজ কুটিরের দিকে নিয়ে চলেছে।

সন্ধ্যা সমাসন্ন। তীব্র শীত আর হিমেল হাওয়ার দাপটে সারা অঙ্গ শীতবস্ত্রে আবৃত থাকা সত্ত্বেও হাড়সুদ্ধ কেঁপে উঠছে। শের সিং তাড়া দিয়ে বলল সন্ধ্যা হয়েছে। এ সময় এদিকে থাকা

বিপজ্জনক। যে কোন সময় ভাল্লুক দেখা দিতে পারে। অতএব এখুনি ফিরে যেতে হবে। ওর উপদেশ অমান্য না করে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আশ্রমে ফিরে এলাম।

আশ্রমের হলঘর তখন রম্‌রম্‌ করছে। সবাই পৌঁছে গিয়েছেন —কেউ গঙ্গোত্রী থেকে, কেউ বা গোমুখ দেখে। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা কুণ্ডাকৃতি গর্ত। সেখানে অল্প কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালান হয়েছে, ঘর গরম রাখবার জন্য।

মেয়েদের মহল আলাদা। সেখানেও ক'জন যাত্রীণী এসেছেন শুনলাম।

হলঘরের যাত্রীরা তখন বেশ সুর করে শিবস্তোত্র পাঠ করছেন। নিজের ঘরে গিয়ে আমরা কম্বলের তলায় আশ্রয় নিলাম। পরিমল, রোহিত ও গৌর তো কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েই পড়ল। বাইরে তুহিন-শীতল হাওয়া। ঘরের ভিতরে কিছুটা গরম। ওরা বলল এবার টানা ঘুম দেব। আর এক কাপ চা পেলে বেশ হত।

লালুবাবু একটু পরে লোটা নিয়ে উঠে গেলেন, বললেন মাঠে যেতে হবে। পরিমল বলে উঠল, "ওরে বাবা এই ঠাণ্ডার মধ্যে মাঠে জমে যাবেন যে। আমারও তো মাঠ পাচ্ছিল তা এখন মাথায় উঠে গিয়েছে"। সকলে হেসে উঠলাম।

মিনিট পাঁচেক বাদে লালুবাবু ছুটতে-ছুটতে এসে বললেন "সবাই, এখুনি বাইরে চলুন, একটা অদ্ভুত জিনিস দেখবেন, দেরী করলে কিন্তু পস্তাতে হবে।" সকলে বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম, আর 'কি হেরিলাম নয়ন মেলে'। শুভ্র তুষারাচ্ছন্ন ভগীরথ, শতপন্থ ও শিবলিঙ্গ গিরিশ্রেণী অতন্দ্র প্রহরীর মতো উত্তরে সমাসীন। তার উপর শুক্লা ত্রয়োদশীর চন্দ্রিমা প্রতিফলিত হয়ে যে স্নিগ্ধ কিরণ ছড়িয়ে দিয়েছে তা বর্ণনা করতে কবির ভাষাও স্তব্ধ হয়ে যায়। শুভ্র তুষারের গা থেকে যেন পাতলা পেঁজা তুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা যেন বাতাসের সঙ্গে মন্দগতিতে ভেসে চলেছে।

নির্বাক বিস্ময়ে আকণ্ঠ এই সৌন্দর্যে পান করি। তবুও রূপতৃষা তো মেটে না। মনে হয় মন্ত্রবলে জ্যোৎস্না নিশীথে বুঝি বা কোনো দেব-লোকে এসে গিয়েছি। মাটির পৃথিবীতে কি এরূপ সুধা সম্ভব? মুগ্ধ লালুবাবু গুনগুন করে গাইছিলেন—

"গায়ে আমার পুলক লাগে চোখে ঘনায় ঘোর
হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে রাঙা রাখীর ডোর।"

ঘোর কাটল পরিমলের ডাকে—"ঘরে চলুন, লালবাবা খাবার নিয়ে চলেছেন।"

ঘরে ফিরে এলাম। লালবাবা তখন হলঘরে সকলের থালায় রুটি ও ডাল দিচ্ছেন ও জোর করে পেট ভরে খাওয়াচ্ছেন। আমরাও থালা গেলাশ নিয়ে বসে গেলাম। খেতে-খেতে এক ফাঁকে ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কাল সকালে আকাশ পরিষ্কার থাকবে তো, আমরা ভাল করে গোমুখ দেখতে পাব তো?" উনি একটু হেসে উত্তর দিলেন, "বেটা, কাল সকালে আকাশ কেমন থাকবে তা কি আজ রাতে বলা যায়?" সত্যি, এখানকার আবহাওয়া সদা অনিশ্চিত।

খাওয়া শেষ করে যে যার থালা গেলাশ ধুয়ে সেগুলি যথাস্থানে রেখে কম্বলের তলায় এসে শুয়ে পড়লাম।

একটু পরেই কম্বলের ভিতর থেকে পরিমল, রোহিত ও গৌরের নাসিকাগর্জন শুরু হল। শশাঙ্কবাবুর একটু নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছিল। আমিও লেপ মুড়ি দিয়ে তা অনুভব করলাম। বুঝলাম সমুদ্র-তীর থেকে অতি উচ্চতার হেতু বাতাসে অক্সিজেনের স্বল্পতাই এর কারণ। আমরা এখন সমুদ্রতীর থেকে ১২,৫০০ ফুট উপরে উঠে এসেছি। এ আবহাওয়াতে অনভ্যস্ত, তাই একটু কষ্ট হবেই। হলঘরের সহ-যাত্রীদের কুণ্ডের আগুন নিভিয়ে দিতে অনুরোধ করেছি। অবশ্য ঘরে বায়ু চলাচলের জন্য ছাদের মধ্যে ফুটো আছে।

আমি আর লালুবাবু পাশাপাশি শুয়েছি। পূর্ব ব্যবস্থা পরিবর্তন করে এখন ঠিক হয়েছে আমরা কাল ভোরে উঠেই গোমুখ দর্শনে

বেরিয়ে পড়ব। সেখান থেকে সোজা নেমে যাব গঙ্গোত্রী। ভূজবাসা ফিরে এসে আর এক রাত্রি বাস করব না। এতটা পথ একদিনে হাঁটতে পারব কি না সন্দেহ প্রকাশ করাতে দলের তরুণ বন্ধুরা আশ্বাস দিলেন "সবাই এক সঙ্গে চলেছি। দরকার হলে একে অন্যর হাত ধরে নিয়ে যাব, ভয়ের কি আছে?" আমি আর আপত্তি না করে ওদের প্রস্তাব মেনে নিয়েছি। কাল খুব ভোরে উঠতে হবে। হে মা গঙ্গা তোমার উৎস-দর্শন-যাত্রা যেন আমাদের নির্বিঘ্নে হয়—এই প্রার্থনা জানিয়ে ঘুমের কোলে নিজেকে সঁপে দিলাম।

"উঠে পড়ুন, ভোর হয়ে আসছে।" লালুবাবুর যথারীতি নকীবী ডাক। আহা বড় সুন্দর স্বপ্ন দেখছিলাম। তুষারাবৃত পথের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছি, পথ দেখিয়ে চলেছেন এক দিব্যকান্তি সন্ন্যাসী। চলতে-চলতে আমরা যেন রং-বেরং-এর ফুলে সাজানো বিরাট প্রাঙ্গণে পৌঁছলাম। বিমুগ্ধ হয়ে শোভা দেখছি। সন্ন্যাসী বল্ছেন, "বেটা, এ হল তপোবন, ব্রহ্মলোকের তপোবন। আমরা মর্ত্য ছেড়ে এসেছি।"

এমন সময় লালুবাবুর ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল—

"স্বপন যদি মধুর এমন
হোক সে মিছে কল্পনা,
জাগাও না আমায় জাগাও না!"

লালুবাবু তাড়া দিলেন। অন্য সঙ্গীরা উঠে পড়েছেন এমন কি নিদ্রাবিলাসী শশাঙ্কবাবুও। আমরা বিছানা-পত্র বেঁধে এখানেই রেখে যাব। কুলিরা আমাদের গাইড হয়ে গোমুখ নিয়ে যাবে। সেখান থেকে ফেরার পথে আশ্রমে নেমে এসে ওরা মালপত্র নিয়ে গঙ্গোত্রীর পথ ধরবে। আমরা গোমুখ দেখে সোজা গঙ্গোত্রী রওনা হব। আশ্রমে আর নামব না।

ঘড়িতে দেখি পাঁচটা বেজেছে। মুখ হাত ধুতে বাইরে এলাম। চরাচর অন্ধকারসমাচ্ছন্ন। আকাশ ঘন কুয়াশায় ঢাকা। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। সেই সঙ্গে চলছে দুরন্ত ঠাণ্ডা হাওয়ার দাপট।

হায়, তবে কি আমাদের আজ গোমুখ দেখা হবে না? যা হক, ঘরে এসে তৈরী হয়ে আবার বাইরে এলাম। শের সিং, কৃপাল সিংও তৈরী হয়ে এসেছে। ওরা আশ্বাস দিল, চেনাপথ, কুয়াশার মধ্য দিয়েও এগোনো যাবে। অল্প পরে ধীরে-ধীরে কুয়াশা কেটে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

আশ্রম প্রাঙ্গণের উনুনে চায়ের হাঁড়ি চড়েছে। লালবাবা তার পাশে বসে চা করছেন। আমরা প্রণাম করে বিদায় চাইলাম। গোমুখ দেখে সোজা গঙ্গোত্রী নেমে যাব শুনে বললেন তাহলে তো সারাদিন খাওয়া হবে না। আমরা জানালাম সঙ্গে শুকনো খাবার আছে তা দিয়েই একটা বেলা কেটে যাবে, কোন কষ্ট হবে না। ওঁর কথায় অবশ্য তখনি চা খেয়ে নিতে হল। শশাঙ্কবাবু আমাদের জন্য অপেক্ষা করেননি, একাই বেরিয়ে গেছেন।

আশ্রম থেকে পাকদণ্ডী পথ দিয়ে উঠতে-উঠতে আমরা মূল রাস্তায় পড়ে পরমানন্দে এগিয়ে চললাম লক্ষ্য পথ গোমুখের দিকে।

দীর্ঘদিনের বাসনা আজ চরিতার্থতার পথে। অতুলশক্তি নিয়ে এগিয়ে চলেছি।

বৃক্ষলতাহীন অনুর্বর দেশ। বড়-বড় উপলখণ্ডের উপর দিয়ে পথ। দেড়শো, দু'শো ফুট দূরে-দূরে দু'-ধারে একটা-একটা পাথরের গায়ে সাদা রং মাখা গোল-গোল ছোপ। এর মধ্য দিয়ে চলতে হবে। সাদা রং-এর পাথরই পথের নিশানা দেখাচ্ছে। এর বাইরে গেলে হিমালয়ের গিরি কন্দরে কোথায় ঘুরে মরতে হবে কে জানে! আমরা তাই খুব ধীরে-ধীরে শের সিং ও কৃপাল সিংকে অনুসরণ করে পথের নিশানা ঠিক রেখে চলেছি।

কুয়াশা প্রায় কেটে গিয়েছে, যেটুকু আছে তার আবরণ পাতলা। নীল আকাশের ফাঁকে ফাঁকে হালকা মেঘের টুকরোগুলি বলাকার মতো উড়ে যাচ্ছে। পূবে অরুণিমা। থরে-থরে হিমবাহের তুষারস্তূপ সামনের আকাশে উঠে গিয়েছে। দুর্গম হিমরাজ্যের মধ্য দিয়ে

চলেছি। তিন দিক ঘিরে শুভ্র তুষারশৃঙ্গগুলি। সামনে চিরতুষারাচ্ছন্ন ভগীরথ, মাঝে শতোপন্থ ও আমাদের ডানদিকে মহিমাময় শিবলিঙ্গ-শিখর। তার সবটা দৃষ্টিগোচর নয়। এদের পদতলে গোমুখের তুষারগহ্বর-গঙ্গার উৎস, আমাদের চিরঈপ্সিত গন্তব্যস্থল।

একটু পরেই সুদর্শনশৃঙ্গের পিছনে সূর্যদেবকে উদয়ের-পথে দেখা গেল। তাঁর রশ্মিছটায় প্রথমেই আলোকিত হয়ে ওঠে তুষার-কিরীটী মণ্ডিত শিবলিঙ্গ শিখর। ধ্যানমৌন উমা মহেশ্বরের স্থান যে সবার উর্ধ্বে। দিনের পরিক্রমার প্রারম্ভে সূর্যদেব তাঁর প্রথম প্রণতি জানান মহেশ্বরকে। তারপর ধীরে-ধীরে তাঁর রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে তুষারমণ্ডিত অন্যান্য শৃঙ্গগুলির উপর।

আমরা পাথরের উপর বসে নিবিড় মগ্নতায় প্রকৃতির এই অবগুণ্ঠন উন্মোচনের দৃশ্য দর্শন করি।

শের সিং তাড়া দেয়। তখন উঠে আবার চলতে শুরু করি।

চলেছি পরম পবিত্র গোমুখ তীর্থে—ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে। পুণ্যসলিলা ভাগীরথী সেখান থেকে মর্ত্যে অবতরণ করে অরণ্য, গিরিপ্রান্তর অতিক্রম করে চলেছেন সাগরসঙ্গমে।

আশেপাশে বৃক্ষলতার চিহ্নমাত্র নেই। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল রুক্ষ পর্বতশ্রেণী, চূড়া তার তুষারাচ্ছন্ন।

কিছুদূর চড়াই অতিক্রম করে একটা বাঁকের মুখে এসে দাঁড়ালাম। শের সিং সামনে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, শেঠ, ঐ দেখুন গোমুখ।

সম্মুখে যে পাথরের স্তূপ প্রাচীরের আকারে আড়াআড়িভাবে পশ্চিম থেকে পুবে নেমে নদীর কূল পর্যন্ত গিয়েছে তা এতক্ষণ গোমুখকে আমাদের দৃষ্টি পথের আড়ালে রেখেছিল। তাকে বাঁদিকে রেখে আমাদের রাস্তা ঘুরেছে। এবার তাই গোমুখকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আনন্দ ও উত্তেজনায় সকলে চীৎকার করে উঠলাম। "গোমুখ এসে গিয়েছে, জোর কদমে এগিয়ে চল।"

ঘন নীলবর্ণের প্রশস্ত দেওয়াল নিয়ে তোরণের আকারে দণ্ডায়মান তুষার প্রাচীর ও তার শিখরদেশ। বরফের দেওয়াল থেকে অবিরাম চুঁয়ে চুঁয়ে জল ঝরছে। তোরণ থেকে খিলানের আকারে নেমে গিয়েছে বিশাল বরফের গুহা—গোমুখাকৃতি সে গুহামুখ। মনে হয় যেন কারুর বিরাট মুখব্যাদান। বরফের অংশ খিলানের আকারে গুহার পিঠের মাঝখান পর্যন্ত নেমে এসেছে। তারপর খাড়াভাবে নেমে গেছে আর একটা বরফের প্রশস্ত ডালা। তার নিচে দুই কোণ দিয়ে হিমবাহনিঃসৃত ধূসর জলের ধারা প্রচণ্ড স্রোতে ফোয়ারার রূপ নিয়ে অবিরাম নির্গত হচ্ছে। দুরন্তবেগে জলের ধারা গোমুখাকৃতি এই বিবর থেকে মর্ত্যে নেমেছে।

আমরা নদীর এ পারে কয়েকটি বড় পাথরের মাথায় বসে পলকহীন নেত্রে প্রকৃতির এই অপরূপ লীলার দিকে তাকিয়ে থাকি। গঙ্গোত্রী হিমবাহের পশ্চিম প্রান্তের তুষারস্তূপ স্তরে-স্তরে প্রসারিত তারই নিম্নাংশের প্রকাণ্ড বিবর 'গোমুখ'। চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট উঁচু, ফুট ত্রিশ চওড়া, গভীর কত কে জানে। ভিতরে তার ঘন অন্ধকার।

প্রকৃতির কি অদ্ভুত লীলা। গোমুখের বিরাট গুহা থেকে কিছুক্ষণ পর-পরই বিশাল আকারের এক একটা তুষারস্তূপ ভেঙে নিচে পড়ে কামান গর্জনের মতো ভয়াবহ শব্দে নদীর বুকে আছড়ে পড়ছে। সেই শব্দে চারিদিক কেঁপে উঠছে। চোখের সামনে সাত-আটবার এরকম তুষার-খণ্ড-পতন দেখলাম। আমাদের নিয়ে বসে থাকা পাথরগুলিও সে সময় ভীষণভাবে কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। পিছনদিকে অনেক উপরে একটা প্রকাণ্ড আল্‌গা পাথর দেখিয়ে শের সিং বল্‌ল, বরফ ভেঙে পড়বার সময় ও পাথরটাও কাঁপছে। যে কোন সময় ওটা গড়িয়ে পড়তে পারে। তা হলে আমাদের বসে থাকা পাথরটাকে সুদ্ধ নিয়ে নদীতে পড়বে, আমাদেরও সেই সঙ্গে হবে গঙ্গাপ্রাপ্তি। ভয় পেয়ে ওখান থেকে নিরাপদ জায়গায় সরে এসে অন্য একটা পাথরের উপর বসলাম। গুহার ভিতর থেকে

ভেঙে-পড়া প্রকাণ্ড তুষারখণ্ডগুলো ভাগীরথীর ঘোলা জলের স্রোতে ভাস্‌তে-ভাস্‌তে চলেছে। তাদের উপর সূর্যকিরণের ঝিকিমিকি এক সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকি।

গোমুখের যে রূপ আমরা দেখছি তার সঙ্গে হিমালয় অভিযাত্রী ও হিমালয় পর্যটকদের এ সম্পর্কে বর্ণনার কিছু অমিল আছে। অভিযাত্রীরা একে আখ্যা দেন 'স্নাউট' অর্থাৎ হিমবাহনাসিকা। প্রচণ্ড ফোয়ারার তোড়ে জল নিঃসৃত হচ্ছে সেই নাসিকা থেকে। স্নাউটগুলি সাধারণতঃ হিমবাহের পাদমূলে এবং এখানে একটি করে তুষারগুহা থাকে যার ভিতর থেকে স্রোতের আকারে জল নিঃসৃত হয়। যে স্থল থেকে তুষার গলে জলের অবস্থায় পরিণত হয়, সেখানেই চিহ্নিত হয় নদীর উৎস। সুতরাং প্রতিটি তুষার গহ্বরই কোন-না-কোন নদীর উৎস।

গোমুখের নানা ঋতুতে নানা রূপ। আমরা তাকে দেখছি জুন মাসের ১৩ই—শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন সকালে। গঙ্গোত্রী হিমবাহের বরফ গলে যাওয়ায় এ সময় জলের প্রাচুর্য অনেক বেশী। উৎস থেকে বেরিয়েই তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে ভাগীরথী ফুলে-ফুলে চলেছেন প্রচণ্ড স্রোতে। মনে হল দু' তিন শো ফুট প্রশস্ত। গুহার নিকটে যাওয়া অসম্ভব।

যাঁরা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে গিয়েছেন তাঁরা দেখেছেন গোমুখের নিচে ভাগীরথী অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকায়া ও ক্ষীণস্রোতা। সমস্ত গুহায় বরফের প্রাচুর্যও অনেক বেশী, গুহার আকারও ছোট; কারণ এ সময়ে বরফ গলে কম। গোমুখের অনেক নিকটে যাওয়া ও স্নান-করা যাত্রীদের পক্ষেও সম্ভব।

আমাদের আজকের দেখা গোমুখ ও ভাগীরথীর রূপ ভয়াল সুন্দর। তার জলে নেমে স্নান করতে সাহস হল না। শের সিংরাও নিষেধ করল। আত্মীয় বন্ধুদের ফরমাশ মতো এক শিশি জল তুলে নিলাম। সেটুকু সময়েই মনে হল হাতটা অসাড় হয়ে গিয়েছে।

বেলা নটা বাজে। শের সিং এসে বলল, শেঠ, আপনারা তপোবন যাবেন? এখন বেরুলে সন্ধ্যার মধ্যেই ভূজবাসা ফিরে আসতে পারব। এখান থেকে মাত্র চার মাইল দূর। অবশ্য সমস্তটাই বরফের উপর দিয়ে চড়াই-পথ, তবে জায়গাটা খুব সুন্দর। চারিদিক সুন্দর ফুলেভরা।

তরুণ বন্ধুরা উৎসাহিত হয়ে উঠল। আমি কিন্তু কঠিনভাবে আপত্তি তুলে বললাম, অভিজ্ঞ 'গাইড' ছাড়া হিমবাহের উপর দিয়ে যাওয়া চলে না। যে কোনো অংশে তুষার গহ্বরের উপরে পাতলা বরফের আবরণ তাকে ঢেকে রাখে। তার উপর পা পড়লেই অতলে তলিয়ে যাবে। শের সিং ও কৃপাল সিং কুলি মাত্র, গাইড নয়। ওদের ভরসায় তপোবন যাওয়া চলে না। আমার যুক্তি বন্ধুরা মেনে নিল। আমিও স্বস্তি পেলাম।

বেলা ১০টা। এবার উঠতে হবে। গোমুখের দিকে তাকিয়ে এবারের মত শেষ প্রণাম জানিয়ে গঙ্গোত্রীর পথে যাত্রা শুরু করলাম।

আমরা উপরে উঠতে-উঠতে প্রস্তর খণ্ডদিয়ে তৈরী মূলপথে এসে পড়লাম। আমাদের ডানদিকের নিচে দাঁড়িয়ে একখণ্ড বালুভরা সমতল ভূমি। একেবারে ভাগীরথীর বেলাভূমির উপর। জায়গাটার প্রায় সমস্তটা জুড়ে ছোট-বড় তাঁবু খাটান। বুঝলাম গত কাল দুপুরে যে অভিযাত্রী নারীবাহিনীকে চীরবাসা ফিরে যেতে দেখেছি, তারাই আজ ফিরে আসবে এখানে, গঙ্গোত্রী হিমবাহ যাবার পথে। এটাই হয়েছে ওদের মূল শিবির বা 'বেসক্যাম্প'।

চলতে-চলতে গোমুখ ও তার শিয়রে শুভ্র তুষারমুকুটপরা ভাগীরথী, শতোপন্থ ও শিবলিঙ্গ শিখরগুলির দিকে প্রাণভরে তাকিয়ে দেখি। কেমন যেন উদাসকরা এক অনুভূতির ছায়া ফেলে সারা মনে। মনে হয় মহাকবি কালিদাস কি তা হলে যথার্থই বলেছেন—

"রম্যানি বীক্ষ্য মধুরানি নিশম্য চ শব্দান্
পর্যুৎসুকো ভবতি যত্ সুখিতোঽপি জন্তু"

নতুবা 'সুন্দর নেহারি' এ বিষণ্ণতা কেন ?

পরিমল প্রশ্ন তুলল, এ পথে আসতে সব সময়েই 'গ্লেসিয়ার' কথাটা শুনতে পাচ্ছি। কথাটার মানে কি ? আমি বললাম বাংলায় যাকে বলে হিমবাহ তাকেই ইংরাজিতে বলে 'গ্লেসিয়ার'। এ কথাটার অর্থ তুষার নদী। হিম শিখর পর্বতমালার খুব উচু স্থানগুলি থেকে এই তুষার ধীরে-ধীরে গড়িয়ে এসে একস্থানে মিলিত হয়। এখান থেকে তারা গলতে শুরু করে এবং সে অবস্থায় অত্যন্ত ধীরগতিতে চলতে থাকে এই বিস্তৃত বরফের পৃষ্ঠদেশ। সারা হিমালয় জুড়ে এ রকম অসংখ্য হিমবাহ বর্তমান। দু পাহাড়ের শিখরের মধ্যবর্তী ফাঁকের ভিতর বরফ জমে ছোট-ছোট হিমবাহের সৃষ্টি হয়। সেগুলি গলে গিয়েও কয়েকটি একসঙ্গে মিশে গিরিনির্ঝরিণীর রূপ নিয়ে নিচে নেমে আসে এবং একত্র হয়ে বড় নদীতে পরিণত হয়।

গঙ্গোত্রী হিমবাহ সম্ভবতঃ বিশাল হিমালয়ের জটিলতম হিমবাহ। দৈর্ঘ্যে প্রায় ষোলো মাইল ও প্রস্থে দু' তিন মাইল জুড়ে এই সুদীর্ঘ হিমবাহ হিমালয়ের পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে বিস্তৃত হয়ে আছে। এর তিন প্রান্ত থেকে নিঃসৃত হয়েছে তিনটি পুণ্যসলিলা নির্ঝরিণী—অলকানন্দা, মন্দাকিণী ও ভাগীরথী। পুরাণ অনুসারে ব্রহ্মলোক থেকে এই তটিনীত্রয়ের মর্ত্যে অবতরণ। তারপর শুরু হয়েছে তাঁদের ধরার-পথে-যাত্রা। যুগ-যুগ ধরে গড়ে উঠেছে এঁদের দু'কূলে অগণিত তীর্থস্থান, যা কোটি কোটি পুণ্যলোভাতুর তীর্থযাত্রী, পরিব্রাজক ও হিমালয় অভিযাত্রীকে নিবিড় আকর্ষণে বেঁধে রেখেছে।

আমরা ইতিমধ্যে ভূজবাসার উপর দিয়ে চলে এসেছি। শের সিং ও কৃপাল সিং নেমে গিয়ে লালবাবার আশ্রম থেকে আমাদের মাল-পত্র নিয়ে এগিয়ে গেছে। ঝুরো পাহাড় এলাকাও নির্বিঘ্নে পার করে দিয়েছে।

এখন কেবল উৎরাই। একটু সাবধানে কিন্তু স্বচ্ছন্দগতিতে আমরা চলেছি। এক-এক করে বিপজ্জনক ঝরনাগুলি ও ধস্ নেমে নিশ্চিহ্ন হওয়া জায়গাটাও পার হলাম একে অন্যের হাত ধরে। চীর-বাসা পৌঁছবার একটু আগে ক্যাপ্টেন শর্মা ও তাঁর নারী অভিযাত্রীদের সঙ্গে দেখা হল। ওঁরা চীরবাসা শিবিরের তল্পিতল্পা গুটিয়ে গোমুখ চলেছেন ক্যাম্প করতে। গোমুখ থেকে ওঁরা আরও উপরে গঙ্গোত্রী হিমবাহ দিয়ে নন্দনবন, চতুরঙ্গী, কালিন্দী খাল প্রভৃতি জায়গায় অভিযান করবেন। ক্যাপ্টেন শর্মা বললেন উনি হিমালয়ের সব অঞ্চলই ব্যাপকভাবে পরিক্রমা করেছেন। গোমুখের মতো সুন্দর ও বিস্ময়কর প্রাকৃতিকদৃশ্য আর কোথাও দেখেননি। পথে আমরা কোন প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে পড়িনি এবং পরিষ্কার আকাশ ও সূর্য-কিরণের মধ্য দিয়ে গোমুখ দেখতে পেরেছি জেনে খুব খুশী হলেন।

পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম।

চীরবাসা পার হয়ে আরও দু' মাইল এগিয়ে একটা ঝরনার ধারে গাছের তলায় এসে আমরা স্থির করলাম এবার খেয়ে নেব। যে গতিতে চলেছি সেটা রাখতে পারলে বিকাল সাড়ে-চারটার মধ্যেই গঙ্গোত্রী পৌঁছে যাব।

গাছের ছায়ায় পাথরের উপর বসে আমাদের দুপুরের খাবার বিতরণ হল, ছ'খানা করে বিস্কুট, প্যাঁড়া আর বরফি সন্দেশ দু'খানা করে। প্যাঁড়া আর বরফি সন্দেশ গতকাল গঙ্গোত্রী থেকে কেনা হয়েছিল। গৌর ও রোহিত একটু নেমে হাত বাড়িয়ে ঝরনা থেকে জলের বোতলগুলি ভরতি করে নিয়ে এল।

খাবার খেয়ে আধ বোতল করে ঝরনার হিমশীতল মিঠা জল খেয়ে জঠরানল শান্ত করলাম। তারপর গাছের তলায় গা এলিয়ে দিলাম। আঃ, কি আরাম। স্থির হল এখানে পনের মিনিট বিশ্রাম করে আবার বেরিয়ে পড়ব। গঙ্গোত্রী পৌঁছবার আগে আর বিরতি নয়। সারাটা পথ তো উৎরাই।

বেশ খোস মেজাজে বিশ্রাম করছি এমন সময় দেখি চারটি ছেলে ও একটি মেয়ের দল গোমুখের দিকে চলেছে। শ্রান্ত-ক্লান্ত ওরাও, গাছের ছায়ায় আমাদের কাছাকাছি এসে বসে পড়ল। কড়া রোদে চড়াই পথে চলেছে। প্রত্যেকের কাঁধে একটি করে ভারী 'রুক স্যাক', হাতে কাপড়ের কিট ব্যাগ ও লাঠি। বয়সে তরুণ, বোধহয় আঠার থেকে চব্বিশের মধ্যে। রোদের তাপে ও চড়াই-পথে চলতে-চলতে সবার মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

বাংলায় কথা বলতে দেখে ওদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম। সুবোধ মাইতি, চন্দন ঘোষ, অমিত মিত্র ও খোকন বিশ্বাস। মেয়েটির নাম শিপ্রা গাঙ্গুলী। ওরা সকলেই কলকাতার বাসিন্দা ও একটা স্বাস্থ্য উন্নয়ন সংঘের সভ্য। নানা রকম খেলার মাধ্যমে ওদের সংঘের উদ্দেশ্য ছেলে-মেয়েদের সুস্থ সবল করে গড়েতোলা। সংঘের তরফ থেকেই ওরা পাঁচজন এবার হিমালয়ের পথে বেরিয়ে পড়েছে। গোমুখ হয়ে নন্দনকানন পর্যন্ত যাবে গঙ্গোত্রী হিমবাহের উপর দিয়ে।

অভিযাত্রী-বেশী শিপ্রার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে পরিমল বলে উঠল, "বাঙালী মেয়ের হিমালয় অভিযানে আগ্রহ দেখে বড় ভাল লাগছে। এই তো কাল উত্তরকাশীর পর্বতারোহণ শিক্ষা-কেন্দ্রের একদল শিক্ষানবিস মেয়ে দেখলাম। ওর মধ্যে মাত্র একজন বাঙালী ছিল। বাকী সবাই পঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের বলে মনে হল।" শিপ্রা সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলে উঠল, "কে বলল আপনাকে। এ সম্বন্ধে আপনি কোনো খবরই রাখেন না মনে হচ্ছে। হিমালয়ে বাঙালী মেয়ে-অভিযাত্রীদের নাম শোনেননি? আগস্ট মাসে সুজয়া গুহের নেতৃত্বে কমলা সাহা, সুদীপ্তা সেনগুপ্ত, ডাঃ পূর্ণিমা শর্মা, শেফালী চক্রবর্তী ও নীলু ঘোষ লাহুলে ২০১৩০ ফিট উঁচু ললনা শিখর জয় করে নির্বিঘ্নে মূল শিবিরে নেমে এসেছিলেন। তারপর ফেরার পথে ৭ মাইল দূরে অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে 'করচা

নালা' নামে একটা পাহাড়ী নদী পার হতে গিয়ে সুজয়া গুহ ও কমলা সাহা প্রাণ হারান।" দেশের সকলে এ মর্মান্তিক সংবাদে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

হিমালয় প্রেমিক শ্রদ্ধেয় উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মশাইও এ অভিযানে ছিলেন।"

"আমরাও খবরের কাগজে এ দুঃসংবাদ পড়ে খুবই মনকষ্ট পেয়েছিলাম," বললেন শশাঙ্কবাবু।

লালুবাবু বললেন এছাড়াও বাঙালী মহিলা হিমালয় অভিযাত্রী-দের মধ্যে শ্রীমতী ভক্তি বিশ্বাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি গঙ্গোত্রী-গোমুখ হয়ে হিমবাহ পথে বদরী-নারায়ণ পরিক্রমা করেছেন। ১৯৫১০ ফুট উঁচুতে তুষার শয্যার উপর রাতও কাটাতে হয়েছে ওঁদের। সুতরাং বাঙালী মেয়েরা হিমালয় অভিযানে আগ্রহী নয় বা অপারগ এ কথা সত্য নয়।

উত্তরকাশীর পর্বত-শিক্ষা-কেন্দ্রে শিক্ষানবিসদের মধ্যে বাঙালী মেয়ে কম থাকাই স্বাভাবিক। এঁরা শিক্ষা নেন দার্জিলিং-এ প্রতিষ্ঠিত Himalayan Mountaineering Institute-এ। সেটা উত্তরকাশী শিক্ষা কেন্দ্রর ক' বছর আগেই স্থাপিত হয়েছে।

আমাদের সঙ্গে আলাপ শেষ করে শিপ্রা গাঙ্গুলী ও তার সঙ্গীরা গোমুখের পথে রওনা হলেন।

গাছের তলায় পাথরের উপর গা এলিয়ে শশাঙ্ক বেশ মৌজ করছিলেন। লালুবাবু ওঁকে গোমুখ অঞ্চলের আবিষ্কার সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ করলেন। এবার বেরুবার আগে উনি অনেক পুঁথি-পত্র পড়ে এসেছেন। উনি বললেন,

বহুকাল আগে বাংলার সার্ভেয়ার জেনারেল মেজর রেনেল তীর্থ যাত্রীদের কাছ থেকে গোমুখের বিবরণ শুনে এ অঞ্চল নিরীক্ষণের

কাজ আরম্ভে বিশেষ উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। এর কয়েক বছর পর ১৮৯১ সালে গ্রিস্‌বাখ (Griesbach) নামে একজন শিল্পীই এ অঞ্চল পর্যটন করেন এবং সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম গোমুখ বিবরের একটি ছবি এঁকে ছিলেন। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে গঙ্গোত্রী হিম-বাহের নিরীক্ষণ কাজ শুরু হয় ১৯০৬ সালে। তারপর থেকে চলে আসছে ভ্রমণপিপাসু ও হিমালয় প্রেমিকদের বিরামহীন অভিযান।

আমরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে গঙ্গোত্রী হিমবাহের ইতিহাস শুনছিলাম। এমন সময় পরিমল ঘোষণা করল, এবার উঠতে হবে, পনের মিনিটের জায়গায় পঁয়ত্রিশ মিনিট বিশ্রাম হয়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম।

আমাদের পথ এবার উৎরাই, বেশ স্বচ্ছন্দগতিতে চলেছি। আমি সবার আগে। শারীরিক ক্লান্তি অবসিতপ্রায়। পাহাড়ী-পথের অকৃত্রিম বন্ধু লাঠিকে সহচর করে তরতর করে নেমে চলেছি। পথের ধারে দূরত্ব-নির্দেশক ফলক দেখে বুঝতে পারছি পনের মিনিটে এক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করছি। দেহ যেন ভারমুক্ত, অনায়াসে এগিয়ে চলেছি। মাঝে-মাঝে গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ-যাওয়া-যাত্রীদের পথ-দিতে অল্প চড়াই বা অতি অপ্রশস্ত জায়গাগুলিতে গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে। হিসাব করে দেখলাম এ ভাবে চললে বিকাল সাড়ে-চারটের মধ্যেই গঙ্গোত্রী পৌঁছে যাব। এদিকে সূর্যাস্ত হয় প্রায় সাতটায়। সুতরাং যথেষ্ট আলো থাকবে। দুদিন থাকবার মতো একটা ভাল আশ্রয় খুঁজে নিতে পারব।

কিন্তু বিধি বাম। সরু রাস্তার একটা বাঁকের মোড়ে সম্মুখীন হলাম এক বিরাট মেষবাহিনীর। ওদের পথ দিতে আমাদের পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে হল। কি সর্বনাশ। বুঝলাম, গঙ্গোত্রী সময়মত পৌঁছবার আশা দুরাশা মাত্র।

অবিশ্রান্ত ঢেউ-এর মতো ভেড়ার দল চলেছে তো চলেছেই।

মাঝে-মাঝে আমাদের গায়ে ধাক্কাও দিচ্ছে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছি স্থাণুর্ মতো, উল্টো ধারে পাতালস্পর্শী খাদ। এক-সময় ওর মধ্যেই দুই পালোয়ান মেষশাবক নিজেদের মধ্যে গুঁতো-গুঁতি করতে-করতে সবেগে আমার গায়ে এসে পড়ল ও যাবার সময় ডান পায়ে বেশ জোরে খুরের ঘা দিয়ে চলে গেল। অসহায়, নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম, কতটা জখম হল তা পর্যন্ত দেখবার উপায় নেই। দলের অন্য সাথীরাও অল্পবিস্তর গুঁতো বা লাথির ঘায়ে আপ্যায়িত হলেন, তবে আমার মতো নয়।

এ ভাবে ঠিক চল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর মেষ অক্ষৌ-হিণীর শেষ সৈন্যটি চলে গেল। তার পিছনে দুটো কুকুর ও সবার শেষে 'হৈই, হিস্ করতে-করতে চলল গদ্দি মেষ-পালক। আমরাও পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

ওরা চলে যেতে প্যাণ্ট গুটিয়ে ডান পায়ে ভেড়ার খুরের আঘাতের দিকে তাকালাম। হাঁটুর নিচে প্রায় চার জায়গায় অগভীর গর্ত হয়ে গিয়েছে, সেখান থেকে অল্প অল্প রক্তপাতও হচ্ছে। পরিমল এসে কিট ব্যাগ থেকে গজের টুকরো ও মলম বের করে প্রাথমিক চিকিৎসা করে দিল।

এরপর আমরা এগিয়ে চললাম, কিন্তু আগের সেই গতি আর ফিরে পাচ্ছি না। একটানা চলতে-চলতে যেন হঠাৎ ছন্দ-পতন।

গঙ্গোত্রী আর মাত্র দু' মাইল দূরে। বাঁদিকে কোথাও বেশী কোথাও বা অল্প নিচু দিয়ে স্রোতস্বিনী ভাগীরথী চঞ্চল ছন্দে প্রবাহিণী, চলেছেন উৎস থেকে গিরিশ্রেণীর মধ্য দিয়ে নানা দেশ, নানা জনপদ অতিক্রম করে সাগর-সঙ্গমে। আমরাও গোমুখে দেবী জাহ্নবীর পবিত্র উৎস দর্শন করে পরমানন্দে ফিরে চলেছি তাঁরই সঙ্গে-সঙ্গে। আমাদের যাত্রার শেষ কলকাতা—সাগর-সঙ্গম যেখান থেকে মাত্র চৌত্রিশ মাইল দূরে। যে তীর্থে প্রতিবৎসর মকর-সংক্রান্তির দিন লক্ষ-লক্ষ পুণ্যকামীর সমাগম হয়। সাগরে স্নান করে

তাঁরা অসীম পুণ্য অর্জন করেন। কথায় বলে "সব তীর্থ বারবার, গঙ্গা সাগর একবার।"

এ সব ভাবতে-ভাবতে আমরা মনের আনন্দে নেমে চলেছি। অল্পক্ষণ এগিয়েই একটা বাঁক পেরিয়ে দূরে দেখা গেল গঙ্গোত্রী-মন্দির। পশ্চিম আকাশে অস্তগামী সূর্যদেব পাহাড়ের আড়ালে চলে গেলেও দিনের আলো তখনো অনেকখানি রয়েছে। মন্দির সংলগ্ন প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, ভাগীরথী, তার বেলাভূমিতে অবস্থিত দোকান-গুলি, ওপারে যাবার পুল—সবই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আর একটু এগিয়েই পাকদণ্ডির উৎরাই শেষ করে আমরা গঙ্গোত্রীর মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছে গেলাম। আজকের যাত্রার এখানেই শেষ। দু' দিন এখানে থেকে গঙ্গোত্রীর সব কিছু দেখব, সাধুসঙ্গ পাব এই বাসনা।

অবসন্ন শরীরে মন্দিরের বিরাট পরিচ্ছন্ন চত্বরের উপরে বসে পড়লাম। শের সিংকে নিয়ে পরিমল ছুটল যাত্রী নিবাসের দিকে। সেখানে আমরা গোমুখ যাবার আগে অনাবশ্যক মালপত্র তত্ত্বাবধায়-কের জিম্মায় রেখে গিয়েছিলাম।

সামনে অনন্তস্রোতা ভাগীরথীর দিকে দৃষ্টিপাত করে সব ক্লান্তির অবসান হয়ে গেল। যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, গোমুখ হিমালয়ের এ তিন দুর্গম তীর্থের পরিক্রমা শেষ হল। এবার ঘরে ফেরার পালা। যা কিছু দেখলাম সবই সুন্দর। বলতে ইচ্ছা জাগে, "তুমি সুন্দর, আমি ভালবাসি"। চারিদিক জুড়ে চীর, পাইন ও দেওদার গাছের ঘন-অরণ্য হিমালয়ের কোলে দাঁড়িয়ে আছে, যার শিখরে চিরতুষারাবৃত শুভ্র মুকুট। সেই তুষার বিগলিত করুণায় রুপোলীধারায় ধীরে-ধীরে নামছে পাহাড়ের গা বেয়ে। মাঝে-মাঝে শ্যামলী বনানীতে হারিয়ে গিয়ে আবার দৃষ্টিপথে এসে পড়ছে। সরু ধারাগুলি নিচের দিকে একত্রে মিলিত হয়ে ঝরণার সৃষ্টি করছে ও প্রচণ্ড স্রোতে সেই সম্মিলিত ধারা এসে নিজেদের মিলিয়ে দিচ্ছে ভাগীরথীর প্রশস্তবক্ষে।

এই গঙ্গোত্রী। এখানে কত ব্রহ্মজ্ঞের বাস। 'সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব'—এ দর্শন উপলব্ধি করে এঁরা সব-কিছু ছেড়ে এই দেবভূমিতে চলে এসেছেন। শরীরের ন্যূনতম সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে এঁরা এখানে গড়ে তুলেছেন নিজ-নিজ কুটিয়া। তারপর পরমানন্দে ডুবে গেছেন পরমার্থ-চিন্তায়। 'অজ্ঞানের' তিমির ভেদ করে 'জ্ঞানের আলোক' লাভের আশায় দিনের-পর-দিন গভীর সাধনায় নিজেদের সঁপে দিয়েছেন।

আমরাও আজ এসেছি। সাধারণ সংসারী মানুষ। হিমালয়ের পথে-পথে ঘুরে বেড়িয়েছি অপার আনন্দ ও পবিত্র অনুভূতি নিয়ে। দেখেছি প্রকৃতির উজাড়করা সৌন্দর্যের ভাণ্ডার, নানা রং-এর অজস্র ফুল ও বনস্পতির শোভা। দেখেছি চারিধারে ধ্যান-মৌন-তুষারাচ্ছন্ন হিমাদ্রির অসীম রূপ, নীল আকাশের নিচে তার উপর দিনে সূর্য কিরণ ও শুক্লা রাতে চাঁদের আলোর প্রতিফলন তুলনাহীন।

দেখেছি এর দুই গিরিশ্রেণীর মধ্য দিয়ে প্রবাহমান স্ফটিক-স্বচ্ছ যমুনা ও গেরুয়া বসনা ভাগীরথী—যৌবনমদমত্তা হিন্দুস্থানের এ দুটি পুণ্যতোয়া তটিনী হিমবাহ থেকে জন্ম নিয়ে দুরন্তগতিতে সমতলের দিকে ছুটে চলেছেন।

তন্ময় হয়ে এসব ভাবছি, এনন সময় পরিমল এসে খবর দিল, সরকারী যাত্রী নিবাসে ঘর খালি পাওয়া গেল না, ও তাই সিন্ধু পঞ্জাবী ধর্মশালায় দুটো ঘর ঠিক করে এসেছে। শের সিং আর কৃপাল সিং যাত্রীনিবাস থেকে আমাদের মালপত্র নিয়ে সেখানে চলে গেছে। যা হোক আশ্রয় তো পাওয়া গেছে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমরা উঠে পড়লাম।

সূর্যদেব তখন বিদায় নিয়েছেন, পশ্চিম আকাশ তখন মেলে ধরেছে বিচিত্র রং-এর পশরা।

ভাগীরথীর বেলাভূমিতে দোকানপাটগুলির ঠিক উপরে একটু উঁচুতে অবস্থিত সিন্ধু-পঞ্জাবী ধর্মশালা। লম্বা ধরনের দোতলা বাড়ী।

সামনে নদীর দিকে মুখকরা বারান্দা। আমরা দোতলার উপরে কোণের দুখানা ঘর পেয়েছি। সামনের বারান্দা থেকে ভাগীরথী ও তার ওপারের দৃশ্য বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। মনে ভারী আনন্দ হল।

শুনলাম আমাদের পাশের দুখানা ঘরে কলকাতা থেকে আসা যাত্রীরা আছেন। ওঁরা কদিন গঙ্গোত্রী থাকবেন। ভাবলাম, ভালই, সন্ধ্যার পর আলাপ করা যাবে। বাঙালী যাত্রী শুনে লালুবাবুও খুব খুশী।

কুলিরা বিছানা এনে রেখেছে। যে যার বিছানা পেতে ফেললাম। একটা ঘর তরুণদের অর্থাৎ পরিমল, রোহিত ও গৌরের। অন্য ঘরটা লালগোপাল শশাঙ্কবাবুও আমার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। ঘর দুখানা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও বড়। আস্তানা ভালই হয়েছে মন্তব্য করলেন শশাঙ্কবাবু।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। সারাদিন হেঁটে সকলেই ক্লান্ত। আজ আমরা হেঁটেছি প্রায় ষোলো মাইল—ভূজবাসা থেকে গোমুখ। গোমুখ থেকে সোজা গঙ্গোত্রী। মন চাইছে বিশ্রাম নিতে। রোহিতের ইচ্ছা ছিল এখনই একটু গঙ্গোত্রীর মন্দিরের দিকে যাবার। ওকে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করলাম।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। আপাদমস্তক শীতবস্ত্রে ঢেকে তাড়াতাড়ি রাত্রের খাওয়া শেষ করে এসে শুয়ে পড়ব বলে বেরিয়ে পড়লাম।

বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। একটা হোটেলে গিয়ে হাজির হলাম। কজন বাঙালী যাত্রীও খেতে বসেছেন। লালুবাবু ও পরিমল এগিয়ে গিয়ে ওঁদের সঙ্গে পরিচয় বিনিময় করল।

হোটেলের মালিক মাঝে-মাঝে ছোকরা চাকরকে ফরমাশ করছে, "এ কৈলাস, চার নম্বরমে চাউল ঔর সবজি দে, দো নম্বরমে চাপাটি লাগা"...ইত্যাদি। কৈলাশের উত্তর। "জী, চাচা, আভি দেঁউ," পরিমল বলে উঠল, "ও মশাই এখানেও 'চাচার হোটেল'। এটা কি কলকাতায় হেদোর পারের চাচার হোটেলের ব্রাঞ্চ নাকি?"

শশাঙ্কবাবু একটু মুচকি হেসে মন্তব্য করলেন, "উঁহু, এ চাচা সে চাচা নয়," সবাই হেসে উঠলাম।

আমরা তাড়াতাড়ি গরম-গরম রুটি ও ডাল-তরকারী খেয়ে ধর্মশালায় ফিরে এলাম। রাত্রি তখন সাড়ে-আটটা। সবার মনই খুব খুশী। লালুবাবু বললেন "ইচ্ছা একটু আড্ডা জমাবার। চলুন পাশের ঘরে বাঙালী যাত্রীদের সঙ্গে একটু আলাপ করি। উত্তম প্রস্তাব, সবাই উঠে পড়লাম।

ওঘরের বাসিন্দা মধ্য-বয়সী এক ভদ্রলোক ও তাঁর সহধর্মিণী, শ্রীমোহিত সেন ও শ্রীমতী সুরমা সেন। মোহিতবাবু কলকাতার এক সরকারী কলেজে ভূগোলের অধ্যাপক। সুরমা দেবীও যোগ্যা সহধর্মিণী, উনিও কলকাতায় এক কলেজে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপিকা। এ দুজন কৃতী বঙ্গ-সন্তানের সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব আনন্দ হল। বললেন ওঁরা গতকাল গঙ্গোত্রী এসেছেন। সুরমা দেবীর পায়ে বাতের ব্যথা থাকায় ওঁদের গোমুখ যাবার পরিকল্পনা নেই, এখান থেকেই কলকাতা ফিরে যাবেন। আমরা গোমুখ দেখে এসেছি শুনে খুব খুশী, আগ্রহের সঙ্গে আমাদের কাছ থেকে ওখানকার সব বিবরণ শুনলেন।

পরিমল মোহিতবাবুকে অনুরোধ করল হিমালয়ের ভৌগোলিক তথ্য সম্বন্ধে কিছু বলতে। উনি বললেন—

"হিমালয় নামধারী পৃথিবীর এই সর্বোচ্চ গিরিশ্রেণী—উত্তরে তিব্বত ও দক্ষিণে গঙ্গানদীর অববাহিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। দৈর্ঘ্যে ১৬০০ মাইল এবং প্রস্থে স্থানে-স্থানে ২০০ থেকে ৩০০ মাইল এই সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলকে ভৌগোলিকগণ তিনটি অংশে ভাগ করেছেন। সর্ব দক্ষিণে শিবালিক পর্বতশ্রেণী নিম্নতম পর্বতমালা। পশ্চিমে পঞ্জাব থেকে পূর্ব আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত। এদের মাঝে বড়-বড় সমতল ভূ-খণ্ড যাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'দুন'।

শিবালিক পর্বতমালা গঙ্গার অববাহিকা থেকে কোথাও ৩০০০

ফুটের বেশী উচু নয়। এ অঞ্চল ঘন অরণ্যময়, হিংস্র পশু ও সরীসৃপের আবাসভূমি।

শিবালিকের উত্তরে আছে নিম্ন হিমালয়, যাকে ইংরাজিতে বলে 'Lesser Himalayas' এ অঞ্চল প্রায় ৬০ মাইল প্রশস্ত। পশ্চিম থেকে পূর্বে এই গিরিশ্রেণী শিবালিকের সমান্তরালভাবে চলেছে। এখানকার পাহাড়ের গঠন কোথাও সহজ বা সরল নয়। হিমালয় থেকে নিঃসৃত অগণিত নদী পাহাড় ভেদ করে তার মধ্য দিয়ে বেগে প্রবাহিত। এই গিরিশ্রেণীগুলি গড়ে প্রায় ১৫,০০০ ফুট উঁচু, ক্রমশঃ উত্তরে উচ্চতা বেড়ে গিয়েছে।

নিম্ন হিমালয়ে অনেক সময় পাহাড়ী ধস্ নেমে রাস্তাঘাট ও সেতু ভাসিয়ে দেয়, বিশেষতঃ বর্ষাকালে। ফলে তখন এ জায়গাগুলি দেশের অন্যান্য অংশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

শিবালিকের মতো এ অঞ্চলও ঘন অরণ্যসমাচ্ছন্ন। যত উপরে ওঠা যায়, দেওদার, চীর পাইন বনস্পতির শোভায় চারিদিকের দৃশ্য ততো মনোরম। তাদের উপরে দণ্ডায়মান তুষারাবৃত শিখরগুলি। দেওদার ও চীর গাছ অতি মূল্যবান। চীর গাছের বাকলের রস থেকে রজন ও কাঠ থেকে নানা আসবাবপত্র আর শৌখীন খেলনা তৈরী হয়। কাশ্মীর রাজ্যে দেওদারের অফুরন্ত জঙ্গল। এর কাঠি থেকেই সেখানকার আসবাবপত্র ও খেলনা তৈরী হয়।

নিম্ন হিমালয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে আধুনিক মনোরম শৈলাবাসগুলি, যেমন সিমলা, মুসৌরী, নৈনিতাল, রানীক্ষেত, আলমোড়া, কৌশলী, দার্জিলিং প্রভৃতি।

হিমালয়ের সর্ব উত্তরের অংশকে বলা হয় 'বৃহৎ হিমালয়' বা 'Greater Himalayas', এ অঞ্চল শিবালিক এবং নিম্ন হিমালয়ের উত্তরে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওদের সমান্তরালভাবে পশ্চিম থেকে পূর্বে বিস্তৃত। বৃহৎ হিমালয়ই হিমালয়ের সর্ব প্রধান ও সর্বোচ্চ অংশ। এর গিরিশৃঙ্গগুলির উচ্চতা গড়ে ১৮,০০০ ফুটেরও বেশী।

এদের হিমবাহ থেকে জন্ম নিয়েছে গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু প্রভৃতি বড়-বড় নদীগুলি। তারপর তারা কঠিন পর্বতগুলিকে কোথাও ভেদ করে কোথাও বা দুই পর্বতের মাঝে নিচু অংশগুলির মধ্য দিয়ে সর্পিল-ভাবে বেরিয়ে এসে সমতলের দিকে নেমে গিয়েছে। জলস্রোতে গভীরভাবে ক্ষত-করা এই সংকীর্ণ অঞ্চলগুলি ছাড়া বিশাল হিমা-লয়ের এই তিনটি অঞ্চল একে অন্যের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে মোটা-মুটি স্বতন্ত্র সমান্তরালভাবে, ভারতের উত্তর শিয়রের প্রহরীরূপে। বৃহৎ হিমালয়ে আছে সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গগুলি—নাঙ্গাপর্বত, নন্দাদেবী, ধৌলগিরি, অন্নপূর্ণা, এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘা—এরা সবাই আপন মহিমায় বিরাজমান। আরও উত্তরে এদের পারে আছে তিব্বত, সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও সব চেয়ে দূরে চীন। এদের আগ্রাসী সাম্রাজ্যলোলুপ দৃষ্টি থেকে হিমালয় আমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকে রক্ষা করছে।

হিমালয় হিন্দুস্থানের জলধারার অফুরন্ত ভাণ্ডার। এর তুষার বিগলিত জলের স্রোতে যে অগণিত তটিনীর সৃষ্টি এবং সেগুলি থেকে জলবিদ্যুৎ শক্তির যে অনন্ত-উৎস-স্রোত প্রবাহিত, সারা পৃথিবীর আর কোনো দেশে তার তুলনা মেলে না। হিন্দুস্থানের উপর প্রকৃতির এ এক অকৃপণ অনুগ্রহ।”

আমরা তন্ময়চিত্তে মোহিতবাবুর বর্ণনা শুনছিলাম। হিমালয়ের পথে অনেক হেঁটেছি, তার আশ্রয় গৃহগুলিতে রাত্রিবাস করেছি। এই গিরিশৃঙ্গের অফুরন্ত রূপসুধা আকণ্ঠ পান করেছি। কিন্তু তার প্রাকৃতিক গঠনের এ তথ্যাবলী এতদিন আমাদের অজ্ঞাত ছিল। আজ মোহিতবাবুর কল্যাণে এ-ব্যাপারে কত মূল্যবান তথ্য জানা হল। ওঁকে ওনেক ধন্যবাদ জানিয়ে এবার আড্ডা ভেঙে উঠে পড়লাম।

রাত্রি এগারটা বাজে। চটপট এসে যে-যার কম্বলের তলায় আশ্রয় নিলাম। দরজা বন্ধ থাকলেও ভাগীরথীর অবিরাম কলধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। শুনতে-শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

ভোরবেলা যথারীতি লালুবাবুর ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। টর্চ জ্বেলে দেখি ঘড়িতে সাড়ে-চারটে বেজেছে, উঠে পড়লাম। দরজা খুলতেই দুরন্ত হাওয়া তার হিমেল স্পর্শ সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিল।

শশাঙ্কবাবুরও ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু শীতের প্রাবল্য ও নিদ্রাজনিত আলস্য—এ-দুয়ের পাল্লায় পড়ে বিছানা ছাড়তে নারাজ। আর পরিমল, গৌর ও রোহিতের নাসিকা গর্জনে ব্যাঘ্রও কম্পিত হবে। ওদের উঠতে এখনও একঘণ্টা। আমি আর লালুবাবু সারাদেহ গরম জামায় ঢেকে বেরিয়ে এলাম দিনের প্রথম সূর্যের আবির্ভাব দর্শন-মানসে।

গঙ্গোত্রী মন্দিরের সামনে প্রশস্ত বাঁধানো আঙ্গিনা। সেখান থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গিয়েছে বিস্তীর্ণ নদীগর্ভে। ভাগীরথীর ঘোলাজল দুরন্ত স্রোতে ফুলে-ফুলে উঠছে, তার সঙ্গে অবিরাম কলতান। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমরা জলের ধারে এসে বসলাম।

প্রচণ্ড শীত। চারিদিক তখনও ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। সব কিছু উপেক্ষা করে এক দুর্বার আকর্ষণে আমরা ছুটে এসে‍ছি গঙ্গাতীরে। সারামন অনাবিল আনন্দে মগ্ন। অল্প পরেই কুয়াশায় ঢাকা প্রকৃতির ঘোমটাখানি খুলে যাবে। দেখা দেবে পল্লবভারাচ্ছন্ন বনানীর শ্যামশ্রী। তারপরই হবে পুবের আকাশে বহু আকাঙ্খিত সূর্যোদয়।

ক্রমে পুবের আকাশে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল উষার অরুণিমা। নীল আকাশে হালকা সোনালী রং রূপান্তরিত হল গাঢ় সিঁদুর রঙে। ঘন পাইন ও দেওদার বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়ে একটু পরে তার রশ্মি এসে পড়তে লাগল এ-পারে।

পুণ্যসলিলা জাহ্নবীর কূলে বসে আছি, তীর্থভূমির পবিত্রতায়

মন সমাচ্ছন্ন। অনাদ্যন্ত কাল ধরে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চিন্তা পবিত্র করেছে তীর্থস্থান সমূহের প্রতিটি রেণু-কণা।

"প্রভাবাদ্ ভূতাদ্ ভূমেঃ সলিলশ্চ তেজসঃ।
প্রবিগ্রহান্মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা॥"

অর্থাৎ তীর্থস্থানগুলি পবিত্র হয় তাদের মাটি, জল ও অগ্নির মাহাত্ম্যে এবং সর্বোপরি সেখানে মুনি-ঋষিরা বাস করেন বলে।

ভাবাকুল চিত্তে কতক্ষণ বসে ছিলাম জানি না। যখন বাস্তবে ফিরে এলাম, সারা গঙ্গোত্রী তখন সূর্যকরোজ্জ্বল।

নদীর দক্ষিণতীরে গঙ্গামায়ের মন্দির। দু-পাশে ধর্মশালা, যাত্রী-নিবাস, দোকান-পাটগুলি দাঁড়িয়ে আছে। ভাগীরথীর ওপারে দেওদার ও পাইন গাছের ঘনবন। তারই মাঝে ইতস্তত: ছড়ানো সাধু-সন্তদের কুটিয়া। এ-সব নিয়ে সম্পূর্ণ গঙ্গোত্রী—সমুদ্রতীর থেকে ১০৩২০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত।

এই সেই গঙ্গোত্রী, যেখানে পাণ্ডবরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর আত্মীয়-বধের অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে যজ্ঞ করেছিলেন। এই সেই পুণ্যভূমি, যেখানে অধুনা মন্দিরের অনতিদূরে ভাগীরথীর কূলে এক শিলা-খণ্ডের উপর বসে রাজা ভগীরথ মৃত পূর্ব-পুরুষদের শাপমুক্ত করতে গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণমানসে দীর্ঘকাল ধরে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ও দেবাদিদেব মহেশ্বরকে তাঁর তপস্যায় তুষ্ট করে গঙ্গাকে মর্ত্যে আনতে পেরেছিলেন। গোমুখ থেকে নিঃসৃত হয়ে মা-গঙ্গা শত-শত জনপদ পার হয়ে সাগর-সঙ্গমে নিজেকে মিলিয়ে দিলেন। মুক্তিলাভ করলেন রাজার পূর্ব-পুরুষদের বিদেহী-আত্মা। গঙ্গোত্রীর এই বিরাট শিলাখণ্ড আজও ভগীরথ শিলা নামে খ্যাত।

প্রবাদ আছে, রাজা ভগীরথের কালে এই গঙ্গোত্রীতেই ছিল গোমুখ বা ভাগীরথীর উৎস-স্থল। ক্রমে-ক্রমে উত্তরে সরে গিয়ে আজ তা এখান থেকে প্রায় তের মাইল দূরে চলে গিয়েছে। গঙ্গোত্রী

হিমবাহ ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। এ বৈজ্ঞানিক সত্যও তাই প্রচলিত প্রবাদকে সমর্থন করে।

যমুনোত্রীর মতো নির্জন, নিরাভরণ নয় গঙ্গোত্রী তীর্থ, নয় এর পথ যমুনোত্রীর মতো দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল। তাই তো এখানে গড়ে উঠেছে সমৃদ্ধ জনপদ, সুন্দর মন্দির ও তার চারিপাশ ঘিরে ধর্মশালা, যাত্রীনিবাস, দোকান-পাট, ডাকঘর ও আধুনিক ধরনের পথঘাট। তাই বুঝি এখানে এত যাত্রী, এত পর্যটকের সমাগম। অতি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘেরা পরিচ্ছন্ন গঙ্গোত্রী দেখতে একটি সুন্দর শৈলাবাসের মতো, যদিও কোলাহল মুক্ত ও পবিত্র।

গঙ্গোত্রীর অন্যতম বিশিষ্ট স্থান গঙ্গা-মন্দির। কথিত আছে উনবিংশ শতাব্দীতে নেপালের সৈন্যাধ্যক্ষ অমর সিং থাপা এ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অনেক পরে জয়পুরের মহারাজা পুরান মন্দিরটির আমূল সংস্কার করে এর এই নূতন রূপদান করেছেন। অতি সুন্দর এর স্থাপত্যকলা। পরিচ্ছন্ন কারুকার্য্যমণ্ডিত এর চূড়া বহু উঁচুতে উঠে গিয়েছে। সেখানে স্বর্ণধ্বজা বিরাজিত—যা বহুদূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয়। প্রশস্ত প্রাঙ্গণ থেকে কয়েকটা সিঁড়ি উঠে মন্দিরের বাঁধানো নাট-মন্দির, তা পার হয়ে গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহে শোভা পাচ্ছে কয়েকটি দেবীমূর্তি, গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মাঝখানে বিরাজ করছেন মকর-বাহিণী ভাগীরথী। পাশে করজোড়ে দণ্ডায়মান রাজা ভগীরথ।

মন্দির প্রাঙ্গণে শশাঙ্কবাবু পরিমল, রোহিত ও গৌরের দেখা পেলাম। ওঁরাও পূজা দিতে এসেছেন। সূর্যোদয় দেখা হল না বলে আফ্‌শোশ করলেন।

ভক্তিভরে মায়ের পূজা দিয়ে আমরা নেমে এলাম। পূজারী একটা লম্বা সিঁদুরের তিলক কেটে দিলেন সবার কপালে।

মায়ের পূজা দেওয়া সমাপ্ত, এবার কোথায় যাওয়া যায় চিন্তা

করছি এমন সময় লালুবাবু প্রস্তাব করলেন, "চলুন, সাধু দর্শন করে আসি।"

গঙ্গোত্রীর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ এখানকার সাধুদর্শন। লোকালয় থেকে বহুদূরে হিমালয়ের এই নির্জন ও দুর্গম অঞ্চলে তপস্যারত উচ্চমার্গের সাধু-সন্ন্যাসীরা বাস করেন।

পুল পার হয়ে আমরা ভাগীরথীর অপর পারে এলাম। চারিদিকে পাইন ও দেওদার গাছের বন। তার মাঝে এখানে ওখানে সাধু সন্তদের কুটিয়াগুলি। সেখানে তাঁরা মনোরম পরিবেশে বাস করেন। অল্পদূরে ভাগীরথী ও কেদার গঙ্গার-সঙ্গম। শুনলাম কেদার গঙ্গার অববাহিকা ধরে এখান থেকে কেদার গ্রামে যাবার পথ আছে। ওড়া-পথে তা নাকি মাত্র কয়েক মাইল। কিন্তু পর্যটকের পরিক্রমায় এর দূরত্ব দুশো মাইল দুরন্ত দুর্গম, বিপদসঙ্কুল পথে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে। গঙ্গার ত্রিধারা—ভাগীরথী, অলকানন্দা, ও মন্দাকিনীর উৎস পরস্পরের ২০।২৫ মাইলের মধ্যে।

এ অঞ্চল টুকুকেই আর্য-ঋষিরা ব্রহ্মলোক আখ্যা দিয়েছেন।

আগেই বলেছি গঙ্গোত্রীতে উচ্চমার্গের সাধু-সন্তদের বাস। হিমালয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সাধু-সন্ন্যাসী থাকলেও গঙ্গোত্রীতেই বোধহয় এঁরা সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় বাস করেন।

এমন এক সাধু রামানন্দ অবধূত। শুনলাম এর বয়স নাকি শতাধিক বৎসর। ক্ষীণদেহী এই মহাপুরুষ মৌনী।

গঙ্গোত্রীবাসী আর এক সন্ন্যাসী স্বামী সুন্দরানন্দ। রাজস্থানী শরীর। এঁর অন্য খ্যাতি পর্বতারোহী হিসাবে। সংসারত্যাগী এই স্বামীজি দার্জিলিং হিমালয়ান মাউনটেনিয়ারিং ইনস্টিট্যুটে শিক্ষা-প্রাপ্ত। গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চল ভ্রমণ সম্বন্ধে স্বামী সুন্দরানন্দের অসামান্য অভিজ্ঞতা। বহুবার তিনি এই অতি দুর্গম ও ভয়ঙ্কর অঞ্চল পরিক্রমা করেছেন। ফটোগ্রাফী বিদ্যায় স্বামীজির অসামান্য অপূর্ব দক্ষতা। এতেই তাঁর অসামান্য শিল্পী-মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

হিমবাহ পথে গোমুখ থেকে বদরিনারায়ণ পর্যন্ত তুষার পথ তিনি একাধিকবার পর্যটন করেছেন অভিযাত্রীদের নেতা-রূপে। সে পথে আছে উনিশ হাজার ফুট উঁচু কালিন্দী খাল ও উর্বশী উপত্যকা। সে পথ একাধারে ভয়ঙ্কর ও প্রকৃতির রূপ-মাধুরীতে পূর্ণ। সুন্দরানন্দ স্বামী যৌগিক বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষিত এবং অধুনা পরলোকগত সাধু তপোবনজী প্রতিষ্ঠিত মঠের অধ্যক্ষ।

গঙ্গোত্রীর অপর বিস্ময়কর সন্ন্যাসী মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রম। কেদার গঙ্গা পার হয়ে ভাগীরথীর তীরে ওঁর আশ্রম। অনেকে বলেন একালের সমস্ত সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে একমাত্র ইনিই দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন। দীর্ঘদেহী, নাগা এই মহা-ঋষির সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল তাঁর চক্ষু দুটি। অপূর্ব দীপ্তিময় এ চক্ষুর দিকে তাকালে পরম ভক্তিভরে মাথা আপনি নত হয়ে আসত। কৃষ্ণাশ্রমের সঠিক বয়স কেউ জানে না। ওঁর শিষ্যদের মতে উনি আশি বছরেরও বেশী গঙ্গোত্রী অতিবাহিত করেছিলেন। তার পূর্বে বহুকাল তিনি বিন্ধ্যাচল ও তুষারাবৃত হিমাচলের নানা স্থানে তপস্যারত ছিলেন।

কৃষ্ণাশ্রম ছিলেন মৌনী। দর্শনার্থীরা তাঁকে কোনো প্রশ্ন করলে ইশারায় তার জবাব দিতেন। ওঁর শিষ্যরা সেগুলি বুঝিয়ে দিতেন।

মাত্র দু' বছর আগে গঙ্গাজীতে মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রম দেহরক্ষা করেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা তাই এই মহাপুরুষের দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ থেকে বঞ্চিত হলাম।

গঙ্গোত্রীর অপর জনপ্রিয় সাধু দণ্ডীবাবা নিজের আশ্রমের সঙ্গে একটি যাত্রীনিবাসও গড়ে তুলেছেন। বহু তীর্থযাত্রী এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাস ও আহার উভয়েরই ব্যবস্থা আছে। শুনলাম প্রয়োজনে যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য কম্বলও সরবরাহ করা হয়। যাত্রীরা সাধ্যমতো অর্থ আশ্রমের দানপাত্রে দিয়ে যায়। দণ্ডীবাবা এখানে দণ্ডীস্বামী বলেও পরিচিত।

গঙ্গোত্রী অঞ্চলে আর এক উচ্চ-মার্গের সাধিকা কৃষ্ণা ভারতী

মা। মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রমের আশ্রমের অল্পদূরেই ওঁর কুটির। মায়ের বাংলার শরীর। শুনেছি অল্প বয়সে বিদুষী ও অপূর্ব শ্রীময়ী এই মহিলা "ভূমৈব সুখম, নাল্পে সুখমস্তি" এই চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে গঙ্গোত্রী চলে আসেন। উত্তর কলকাতায় এক অতি ধনী পরিবারের মধ্যে উনি মানুষ হয়েছেন। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ও শান্তিনিকেতনে উচ্চশিক্ষা পেয়েও অতি অল্প বয়সে এ পথে চলে আসেন। সেই থেকে হিমালয়ের কোলে বেদ, উপনিষদ ও অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থে অসাধারণ পড়াশুনা ও সাধনার মধ্য দিয়ে পরমশান্তিতে দিন অতিবাহিত করছেন। সংস্কৃত, হিন্দী ও ইংরাজি সাহিত্যে মায়ের সমান ব্যুৎপত্তি। গঙ্গোত্রী ছেড়ে আরও উঁচুতে গোমুখের দিকে ভাগীরথীর বামতীরে একস্থানে নিজের আশ্রম গড়ে সেখানেই বাস করছেন। সে স্থান অতি নির্জন, অতি দুর্গম। পথ বলে কিছু নেই। ভাগীরথীর বাম কূল ধরে যেতে হয়। পথে আছে ঝরনা যা পার হবার ব্যবস্থা অতি অবৈজ্ঞানিক।

লোক-চক্ষুর অন্তরালে থেকে সাধনা করবার জন্যই সম্ভবতঃ কৃষ্ণা ভারতী মা প্রকৃতির এ মনোরম পরিবেশ ও দুর্গম স্থানে নিজের আশ্রম তৈরী করেছেন। কখনও কখনও মা গঙ্গোত্রী নেমে আসেন সাধু সঙ্গর জন্য। দু' একদিন থেকে আবার ফিরে যান সেই দুর্গম আশ্রমে। আমরা গঙ্গোত্রী আসবার দু'দিন আগে নাকি সেখানে এসে ফিরে গিয়েছেন। অতি অল্প সময়ের জন্য হিমালয়ের এই সাধিকা বাঙালী মহিলার দর্শনলাভে বঞ্চিত হলাম এ-কথা ভেবে আফ্‌শোশ হল।

শুনলাম কৃষ্ণাভারতীর বর্তমান বয়স মাত্র ৩৫।৩৬ বৎসর।

স্বামী সারদানন্দ গঙ্গোত্রীর আর এক মহাজ্ঞানী সন্ন্যাসী। এঁর মাদ্রাজের শরীর। পেশায় উচ্চশিক্ষিত এনজিনিয়ার ছিলেন। পরমার্থলাভের আশায় সব-কিছু ছেড়ে চলে আসেন ও হৃষিকেশে স্বামী শিবানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সাধু-সন্তদের কুটিরগুলির

পাশ দিয়ে চলতে-চলতে আর এক বাঙালী পরিবারের সঙ্গে আলাপ হল, সুভাষ মুখার্জি, ওঁর স্ত্রী প্রতিমা মুখার্জি, ও শ্যালিকা হাসি ব্যানার্জি। হাসিদি কলকাতায় সঙ্গীত মহলে সুপরিচিতা। ওঁর কণ্ঠে কীর্তন ও ভক্তিমূলক গান শুনেছি। ওঁরাও সিন্ধু-পঞ্জাব ধর্মশালায় আশ্রয় নিয়েছেন। লালুবাবু মহা খুশী। বললেন "আজ সন্ধ্যায় মোহিতবাবুর ঘরে আমাদের আসর বসবে। ওঁরাও যেন নিশ্চয় যোগ দেন আর হাসিদি যদি দু'খানা গান শোনান, তবে বড় আনন্দ হবে। সভার শেষে এক সঙ্গে খিচুড়ী ভোজ হবে," ওঁরা সানন্দে রাজী হলেন। কলকাতা থেকে এত দূরে বাঙালী পেয়ে ওঁদেরও ভাল লাগছে।

এগিয়ে গিয়ে কেদার গঙ্গার তীরে বসলাম। উপর থেকে তীব্র-বেগে তার ধারা নেমে এসে মিলিত হচ্ছে ভাগীরথীর বুকে। সঙ্গমের দৃশ্য সব সময় মধুর ও পবিত্র। হিমাদ্রির কোলে তা মধুরতর রূপ ধারণ করেছে। আমরা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। কান পেতে শুনি স্রোতস্বিনীর কল্লোল।

"চলুন, এবার ফিরে চলি" লালুবাবুর ডাকে উঠে পড়ি। এ-পারে এসে খানিকটা দূরে বাবা কালী কম্‌লিওয়ালার ধর্মশালা, বহু বছর ধরে যা লক্ষ লক্ষ পুণ্য লোভাতুর নরনারীকে হিমালয়ের এই দুর্গম মহাতীর্থে আশ্রয় দিয়েছে।

প্রণাম জানাই এই সর্বত্যাগী মহাপুরুষকে যিনি উত্তরাখণ্ডের সারা তীর্থপথে যাত্রী ও পর্যটকদের জন্য এই ধর্মশালাগুলি প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। গঙ্গোত্রীতেও এই ধর্মশালাই প্রথম যাত্রীনিবাস। আজ অবশ্য অন্যান্য সংস্থার যাত্রীনিবাস, ধর্মশালা ও সরকারী আবাসগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যাত্রী বা পর্যটকদের জন্য।

কয়েক বছর আগে আগুন লেগে কালী কম্‌লিওয়ার ধর্মশালার একাংশ ধ্বংস হয়ে যায়। সেটুকু আবার নূতন করে তৈরী করা হয়েছে।

"বেলা একটা বাজে, পেটে তাত্ লেগেছে, এবার হোটেলে চলুন" পরিমলের কথায় সবার হুঁশ হল। হোটেলে এসে ভোজন-পর্ব সমাধা করে ধর্মশালায় ফিরে এলাম। পাশের ঘরের মোহিতবাবু ও সুরমাদি আহার সমাপনান্তে বারান্দায় বসে ভাগীরথীর শোভা উপভোগ করছিলেন।

নিশ্চিন্ত মনে ঘণ্টা দুই দিবা নিদ্রা দেবার পর বিকাল পাঁচটা নাগাদ আমরা শীতবস্ত্রে আপাদ-মস্তক আবৃত করে বেরিয়ে পড়লাম বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে। আমাদের ডানদিকে দেওদার ও পাইন গাছের ঘন বন পাহাড়ের কোল থেকে তার গা বেয়ে উপরে উঠে গিয়েছে। সূর্যঠাকুর পশ্চিমে হেলেছেন। এরপর গাছের আড়ালে চলে গিয়ে বিদায় নেবেন।

সন্ধ্যা অন্তে আমরা মন্দিরের দিকে ফিরে চললাম। পূর্ণিমা রাত। রাস্তায় আলো না থাকাতে অসুবিধা হল না।

গঙ্গোত্রী মন্দিরের প্রশস্ত চত্বরে তখন যাত্রী সমাগমে আনন্দ-মেলা বসেছে। সবাই অপেক্ষা করছেন সন্ধ্যারতি দর্শনমানসে। লালুবাবু জুতো খুলে বসে পড়লেন আহ্নিকে।

একটু পরেই পঞ্চ-প্রদীপ ও কাঁসর-ঘণ্টা ধ্বনির সঙ্গে আরতি শুরু হল। পূজারী ভক্তিভরে দেবীর বন্দনা করছেন। সমবেত যাত্রীরা করজোড়ে দণ্ডায়মান। হরিদ্বারে হর-কি প্যারীর ঘাটে সেই সুন্দর আরতি ও তার শেষে মোচার খোলায় প্রদীপ দিয়ে গঙ্গার স্রোতে তা ভাসিয়ে দেবার সুন্দর দৃশ্য চোখের উপর ভেসে উঠল।

এখানে অবশ্য কেউ নৌকা ভাসালেন না। বেশ খানিকটা বেলাভূমি অতিক্রম করে নদী। প্রচণ্ড তার স্রোত।

মন্দিরে সন্ধ্যারতি দর্শন করে ধর্মশালায় ফিরে এলাম। মোহিত-বাবু, সুরমাদি, প্রতিমাদি, হাসিদিরাও আরতি দেখতে গিয়েছিলেন। ওঁরাও আমাদের সঙ্গে ফিরলেন। পথে সুরমা ও মোহিতবাবুর সঙ্গে প্রতিমাদিদের পরিচয় বিনিময় হল। সুরমাদি ওঁদের আসরে এসে

যোগ দিতে অনুরোধ জানালেন। অনুষ্ঠান শেষে সবার জন্য খিচুড়ীর ব্যবস্থা হয়েছে তাও জানালেন।

সেদিন সন্ধ্যায় হিমালয়ের এই পুণ্যতীর্থে সিন্ধু-পঞ্জাবী ধর্মশালার ঘরখানিতে আমাদের এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে গান শুরু হল হাসিদির কণ্ঠে শিবস্তোত্র দিয়ে—ভক্তিরসাপ্লুত মধুরকণ্ঠে হাসিদি শিবস্তোত্র পাঠ করলেন।

সকলের অনুরোধে তাঁকে আরও একখানা ভক্তিমূলক গান গাইতে হল। আমরা মুগ্ধ নির্বাক। সারা ঘরের মধ্যে সুরের মূর্ছনা ছড়িয়ে গিয়েছে। গায়িকার দু' চোখ দিয়ে অবিরল ধারা নেমে আসছে। সুরমাদি, প্রতিমাদির চোখও অশ্রুসিক্ত।

ওঁকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জানালাম।

আমাদের এ ঘরোয়া অনুষ্ঠান শেষ হল লালুবাবুর আবৃত্তি দিয়ে। রাত তখন দশটা।

সুরমাদি বললেন 'মিনিট পনের ধৈর্য ধরুন, তার মধ্যে খাবার তৈরী হয়ে যাবে।'

আমরা হাল্‌কা মেজাজে নানা কথা আলোচনা করতে লাগলাম। মোহিতবাবু বললেন এ কথা ভাবতে বড় আনন্দ ও গর্ব অনুভব করি যে হিমালয়ের এই দুর্গম অঞ্চলে অতি উচ্চমার্গের সাধুদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের বাংলার শরীর। বিলাস, অর্থ ও সংসারের সব মোহ ত্যাগ করে এঁরা চলে এসেছেন অধ্যাত্ম সাধনায়। আমরা শীতবস্ত্রে আবৃত হয়ে ঘরের মধ্যে বসে আরাম করছি। ওঁরা কুটিয়া বা গুহাতে বসে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন আর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেছেন। আমাদের কাছে পার্থিব জিনিসের যে আকর্ষণ ওঁদের কাছে পরমার্থের আকর্ষণ তার চেয়েও বেশী। শাস্ত্রবিষয় ছাড়াও নানা বিষয়ে কি গভীর ওঁদের জ্ঞান। ইতিহাস, অর্থনীতি, হালফিল খবরাখবর, সবেতেই ওঁরা ওয়াকিবহাল। কি করে ওঁরা এত জ্ঞানের অধিকারী হন? সুভাষবাবু বললেন ওঁরা যা ভাবেন, যা পড়েন সব

কিছুতেই গভীর নিষ্ঠা ও একাগ্রতা থাকে। সে জন্য সেগুলি আয়ত্তের মধ্যে আনতে সক্ষম হন। আমাদের মতো ওঁদের মন চঞ্চল হয় না।

সুরমাদির দেখলাম সত্যি ইংরেজী সময়-জ্ঞান। পনের মিনিটের মধ্যে তাঁর অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে পাতে পরিবেশন করলেন খিচুড়ী, আলুভাতে আর পাঁপড় ভাজা। সকলের পেটে তখন প্রজ্বলিত হুতাশন। তাকে শান্ত করতে সুরমাদেবীকে বেশ হিমসিম খেতে হল। প্রতিমাদি ও হাসিদি অবশ্য ওঁকে সাহায্য করছিলেন।

খাওয়া শেষ করে পরস্পরকে শুভরাত্রি জানিয়ে আমরা নিজ-নিজ ঘরে ফিরে আসি। রাত্রি এগারটা নাগাদ আলো নিভিয়ে কম্বলের তলায় শুয়ে পড়ি 'সর্বে সুখিনো ভবন্তু' গঙ্গামায়ীর কাছে এই প্রার্থনা জানিয়ে।

গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, ঘড়িতে তখন ক'টা বেজেছে জানি না। ভাঙা জানলার ফাঁক দিয়ে একফালি চাঁদেব আলো ঘরের ভিতর এসে পড়েছে। মন এক অনাস্বাদিতপূর্ব স্নিগ্ধ আবেশে ভরে উঠল। কম্বল দুটো গায়ে জড়িয়ে নিঃশব্দে দরজা খুলে প্রশস্ত বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। প্রচণ্ড শীত, তার সঙ্গে বইছে হিমেল হাওয়া। মেঘহীন নির্মল আকাশ। পৌর্ণমাসীর শুভ্র জ্যোৎস্নায় দশ-দিগন্ত বিধৌত হয়ে যাচ্ছে। ভাগীরথীর বুকে দুরন্ত ঢেউ। তার উপরে প্রতিফলিত চন্দ্রিমায় 'আলোকে ছায়া শিব শিবানী জলের কোলে দোলে'। নদীর ওপারে দেওদার ও পাইন গাছগুলির ফাঁক দিয়ে সাধুদের দু' একটা কুটির দেখা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে জ্যোৎস্না-লোকিত এক মোহময়ী রজনী। এ যেন 'নাইট্ ডিভাইন', যেন স্বপ্ন, যেন মায়া। স্তব্ধ বিস্ময়ে আমি প্রকৃতির এ রূপসুধা পান করি। মনে পড়ে যায় কবি দ্বিজেন্দ্রলালের গান—

"নীল আকশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।"

কতক্ষণ তন্ময় হয়ে এ দৃশ্য দেখেছিলাম জানি না, হঠাৎ একটা ভারী কিছু নিচে গড়িয়ে পড়ার আওয়াজে ঘোর কেটে গেল, বাস্তব জগতে ফিরে এলাম। উপর থেকে একটা বড় পাথর গড়িয়ে নিচে নদীতে পড়েছে। তারই ভীষণ শব্দ। এ ঘটনা অবশ্য এখানকার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

রাত শেষ হয়ে আসছে। আর দেরী না করে ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। সঙ্গীরা ঘুমে অচেতন। মন আমার এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরে গেছে। গঙ্গোত্রীর পরম তীর্থে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত যামিনীর অসীম সৌন্দর্য আমার মনেও আনন্দের প্লাবন এনে দিয়েছে। আমি শিল্পী নই, তাই তুলি ও রঙে একে ধরে রাখবার সামর্থ্য আমার নেই, কিন্তু মনের পটে তা আঁকা থাকবে চিরদিন।

পরদিন ঘুম ভাঙল সকলের পরে। হাত মুখ ধুয়ে জিনিস-পত্র গুছিয়ে ফেলি। আজ দুপুরে খাবার পর গঙ্গোত্রী থেকে যাত্রা করব ফেরার পথে। সন্ধ্যার আগে ভৈরবঘাঁটি পৌঁছে রাত্রে সেখানে বিশ্রাম। কাল ভোরে কুলির মাথায় মালপত্র চড়িয়ে সাতটার মধ্যে লঙ্কাচটি পৌঁছতে না পারলে হৃষিকেশ যাবার প্রথম বাস ধরা যা[illegible] না।

দুপুরে খাবার পর কাল রাত্রের প্রতিবেশীদের কাছে বিদায় নিতে গেলাম। ওঁরা গঙ্গোত্রীতে আরও দু'দিন থাকবেন।

এবার গঙ্গোত্রী মন্দিরে গিয়ে গঙ্গামায়ের উদ্দেশ্যে বিদায় প্রণতি জানিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডে এসে পৌঁছলাম। কুলিরা মালপত্র নিয়ে হাজির। জীপগাড়িও তৈরী। সব কিছু ওতে তুলে নিয়ে আমরা রওনা হলাম ভৈরবঘাঁটির পথে। বেলা তখন তিনটে। "জয় গঙ্গামাঈ কী জয়, জয় যমুনা মাঈ কী জয়"—আমাদের সম্মিলিত ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল গঙ্গোত্রীর বাস-স্ট্যাণ্ড।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই জীপ এসে দাঁড়াল ভৈরবঘাঁটি। গজেন্দ্র

সিংকে আগেই বলা ছিল। যাত্রীনিবাসে সে আমাদের জন্য দু'খানা ঘর রেখে দিয়েছিল। আজ রাত্রে ভৈরবঘাঁটিতে বিশ্রাম নিয়ে কাল ভোরে রওনা হব লঙ্কাচটি। সেখান থেকে সকালের প্রথম বাস ধরে হৃষিকেশের পথে।

বিছানা ও মালপত্র রেখে আমরা জায়গা দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। একটু দূরেই জাহ্নবী গঙ্গা, তার ওপারেই লঙ্কাচটির বাস-স্ট্যাণ্ড ও টিনের চাল দেওয়া যাত্রীশিবির। নদীর উপর পাকা পুল তৈরী হচ্ছে, শেষ হলেই তার উপর দিয়ে যাত্রীবাহী বাস চলবে।

দিনের আলো নিভে আসছে। সূর্যদেব গহন অরণ্যের আড়ালে আত্মগোপন করেছেন। ভৈরবঘাঁটির লোক সংখ্যা খুব কম। ছোট বাস-স্ট্যাণ্ডের পাশে দু-তিনখানা খাবারের দোকানের কিছু লোক ছাড়া ভৈরবঘাঁটি জনবিরল বললেও অত্যুক্তি হয় না। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। জঙ্গলে ভাল্লুকের খ্যাতি আছে। কাছেই ভৈরবনাথের মন্দির, অন্ধকার হয়ে আসছে বলে আমরা সেখানে গেলাম না, সোজা যাত্রীনিবাসে ফিরে এলাম। গজেন্দ্র সিং সবার জন্য গরম চা ও পকোড়া আনিয়ে দিল। তৃপ্তিকরে খাওয়া হল।

সন্ধ্যার পর গজেন্দ্র সিং ঘরে একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। অখণ্ড অবসর। আমরা এবারের পরিক্রমার হিসাব-নিকাশ করতে বসলাম। এ ব্যাপারে লালুবাবু ও পরিমল ভীষণ কড়া। ওদের মতে খরচ যাই হক-না-কেন, হিসাব মেলা চাই, তা হলে ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিক্রমায় কি রকম খরচ পড়ে সে সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার থাকবে। পাকা বাস্তববাদীর কথা। প্রায় একঘণ্টা মাথা ঘামিয়ে আমাদের হিসাব-নিকাশ শেষ হল।

রাত্রে ভোজনান্তে যাত্রীনিবাসে ফিরে আসতেই লালুবাবুর কড়া হুকুম এখনই শুয়ে পড়তে হবে, না হলে কাল ভোরে বেরুতে পারব না। 'যথা আজ্ঞা ক্যাপটেন্' বলে আমরা আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

লালুবাবুর ডাকে ঘুম ভাঙে। টর্চ জ্বেলে দেখি চারটে। ডাক তো নয় যেন এলার্ম ঘড়ির ঘণ্টা। উনি এর মধ্যে পাশের ঘরে গিয়ে পরিমলদের তুলে দিয়ে এসেছেন। মুখ-হাত ধুয়ে বিছানাপত্র বেঁধে আমরা এক কাপ করে চা ও বিস্কুট খেয়ে এলাম। ঠিক পাঁচটায় কুলিরা এসে গেল। গজেন্দ্র সিংকে ধন্যবাদ জানিয়ে 'গঙ্গামাঈ কী জয়' ধ্বনিতে বেরিয়ে পড়লাম লঙ্কাচটির পথে।

আকাশ সবেমাত্র পরিষ্কার হতে শুরু করেছে, সূর্যের আলো তখনও ফুটে ওঠেনি। সারা অঙ্গ শীতবস্ত্রে আবৃত করে কাঁধে ঝোলা ও হাতে লাঠি নিয়ে চিরাচরিত পর্যটকের বেশে যাত্রা শুরু করলাম।

কন্‌কনে শীত, ভোরের হিমেল হাওয়া বইছে বেশ জোরে। হিমালয়পরিক্রমা পরিকল্পনা মতো সম্পন্ন করে সুস্থ শরীরে ফিরে চলেছি আপন গেহে। সাফল্যের আনন্দে মন পরিপূর্ণ। কিন্তু হিমালয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনায় নাড়ীতে যেন টান লাগছে। 'আবার আসিব ফিরে' এই সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা মনের গহনে লুকিয়ে রয়েছে। এখন কিন্তু মন গৃহমুখী।

সর্পিল উৎরাই-পথে তর্‌তর্‌ করে নেমে চলেছি। দুধারে বনস্পতির ছায়া। সূর্য ঠাকুর তখনও আকাশে উদিত হননি। আগেই বলেছি লঙ্কা ও ভৈরব ঘাঁটির এই পাকদণ্ডী পথ আধা-চড়াই, আধা-উৎরাই—মাঝখানে প্রবলস্রোতে বহমানা জাহ্নবী-গঙ্গা।

অত ভোরেও দেখা হল কিছু যাত্রীর সঙ্গে। দেহাতী-লোক,

মাথায় পোঁটলা বেঁধে লোটা কম্বল নিয়ে চলেছে ভৈরবঘাটি। 'গঙ্গামাঈ কী জয়' বলে ওরা আমাদের শুভেচ্ছা জানাল। আমরাও ঐ ধ্বনিতে তার প্রত্যুত্তর দিলাম।

অল্প পরে উৎরাই শেষে জাহ্নবী-গঙ্গার পুলের উপর দিয়ে সাবধানে পার হলাম। এবার শুরু হল চড়াই-পথ। আমাদের চলার গতি নিজে থেকেই শ্লথ হয়ে এল। কিন্তু সাফল্যের আনন্দে বিশ্রাম না করে এগিয়ে চললাম। তাছাড়া লালুবাবু তাড়া দিচ্ছেন, ঠিক সাতটায় লঙ্কাচটি থেকে প্রথম বাস ছাড়বে, সেটা ধরতেই হবে, অতএব সময় খুবই অল্প। পুবের আকাশ সূর্য-কিরণে ঝলমল্। শীতের প্রভাবও তাই কিছুটা ক্ষীণ। চড়াই-পথে শরীরের ভার যত কম থাকবে, তত স্বচ্ছন্দ গতিতে হাঁটা যাবে। ভারী শীত-বস্ত্রগুলি খুলে কুলির মাথায় চাপিয়ে দিলাম।

উৎরাই-পথ শেষ করে ঠিক সাড়ে-ছটার সময় আমরা লঙ্কাচটিতে এসে পৌঁছলাম। কিন্তু এ কি ব্যাপার! স্ট্যাণ্ডে তো কোন বাস দেখতে পাচ্ছি না। সকালের বাস কি তবে এর মধ্যেই ছেড়ে গেল না-কি? পরিমল ছুটল বাসের গুমটিতে খবর নিতে। ফিরে এসে যে খবর দিল তাতে সবাই মুষড়ে গেলাম। এখান থেকে দশ মাইল দূরে নাকি বিরাট ধস্ নেমে রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাল বিকাল থেকে এখন পর্যন্ত কোন বাস আসেনি, ধসের ওপারে সব আটকে আছে। ধস্ পরিষ্কার করে বাস চলা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা আজ বিকালের আগে নেই।

বাস-স্ট্যাণ্ডের বিরাট চত্বর ও যাত্রী শিবিরগুলি লোকে-লোকারণ্য, প্রায় হাজারখানেক লোক অসহায়ভাবে অপেক্ষা করছে। নিরুপায় হয়ে আমরা মালপত্র একটা খাবারের দোকানে রাখলাম। ক্ষিদেও পেয়েছিল। গরম চা, পকোড়া আর জিলিপির ফরমাশ দেওয়া হল। রোহিত বলল অত ভাবনার কি আছে। এত লোকের ভাগ্যে যা আছে, আমাদেরও তাই হবে। আজ বাস না চললে 'ভোজনং

যত্রতত্র শয়নং অত্র হোটেলে'। ওর সংস্কৃত বিদ্যার দৌড় দেখে আমরা হেসে উঠলাম।

লালুবাবু বললেন বাস আসতে শুরু করলে ভীষণ ভীড় হবে। চলুন, গুমটিতে গিয়ে টিকিটবাবুর কাছে দরবার করি যাতে আমাদের ছজনের টিকিট প্রথম বাসেই পাই। আমি ও লালুবাবু গিয়ে ভদ্র-লোকের শরণাপন্ন হলাম। একটু অতিরঞ্জিত করে বলতে হল আমরা ভীষণ কাজের লোক। আজ ফিরতেই হবে, না হলে কাজের ক্ষতি হবে। টিকিটবাবু রাজি হয়ে আমাদের নাম খাতায় তুলে নিলেন।

বেলা এগারটা বেজেছে, আমরা হোটেলে ফিরে ভোজন পর্ব সমাধা করলাম। বাঁধা বিছানায় মাথা দিয়ে দিবা নিদ্রার পর একটু তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ এক বিরাট জনতার কলরবে ঘুম ভেঙে গেল, বাইরে বেরিয়ে এলাম, শোনা গেল, ধস্ নাকি পরিষ্কার করা হয়েছে, বাস এক্ষুণি এসে পড়বে। পুলিশের একটা জীপ গাড়ি এসেছে তার অগ্রদূত হয়ে। চারিদিকে 'চলচল' রব। আমরাও ভালো আসন লাভের আশায় বাস-স্ট্যাণ্ডে এসে জড়ো হলাম।

জীপ আসবার আধঘণ্টার মধ্যেই প্রথম বাস এসে পৌঁছল। তার পিছনে পর-পর আরও চারখানা। বিরাট হৈ-[illegible]-এর মধ্যে অদ্ভুত বিশৃঙ্খল অবস্থা।

হঠাৎ একটা বাসের ড্রাইভার ঘোষণা করল, "১২৭৮ নম্বর বাস এখুনি ছাড়বে, যাত্রীরা সব উঠে পড়ুন, বাস যাবে সোজা হৃষিকেশ। টিকিট বাসে কাটা হবে।" ঘোষণার এক লহমার মধ্যে এক আশ্চর্য রকেটীয় ক্ষিপ্রতার জন-ব্যূহ ভেদ করে পরিমল ঐ নম্বরের বাসে উঠে ছখানা প্রথম শ্রেণীর আসন দখল করে ফেলল। সকলে নিশ্চিন্তমনে আসন গ্রহণ করার পর গৌর ও রোহিত ছুটল জিলিপি, পকোড়া ও চা আনতে। মনে হল যুদ্ধজনিত পরিস্থিতির উদ্বেগ নিরসন হল।

একটু পরে আমাদের বাসই প্রথম ছাড়ল। সকলে সমস্বরে 'গঙ্গা মাঈ কী জয়, যমুনা মাঈ কী জয়' ধ্বনি দিয়ে উঠলাম। সময় তখন বিকেল ঠিক তিনটে বেজেছে।

অপ্রশস্ত বন্ধুর রাস্তার উপর দিয়ে আমাদের বাস চলেছে। ড্রাইভারটি বয়সে তরুণ ও অত্যন্ত ভদ্র। শুনলাম ও নিজেই এবাসের মালিক। টিহরি-গাড়োয়াল মোটর ট্র্যান্সপোর্ট ইউনিয়নের অনেক বাস বা ট্রাকের মালিকরা নিজেই গাড়ী চালান। এতে গাড়ীগুলি বেশী যত্নে থাকে। লাভের অংশও অনেক বেশী হয়। ওঁদের এ উদ্যম ও কর্মক্ষমতা প্রশংসনীয়।

আঁকা-বাঁকা রাস্তায় চলতে-চলতে বাস এসে পড়ল সেই বিরাট ধস্ নামার জায়গায়। নেপালী কুলিরা তখনও গাঁইতি, কাঁটাওয়ালা কোদাল ও বেল্‌চা দিয়ে ধস্ পরিষ্কার করে ঢালের দিকে ফেলে দিচ্ছে।

ধসের জায়গা দিয়ে আমাদের বাস খুব সাবধানে পার হল।

ড্রাইভারের পাশের সিটে অভিজাত চেহারার মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। আলাপ হল। ওঁর নাম মোহন সিং নেগি। টিহরি জেলায় বাড়ী, উত্তর কাশীতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে আছেন। গঙ্গোত্রী এলাকায় যাত্রীদের সুখ-সুবিধা তদারক করতে গতকাল লঙ্কাচটিতে এসেছিলেন। ওঁর জীপ গাড়ীটা বিকল হয়ে গিয়েছে, তাই এই বাসে ফিরছেন।

মোহন সিং সদালাপী ও উচ্চশিক্ষিত। ওঁর সঙ্গে আলাপে জানতে পারলাম এদেশের সাধারণ লোকের জীবন যাত্রার ধারা। মেয়ে-পুরুষ উভয়েই এখানে পরিশ্রমশীল—কোথাও কোথাও মেয়েরাই বেশী। যাদের ক্ষেতে বেশী ফসল হয়, তারা মোটামুটি অবস্থাপন্ন। আর এক শ্রেণীর গ্রামবাসী ভেড়া, ঘোড়া ও খচ্চরের ব্যাবসা করে। এখানে যে যত ঘোড়া বা খচ্চরের মালিক, সে তত মহাজন। পাহাড়ী রাস্তায় মাল বইবার জন্য ঘোড়া অনেক-

ক্ষেত্রে অপরিহার্য। মেয়ের বিয়েতে অনেক সময় যৌতুক হিসাবে বরপক্ষকে ঘোড়া দেওয়া হয়। সরল অনাড়ম্বর এদের জীবন যাত্রায়ও ধীরে-ধীরে আধুনিকতার জোয়ার এসে লাগছে।

আমাদের বাস কখনও মধ্যগতিতে কখনও ধীরে আঁকাবাঁকা পথের উপর দিয়ে চলেছে। বেশীর ভাগই উৎরাই, মাঝে-মাঝে চড়াইও আছে। এভাবে চলতে-চলতে আমরা হরশিল, ঝালা, সুখখী পার হয়ে গঙ্গাণী এসে পৌঁছলাম। মাত্র দু-বছর আগে গঙ্গোত্রীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধু মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রম এখানে দেহরক্ষা করেন ও এখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। গঙ্গাণী মোটামুটি জনবহুল বসতি একথা তো আগেই বলেছি।

আমাদের আজই উত্তরকাশী পৌঁছুতে হবে। অনেক দেরীতে লঙ্কাচাটি থেকে রওনা হয়েছি, বাস তাই এখানে দাঁড়াল না। মনে-মনে মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রমের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালাম। এখন পাঁচটা বেজেছে। সন্ধ্যা হতে বেশ কিছু দেরী আছে। সাড়ে-সাতটার আগে অন্ধকার হবে না।

কিছুক্ষণ পরে বাস এসে ভাটোয়ারী পৌছল। এখানে চা পানের জন্য দশ মিনিটের বিরতি। নেগি সাহেবকে নিয়ে আমরা বাস থেকে নেমে পড়লাম। ড্রাইভার গেল পুলিশ চৌকীতে খাতা সই করাতে। স্ট্যাণ্ডের উপরই চা জলখাবারের দোকান। সেখানে ঢুকে চা ও জিলিপির ফরমাশ দিলাম। হাকিম সাহেব অবশ্য চায়ের দোকানে ঢুকলেন না। “থানা থেকে একটু কাজ সেরে আসি” বলে কেটে পড়লেন। “হাকিম তো, জনতার দোকানে বসে চা-পান করতে সম্মানে বাধবে” মন্তব্য করল রোহিত।

চা পান শেষ করে আমরা বাসে এসে বসলাম। হাকিম সাহেব আগেই এসে গিয়েছেন। সব যাত্রী ঠিক আছে কিনা দেখে ড্রাইভার বাস ছাড়বার ‘হর্ন’ দিল। এখন সোজা যাব উত্তরকাশী। নেগি সাহেবের আলোচনা চলল। এ অঞ্চলের লোকদের সামাজিক

জীবন সম্বন্ধে উনি বললেন, গ্রামের মেয়েরা [illegible] নিরক্ষর ও নানা কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এখনও ওরা ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করে। অসুখ করলে ঝাড়-ফুকের উপর নির্ভর করে থাকে। অবশ্য আধুনিক চিকিৎসার সুযোগই বা ওরা কতটুকু পায়। নেগি দুঃখ করে আরও বললেন, এ অঞ্চলের সাধারণ গ্রামবাসীদের দারিদ্র্য যে কবে ও কিভাবে দূর হবে ভগবানই জানেন। সরকার অবশ্য নানা প্রকল্পের মধ্য দিয়ে এ বিষয়ে খুব সচেষ্ট। আজকাল অনেক গ্রামেই আধুনিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক ইনজেকসন ও টীকা দেবার জন্য স্বাস্থ্য-কর্মীরা গ্রামে-গ্রামে ঘুরে সর্বতোভাবে এসব রোগের প্রতিরোধের চেষ্টা করছেন। বড় গ্রামগুলিতে প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। বড়-বড় জায়গায় কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছেন। জনবহুল স্থানগুলিতে ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে যাতে স্বল্প মূলধনের ব্যাবসায়ীরা টাকা ধার নিয়ে ব্যাবসার উন্নতি করতে পারে।

কিন্তু এদিককার বড় জায়গাগুলিতে হঠাৎ বহিরাগতদের কাছ থেকে শেখা আধুনিক জীবন যাত্রার নকল করার ফলে স্থানীয় লোকদের মধ্যে অনেক কুফল ফলেছে। আপনারা শুনলে আশ্চর্য হবেন উত্তরকাশীর মতো সাধু-সন্ত-ভরা পুণ্যভূমিতে আজ বহু সাধারণ যুবক-যুবতী ও মধ্য বয়স্কদের মধ্যে সংক্রামক যৌনব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে। দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গে যৌন-মিলনের-ফলে আজ স্থানীয় বহু নরনারী যৌন-ব্যাধিগ্রস্ত। অর্থবান্ কামুক শ্রেণীর মানুষ দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে এদের সর্বনাশ করেছে।

খবরটা চমকে ওঠার মতো। পুণ্যভূমি উত্তরকাশীতে এ পাপ বাসা বেঁধেছে শুনে মনটা খুব খারাপ লাগল।

লালুবাবু প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, আপনারা আদালতে বসে কি ধরনের মামলার নিষ্পত্তি করেন?"

উত্তরে নেগি সাহেব বললেন, টিহরি গাড়োওয়ালের অধিবাসীরা সাধারণতঃ শান্ত, সরল ও ধর্মভীরু। বেশীর ভাগ মামলা ক্ষেত-খামারের সীমানা বা ঘোড়া খচ্চরের ভাগবাটোয়ারা থেকে উৎপত্তি হয়। এগুলির বেশীর ভাগই সাধারণ বুদ্ধি থেকে নিষ্পত্তি করা যায়। কিছু বিবাদ গ্রামের মোড়লরাই মিটিয়ে দেয়, আদালত পর্যন্ত আসে না। খুনখারাপি খুব বেশী হয় না। তাই ফৌজদারী মামলার সংখ্যাও কম। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফ্রিদি, পাঠান বা বালুচ এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তে নাগা, কুকীরা যেমন দুর্ধর্ষ, নিষ্ঠুর ও হিংস্র হয়, সামান্য উত্তেজনায় ছোরা-ছুরি বা গুলি বিনিময়ের সাহায্যে বদলা নেয়, টিহরি গড়োয়ালের পাহাড়ীদের মধ্যে তা একান্ত বিরল। এ অঞ্চলে কলকারখানাও নেই। সুতরাং বম্বের 'ঘেরা ডালো' বা পাশ্চম বাংলার 'ঘেরাও'ও নেই। বড় জোর সমতল শহরগুলির 'বন্‌ধ' বা হরতালের দু-চারটে ঢেউ এদিককার শহর অঞ্চলে এসে পড়ে, গ্রামাঞ্চলে তাও নেই, বললেন নেগি সাহেব। লালুবাবু তাড়া-তাড়ি বলে উঠলেন, "'ঘেরা ডালো' বা 'ঘেরাও' আর এখন মহারাষ্ট্র বা পশ্চিম বাংলায় সীমাবদ্ধ নয়, দেশের সব রাজ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে।" হাকিম সাহেব একথা মেনে নিলেন।

মোহন সিং নেগি আরও বললেন এ অঞ্চলে রাজনৈতিক গুপ্তচর বৃত্তির অপরাধে কিছু বিদেশী ধরা পড়ে, তাদের বিচার করতে হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সবসময় সহযোগিতা করে গুপ্তচরদের অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়। গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী এলাকায় বিদেশীদের প্রবেশ নিষেধ এবং ধরা পড়লে কঠিন শাস্তি অবশ্যম্ভাবী।

অনেকক্ষণ আগেই দিনের আলো নিভে গিয়ে আঁধার নেমে এসেছে। হেডলাইটের তীব্র আলোর সাহায্যে দক্ষ ড্রাইভার বাস চালিয়ে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে তীক্ষ্ণ বাঁক। আলো পড়ছে পাহাড়ের গায়ে বা খাদের নিচে দিয়ে বয়ে-যাওয়া নদীর জলের উপর। হাকিম

সাহেব ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেন উত্তরকাশী আর কতদূর। ও বলল, মানেরী পৌঁছতে ছ মাইল বাকী। "তবে তো এসে গেলুম" বলে উঠলেন লালুবাবু।

একটু পরেই দূর থেকে বিজলী বাতির অলোকমালায় সজ্জিত 'মানেরি' দেখা গেল। ক্রমে আলোগুলি বড় ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নেগি সাহেব ভবিষ্যতের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জায়গাটা দেখালেন। আমরা অবশ্য যাবার সময় এটা নজর করেছিলাম।

মানেরি পার হয়ে বেশ কিছু দূর রাস্তা পর্যন্ত বিজলী বাতি রাস্তাও ভালো, বাসও চলতে লাগল তাড়াতাড়ি। আরও পাঁচ মাইল এগিয়ে আমরা গঙ্গোত্রী পুলিশ-চেক-পোস্টের সামনে বাস দাঁড়ালে আমাদের গঙ্গোত্রী গোমুখ যাবার Inner Line Permit ফেরৎ নিয়ে নিল।

নেগি সাহেব বললেন "উত্তরকাশী তো প্রায় পৌঁছে গেলাম, ওখানে আমি বিদায় নেব, আপনাদের সহযাত্রী হয়ে সময়টা খুব আনন্দে কাটল।" আমরাও ওঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম, এ অঞ্চলের নানা বিষয়ের তথ্য জানিয়েছেন বলে।

দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা বাস ডিপোতে এসে পৌঁছলাম। আর এক দফা শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর নেগি সাহেব বিদায় নিলেন। তখন রাত্রি ঠিক আটটা।

ড্রাইভার ঘোষণা করল, ভোর চারটার সময় বাস ছাড়বে, না হলে সন্ধ্যার আগে হৃষিকেশ পৌঁছনো যাবে না। এদিকে গত ছদিন ধরে বর্ষা শুরু হয়েছে, পথে কত জায়গায় ধস্ পার হতে হবে জানা নেই, তাতে অনেক সময় নষ্ট হবে। উত্তরকাশীর আশপাশে অল্পবিস্তর বৃষ্টি শুরু হওয়ার খবর নেগি সাহেবও দিয়েছিলেন। খুবই চিন্তার কথা। বর্ষা মানেই পাহাড় থেকে ধস্ নামা। বড় ধস্ নামলে রাস্তাঘাট একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে।

আমরা বাস থেকে নেমে সরকারী যাত্রী-নিবাসের দিকে রওনা

হলাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন। দুখানা ঘর পাওয়া গেল। মাত্র আজ বিকালেই খালি হয়েছে। কুলির সাহায্যে মালপত্র নিয়ে এলাম। যাত্রী-নিবাস বাস ডিপোর সংলগ্ন বললেও চলে। আমাদের ঘর দুটিও ভালো। প্রতিঘরে দুখানা পালঙ্কেব উপর মোটা শতরঞ্চি পাতা। দুটো পালঙ্ক একত্র করে তিনজনের বিছানা পাতা হল।

মুখ হাত ধুয়ে আমরা বেরিয়ে সেই কাশ্মীরী হোটেলে ঢুকে পড়লাম। রাত প্রায় নটা বাজে।

গরম গরম হাতে-গড়া চাপাটি ও মাংসের সঙ্গে সবজি, আচার ও কাঁচা পেঁয়াজের খানা সেদিন তৃপ্তি করে খেয়ে যাত্রী-নিবাসে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। শীত এখানে অনেক কম, একখানা কম্বলই যথেষ্ট। লালুবাবু বললেন ঠিক তিনটার সময় সকলকে ডেকে দেবেন। হাতে একটু সময় রাখা দরকার, অতো ভোরে কুলি না পাওয়া গেলে আপন আপন কাঁধে মাল বইতে হবে।

ঘড়ির এলার্মের সমতুল লালুবাবুর ডাকে ঘুম ভাঙল। সময় তিনটা বেজে দশ মিনিট। চট্‌পট তৈরী হয়ে সাড়ে তিনটার সময় বাইরে বেরিয়ে এলাম। কাল রাতের কুলিদের আজ ভোরে আসতে বলা হয়েছিল। ওরা ঠিক সময়েই এসেছে। মালপত্র নিয়ে বাসে তুলে আপন-আপন জায়গায় বসে নিশ্চিন্ত হলাম। অনেকে রাত্রিটা বাসের সিটেই হেলান দিয়ে কাটিয়েছেন। সাত-আট ঘণ্টার জন্য কে আবার মাল-পত্র নিয়ে হোটেলে যায়।

যাত্রীদের 'গঙ্গামাঈ কী জয়' সমবেত কণ্ঠধ্বনির মধ্য দিয়ে আমাদের বাস ঠিক ভোর চারটের সময় উত্তরকাশী ছাড়ল। ঘন তমসাচ্ছন্ন রাত্রি। কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীর চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ, তার ফাঁকে-ফাঁকে উজ্জ্বল তারাগুলি

ঝিক্‌মিক্ করছে। সামনে দুর্ভেদ্য কুয়াশা। হেডলাইটের তীব্র-রশ্মির সাহায্যে তা ভেদ করে বাস এগোতে লাগল।

ভোরের হাওয়ায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। শশাঙ্ক-বাবুর ডাকে চোখ মেলে তাকালাম। পরিষ্কার আকাশ সূর্যকিরণে ঝল্‌মল্ করছে। বাস এসে এক জায়গায় দাঁড়িয়েছে, যাত্রীরাও সব নেমে গিয়েছে। কোথায় এলাম? এ প্রশ্নের উত্তরে জবাব পেলাম 'ছাম'। "বলেন কি? ধরাসু ছাড়িয়ে এতদূর এসে গিয়েছি!"

বাস এখানে চা-জলখাবারের জন্য দাঁড়াবে পনের মিনিট। সকলে মিলে একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম। সেই একই 'মেনু', গরম চা, সঙ্গে জিলিপি ও পকোড়া। মনে পড়ল এই 'ছাম'-এ দোকানে বসে যমুনোত্রী যাবার পথে আমরা দুপুরের খাবার খেয়েছিলাম।

প্রাতরাশ শেষ করে সকলে বাসে উঠলে বাস ছেড়ে দিল। এখান থেকে রাস্তা বেশ প্রশস্ত ও পিচ-ঢালা। ড্রাইভার বাসের গতি বাড়িয়ে দিল। কিছু পরে টিহরির দুমাইল আগে চৌমোহানি থেকে রাস্তা ঘুরে গেলাম নরেন্দ্রনগরের দিকে। ড্রাইভার বলল নরেন্দ্রনগর পৌঁছে দশ মিনিটের বিরতি হবে। তারপর সোজা হৃষীকেশ। আমরা খুব উৎসাহিত বোধ করছি। এভাবে বাস চললে বেলা বারটার মধ্যে হৃষীকেশ পৌঁছে যাব।

কিন্তু কথাতেই আছে 'Man proposes, God disposes'.—বাস বেশ স্বচ্ছন্দগতিতে চলতে-চলতে হঠাৎ ভয়ঙ্কর গর্জনে থেমে গেল। ড্রাইভার লাফ দিয়ে নিচে নেমে বাসের বনেট খুলল। দেখা গেল Water Pumpটা বিকল হয়ে গিয়েছে, হু হু করে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। সর্বনাশ! জায়গার নাম নাগনী। মনে পড়ল এখানে আমরা যাবার পথে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম ও একটা সেলাই কল নিলামে বিক্রি হতে দেখেছিলাম।

ড্রাইভার ও কন্‌ডাক্‌টার যন্ত্রপাতি বার করে মেরামত করতে বসল। ইতিমধ্যে উলটো দিক থেকে একটা ট্রাক এসে দাঁড়াল, তার ড্রাইভারও মদৎ দিতে শুরু করল। প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টা করে Water Pump সারানোর কাজ সম্পূর্ণ হল, বাসও ছাড়ল।

এভাবে আমরা নরেন্দ্রনগর পার হলাম, দেরী হয়ে গিয়েছে বলে বাস এখানে দাঁড়াল না। নাগনীতে আমরা এক পেয়ালা চা পান করে নিয়েছিলাম।

নরেন্দ্রনগর পার হয়ে অল্পদূর পরেই ধস্‌ নেমে রাস্তা খারাপ হওয়াতে আমাদের বাস সাবধানে ও ধীরে চলতে লাগল।

হৃষীকেশ আর মাত্র মাইল আষ্টেক পথ। শরীর অবসন্ন, কিন্তু মন যাত্রাশেষের সাফল্যের আনন্দে চন্‌মন্‌ করছে। বেলা দুটোর সময় হৃষধ্বানর মধ্যদিয়ে আমরা হৃষীকেশ পৌঁছলাম। শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত, গঙ্গোত্রী ছাড়ার পর স্নান হয়নি, দু' রাত্রি ঘুমও হয়নি বললেও চলে। রাস্তায় পা দুটো আর শরীরের ভার বইতে পারছে না। পরিমল সকলের মালপত্র নিয়ে ভগবান আশ্রমের দিকে ছুটল। এখানেই আমরা যাবার সময় একরাত্রি আশ্রয় নিয়েছিলাম। পথে একটা হোটেলে কোন রকমে খাওয়া সেরে ভগবান আশ্রমে হাজির হলাম। পরিমল ওখানে একটা ভালো ঘর জোগাড় করে মালপত্র রেখে দিয়েছে। বিছানা পেতে ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিলাম।

পরদিন ঘুম ভাঙল বেলা আটটার সময়। কাল বিকাল থেকে প্রায় দশ ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। একটানা এত ঘুম কখনো ঘুমিয়েছি বলে মনে পড়ে না। লালুবাবু ও পরিমল বললেন রাত্রে খাবার জন্য অনেকবার ডেকেও ওঁরা আমার ঘুম ভাঙাতে, পারেননি।

উঠে মুখ হাত ধুয়ে এলাম। শরীর এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে।

মাথাটাও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ঠিক হল আজই দুপুরে খাওয়ার পর হরিদ্বার ফিরে যাব।

সাঙ্গ হল এবারের হিমতীর্থ পরিক্রমা। ফিরে এসেছি হরিদ্বারে। মনে পড়ে চব্বিশ বছর আগেকার সেই প্রভাতের কথা, যেদিন প্রথম পা দিয়েছিলাম এই পুণ্যতীর্থে। সেই আমার প্রথম হিমালয়-দর্শন। তারুণ্যের অপার আবেগ নিয়ে সেদিন মুগ্ধ বিস্ময়ে দেবতাত্মা হিমালয়কে দেখেছি ও তার প্রতি নিবিড় আকর্ষণ অনুভব করেছি।

বেদ, উপনিষদ, মহাভারত ও ইতিহাসের পাতায়-পাতায় নগাধিরাজ মহাহিমবন্তের বন্দনাগান। যুগে-যুগে মহাপুরুষ ও আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সাধারণ মানুষ এর আকর্ষণে ছুটে এসেছেন 'তমসো মা জ্যোতির্গময়,'—এই প্রার্থনা অন্তরে নিয়ে।

হরিদ্বার হিমালয় তীর্থের প্রথম দ্বার। এখান থেকেই শুরু হিমালয় পরিক্রমা।

হিমালয় তার আপন মৌলিকতা ও স্বাতন্ত্র্যে তুলনাহীন।

শ্রীভোলানন্দ গিরিমহারাজের আশ্রম সংশ্লিষ্ট যাত্রীনিবাসে একখানা ঘরে আশ্রয় পেয়েছি। মন্দির ও আশ্রমের বড় সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। সর্বত্র পবিত্রতার স্পর্শ। আমার অখণ্ড অবসর। অবারিত উদার আকাশের নিচে মুক্ত বাতাসে প্রাণশক্তিকে সঞ্জীবিত করি।

সন্ধ্যার সময় হরকি পৌরীর ঘাটে যাত্রীর কোলাহল এড়াতে নিভৃতে একটু দূরে গিয়ে বসি। সুরধুনী গঙ্গা কুলু-কুলু শব্দে বয়ে চলেছেন। ভৈরব ঘাঁটি, গঙ্গোত্রী ও গোমুখের পুণ্যতোয়া এই তটিনী এখানে তাঁর ভয়ঙ্করী মূর্তি পরিহার করে শান্ত মহিমায় বহমানা। অনেক প্রশস্ত তাঁর বক্ষ।

ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। সন্ধ্যারতির অপূর্ব প্রদীপমালা

দেওয়া ভেলাগুলি ঢেউ-এর উপর দিয়ে ভাসতে-ভাসতে দূরে চলে যায়। কানে আসে আরতির মৃদু ঘণ্টাধ্বনি।

একটা আনন্দ-মিশ্রিত অনুভূতিতে মন আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

মনে হয় এই পুণ্যতীর্থ জাহ্নবীর কূলে বসে কত কবি কবিতা চয়ন করেছেন, কত সুরকার গানের মালা গেঁথেছেন। পরম ভাগবত-সুরের সম্রাট দিলীপকুমার রায় বলেছেন "জগতে পর্বতও আছে সবদেশেই, নদীও আছে, কিন্তু নেই হিমালয়, নেই গঙ্গা। মা গঙ্গাকে আমি ভালো বেসেছি শৈশবেই…" এই ভালোবাসা, এই সুতীব্র আকর্ষণ হিন্দুর শিরায়-শিরায়, ধমনীতে-ধমনীতে বয়ে চলেছে।

এখানে প্রাচীন ও আধুনিক হিন্দুর মানসিকতায় কোন প্রভেদ নেই। হিন্দু দর্শনের নবপ্রবক্তা অদ্বৈত উপাসক আচার্য শঙ্কর একেশ্বরবাদী হয়েও দেবী গঙ্গাকে প্রণতি জানিয়ে বলেছেন…

"দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে,
ত্রিভুবনতারিণি তরল তরঙ্গে।"

আবার তার কত যুগ পরে এক আধুনিক হিন্দুকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সেই একই শ্রদ্ধায়, একই ভালোবাসায় এই পুণ্য প্রবাহিণীকে উদ্দেশ্য করে গেয়েছেন—

"পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে
খণ্ডিত গিরিবর মণ্ডিত ভঙ্গে।"

এই বিশাল ভারতবর্ষের দেশগত, কালগত সমস্ত বিভেদ ও অনৈক্যের মধ্যে এক অখণ্ড ঐক্যের ধারায় বয়ে চলেছেন ভারত-মনমোহিনী ভগবতী গঙ্গা। ভারতবর্ষের অগণিত সাধারণের একজন হয়ে আমিও আমার শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তের প্রণতি জানাই দেবীর উদ্দেশ্যে, যাঁর করুণাবারিতে বিধৌত এই পুণ্যতীর্থ হরিদ্বার।

বসে আছি নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে। অন্তর পরিপূর্ণ, তাই বাক্যে স্পৃহা নেই। আর ভাষার প্রকাশক্ষমতা তো সীমাবদ্ধ। কবির কথায়—

মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়া
বদ্ধ চারিধারে
ঘোরে মানুষের চতুর্দিকে।'

হিমালয় দর্শনে যে বিরাট বিস্ময়ের জন্ম, ভাষার সাধ্য কি তার রূপ দেয়!

কর্মব্যস্ত সংসারের জটিলতার মধ্যে হিমালয় এক অসীম মুক্তি, জাগতিক ক্ষুদ্রতার মধ্যে এক অবারিত উদারতা। তাই তো প্রাত্যহিকতার বন্ধনে আবদ্ধ মন যখনই পাখা মেলতে চায় সীমাহীনতায়, ঘুমিয়ে থাকা যাযাবর বৃত্তি তখন চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখনই হিমালয় টানে দুর্নিবার আকর্ষণে। পা চলার আগে মন চলে যায় সেই অখণ্ড আনন্দলোকে, "সেথা নাইকো মৃত্যু, নাইকো জরা।" দেবতাত্মার স্পর্শে মানসিক মৃত্যু ও জরা দূর হয়ে যায়, মন পায় অমৃতের সন্ধান।

যাত্রা-নির্দেশিকা

Typhoid. Cholera Inoculation এবং তাহার প্রমাণ স্বরূপ ডাক্তারের Certificate.

বিছানা :

কম্বল	—৩টি	Hot water bag	—১টি
সতরঞ্চি	—১টি	Hold-all	—১টি
মোটা বিছানার চাদর	—৩টি	Air cushion	—১টি

Polyethene sheet to wrap-up Hold-all—১টি

শীতবস্ত্র ও অন্য টুকিটাকি জিনিস :

গরম প্যাণ্ট ও কোর্ট	—১প্রস্থ
ফুলহাতা সোয়েটার	—১টি
হাতকাটা সোয়েটার	—১টি
গলাবন্ধ ফুলহাতা গেঞ্জি	—১টি

পা থেকে কোমর পর্যন্ত গেঞ্জির underwear—১টি, গরম মোজা—২ প্রস্থ গরম দস্তানা ১ প্রস্থ, বাঁদর টুপি woollen —১টি, Rain coat with cap—১টি, Torch—১টি

ঔষুধ : পেটখারাপ বা আমাশয়, পেটব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, মাথা-ধরা, হজমের গোলমাল বা অম্বল, সর্দিকাশি, জ্বর, চোখ-জ্বালা, চোখ লাল হওয়ার জন্যে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে যথোপযুক্ত ঔষধ নেবেন।